আদি মধ্য অন্ত

সমরেশ বসু

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
শুভ ১লা বৈশাখ ১৩৭২ সন
প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮।১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯
প্রচ্ছদপট
শ্রীগণেশ বসু
হাওড়া-৪
ব্লক
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং
১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা-৯
প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেসন হাউস
৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯
মুদ্রক
শ্রীবংশীধর সিংহ
বাণী মুদ্রণ
১২, নরেন সেন স্কোয়ার
কলকাতা-৯।

আদি মধ্য অন্ত

আদি

"আমি, অস্বীকার করছিনে, আমরা এ যুগের ছেলেমেয়েরা…"

সুপর্ণা দুহাত বাড়িয়ে, শৈবালের ঠোঁটের ওপর চেপে ধরলো। "দোহাই তোমার, বুড়ো বাবা ঠাকুর্দার মতো জ্ঞানের বাক্য শুনিও না। কোথায় একটা মজার গল্প বলতে এলুম, শুনে এনজয় করবে। তা না, সেলফ্ ক্রিটিসিজম শুরু করে দিলে।"

"তুমি আমাকে ভুল বুঝলে মধু।" শৈবাল সুপর্ণার ডাক নামে ডেকে, ওর নিখুঁত ম্যানিকিওর করা পারফিউমের নেশাধরানো গন্ধমাখা কোমল ফরসা হাত দুটি মুখ থেকে টেনে বুকে রাখল, "তোমার মজার গল্পের নায়ক নায়িকা, অরিন্দম আর কৃষ্ণা সম্পর্কে তা হলে লোভের কথা বললে কেন ? আর ওদের করুণা করার কথাই বা তোমার মনে এলো কেন ?"

সুপর্ণা ঘরের বন্ধ দরজাটার দিকে একবার দেখে নিল। কারণ শৈবাল যে কেবল ওর হাতদুটো টেনে বুকের ওপর নিল, তা নয়। ওকেও টেবিলের পাশ দিয়ে বুকের অনেকটা কাছে টেনে নিল। ঈষৎ বাধা দেবার চেষ্টা করলো। ফলে সবুজ বনে লাল ফুল ছাপানো পিওর সিল্কের শাড়ির আঁচল খসলো। শাড়ির সঙ্গে অভিন্ন রঙের মেশানো জামায়, অনম্র উদ্ভিন্ন বুকের একদিক উদাস। অতি অনুজ্জ্বল ওষ্ঠরঞ্জনী মাখা পুষ্ট ঠোঁট টিপে, ওর স্বাভাবিক সরু ভ্রুকুটি চোখে শৈবালকে হানলো। কপালের সামনে, ছাঁটাই করা নরম কালো চুলের গোছা এসে পড়েছে প্রায় ওর দীর্ঘায়ত কালো চোখের ওপর। "কী করছো ? এটা তো তোমার অফিস ঘর বলেই জানি। দরজাটাও খোলা।"

"ভুল কথা একটাও বলোনি।" শৈবাল ওর ঝকমকে দাঁতে হেসে, সুপর্ণাকে

কোনো অবকাশ না দিয়েই ঝটিতি প্রায় বুকের সংলগ্ন করলো, "কেবল ভুলে গেছ, দরজার বাইরে একজন বেয়ারা আছে। আর দরজার বাইরে, লাল বাতিটার সুইচ আমি আগেই অন্ করে দিয়েছি। যাকে বলে রক্ত চক্ষুর নিষেধ-সংকেত।"

সুপূর্ণা দেখল, ওর বুকে ঠেকেছে শৈবালের কপাল। পোশাকে-আশাকে আর বাকচাতুর্যে যতো আধুনিকই হোক, বুকের স্পর্শে একটা শিহরিত লজ্জাকে চাপা দায়। বদ্ধ ঘরে তৃতীয় ব্যক্তি না থাকলেও কোনোরকমে শৈবালের হাত থেকে, একটা হাত ছাড়িয়ে, ওর মাথাটা সরিয়ে দিল। ঢেউ খেলানো চুলের মুঠি আলগা করে ধরলো। মুখে ততক্ষণে লেগে গিয়েছে রক্তচ্ছটা, "মতলবটা কি তোমার বল দিকিনি? আমি তো তোমাকে ওরকম প্রভোক করতে চাইনি। তবে কেন···"

"আমার ইংরেজি বাঙলা, দুই-ই খুব খারাপ।" শৈবাল চেয়ার থেকে মুখ তুলে সুপূর্ণার লজ্জা আর অস্বস্তিভরা মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলো। "আসলে, তুমি তো সমস্ত দিক দিয়ে আমার চোখে মুর্তিমতী প্রোভোকেটর। কিন্তু ঘরে ঢুকে দু'কথার পরেই তুমি আমাকে বলেছিলে, আমার মধ্যে তুমি অরিন্দমের পাগলা দাপানিটা দেখতে পাও না।···আহা, না না, আমি অবিশ্যি ও কথাটার জবাব দিতে বা শোধ নিতেই, এসব কিছু করছিনে। তুমি ভালোই জানো, অরিন্দমের পাগলা দাপানি আমার সত্যি নেই, কারণ আমার স্থান কাল পাত্রী নিয়ে হারানোর ভয় আর ছটফটানি নেই। অফিসের কামরায়, এমন অসময়ে, তোমার সদ্য লাগিয়ে আসা ঠোঁটের রঙ চুষে নেবো, এতোটা কাণ্ডজ্ঞানহীনও আমি নই। তবু যে কেন তোমাকে কাছে টেনে নিলুম—মানে—"

শৈবাল কথাটার শেষ খুঁজে পেলো না। মুখের হাসিতে একটা অসহায় অভিব্যক্তি। ওর হাত থেকে মুক্ত হয়ে, সুপূর্ণা দুহাত সরে দাঁড়ালো। ঘাড় ঝটকা দিয়ে কপালের চুলের গুচ্ছ সরাতে গিয়ে, নতুন করে আর এক গুচ্ছ চুল কপালে এসে পড়লো। বয়েজ কাট থেকে কয়েক ইঞ্চি বড় চুল, ঘাড়ের কাছে বন্ধনহীন অবাধ্য হয়ে যেন ফুঁসছে। ঘাড় ওর সোজা হলো

না। সূক্ষ্ম কাজলটানা আয়ত কালো চোখে ভ্রূকুটি দৃষ্টি। সবুজবনে লাল ফুল ছাপানো রেশমী শাড়ির আঁচল টানল বুকে। কিন্তু যতটা টানলো, ততটাই খসলো। টানা চোখ, টিকলো নাক, ঈষৎপুষ্ট ঠোঁট, প্রায় ফরসা রঙ, সব মিলিয়ে ওকে রূপসী বলা যাবে কি না সন্দেহ। তবে দৃষ্টি আকর্ষণ করার সমস্তরকম রমণীয় সৌন্দর্যই ওর আছে। স্বাস্থ্যে আছে দীপ্তি। বাড়তি মেদ বলে কিছুই নেই, অথচ প্রায় দীর্ঘ শরীরের গঠন নিখুঁত। কাঁধে ঝুলছে কাজের মেয়েদের মতোই বড় ব্যাগ। বাঁ হাতে ঘড়ি। কানে ছুটো ছোট মুক্তো। বয়েসটা বাড়িয়ে বলতে ভালবাসে। কারণ জানে, ওর বয়সটা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। ঘামাতে হলে ওকে নিয়েই ঘামাতে হয়। চব্বিশটাকে আটাশ বললেও, আটাশে টসটস্‌ই করে। কিন্তু এখন ওর ঘাড় বাঁকানো ভ্রূকুটি চোখে যেন খুবই বিরক্তি, উত্তেজনা আর অভিযোগ, "মানেটা বলো, তবু কেন ওরকম কাছে টেনে নিলে?"

"যে-কথাটার জবাব কোনোদিন দিতে পারিনি, সেই কথাটাই তুমি জিজ্ঞেস কর।" শৈবাল ওর ঘুরন্ত চেয়ারে একটু বাঁ দিকে টাল খেলো: "তোমার সঙ্গে যা সব করি, তাকে অসভ্যতা বলে কি না জানিনে। তবে এখন তুমি আমাকে অসভ্য বলোনি। যে শব্দটা সত্যি প্রোভোকেটিং। আসলে কী জানো রিন্‌টি (সুপর্ণার ডাক নাম) এক এক সময় কেমন হেল্‌পলেস হয়ে যাই: অসহায়কে করুণা কর। দয়া করে বস। অরিন্দম আর কৃষ্ণার মজার কিস্‌সাটা শোনা যাক।"

বত্রিশ বছরের শৈবাল। অধিকাংশ বাঙালীর মতোই শ্যামলা রঙ। বড় চোখ ছুটো ঢুলঢুলু। বুদ্ধির দীপ্তিটাকে শানিয়ে রাখার দরকার করে না। নিজেকে কোনো দিক থেকেই অসাধারণ দেখানো বা জানানোটা লজ্জার বিষয় বলে মনে করে। ভালো কোম্পানির একজন উপযুক্ত একজিকিউটিভ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে সহজেই। প্রাইভেট লিমিটেডের কর্তৃপক্ষ ডিরেকটরদের আস্থাভাজন। সহকর্মীদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো। অধস্তন কর্মচারীদের সঙ্গে আছে একটা অনায়াস মেলামেশা। অথচ এর সমস্ত কিছুর মধ্যেই কোথায় যে একটা দূরত্ব আছে, তা সহজে টের পাওয়া

যায় না। কিন্তু অপরকে সেটা অনুভব করতেই হয়। তবে অহংকারী কেউ বলে না ওকে। মাঝারি লম্বা। সাদা ফুল স্লিভ শার্ট আর ট্রাউজার ওর প্রিয়। অপ্রিয় হলো, রাষ্ট্রীয় ভাষায় যাকে বলে কণ্ঠলেঙুটি। রোমান্টিক চেহারার বাঙালী যুবক বলতে যা বোঝায়, একরকম তাই বলা যায়। কিন্তু এখন ও সুপূর্ণার সঙ্গে যা-ই করে থাকুক, আসলে বত্রিশ বছর বয়সের তুলনায় ওকে শান্ত আর চিন্তাশীল বলে মনে হয়।

সুপূর্ণা বোধহয় ভেবেছিল, আরও কিছু বলবে। কিন্তু শৈবালের কৈফিয়ত দেখার ভঙ্গিতে কথাগুলো শুনে ওর ভ্রূকুটি চোখে হাসির ঝিলিক হানলো। এবং ঠোঁট ফুলিয়ে মুখের অদ্ভুত ভঙ্গি করলো, "অসভ্য!"

"উঠে দাঁড়াতে ইচ্ছে করছে।" শৈবাল যেন দাঁড়াবারই উদ্যোগ করলো।

সুপূর্ণা বসে পড়লো মুখোমুখি চেয়ারে, "কারণ আবার অসহায় হয়ে উঠছো, না? কিন্তু ঐ যে কী সব সেলফ ক্রিটিসিজম্ শুরু করেছিলে, আমরা এ যুগের ছেলেমেয়েরা…?"

"সেটা আর বলতে দিলে কোথায়?" শৈবাল টেবিল থেকে সিগারেটের প্যাকেট তুলে দেখালো! দুচোখে জিজ্ঞাসা অর্থাৎ সুপূর্ণার অনুমতি প্রার্থনা।

সুপূর্ণা ঠোঁটের ভঙ্গি করে, আবার ভ্রূকুটি চোখে তাকালো, "যেন বারণ করলেই শুনবে।"

"অথচ শুনলে কত ভালো হয়।" শৈবাল প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে ঠোঁটে চেপে ধরলো। টেবিল থেকে গ্যাস লাইটারটা টেনে নিল। জ্বালিয়ে সিগারেট ধরাল, "ঘরে ঢুকে হাসতে হাসতে তুমি অরিন্দম আর কৃষ্ণার ঘটনা বলতে আরম্ভ করেছিলে। আমি তোমাকে বসতে বলেছিলুম। তখন তোমার সেই অ্যালিগেশনটা শোনা গেল, অরিন্দমের পাগলা দাপানিটা তুমি আমার মধ্যে দেখতে পাও না। জানতুম, কথাটা তুমি মন থেকে বলোনি। তাই হেসে আবার বলেছিলুম, বস, তারপরে বল। কিন্তু তুমি বসোনি। আমাকে মিথ্যেই একটু খোঁচা দিয়ে, তুমি অরিন্দম আর কৃষ্ণার সমালোচনা শুরু করে দিলে। বললে ওরা নির্লজ্জ, লোভী,

নীতিজ্ঞানহীন, স্বার্থপর ইত্যাদি ইত্যাদি। একমাত্র তখনই আমি এদের সমর্থনে ঐ কথাটা বলেছিলুম, আমি অস্বীকার করছিনে, আমরা এযুগের ছেলেমেয়েরা···”

শৈবাল এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে হাসলো। সুপর্ণা কাঁধের ব্যাগটা নামিয়ে, পাশের চেয়ারে রাখলো। ঘাড় বাঁকিয়ে গালে হাত দিয়ে তাকালো। ওর ঠোঁটের হাসিতে বক্রতা, “কথাটা শেষ কর।”

“স্বার্থপর মানে আমরা এ যুগের ছেলেমেয়েরা।” শৈবাল হাসলো, “স্বীকারোক্তিটা তুমি আমার মুখে আগেও শুনেছো। তাই কথাটা শোনবার আগেই তোমার ঠোঁট বেঁকে উঠেছে। অরিন্দম আর কৃষ্ণাকে দিয়ে কথাটা হয়তো আরো ভালো করেই প্রমাণ করা যায়। আসলে আমার বক্তব্য ছিল, অস্বীকার করবো না, আমরা স্বার্থপর। কিন্তু যাঁরা এই অভিযোগটা করেন, তাঁরা যদি একটু ভেবে দেখতেন, কেন আমরা স্বার্থপর হয়েছি, তা হলে বুঝতে পারতেন, এ ভূমি আর বৃক্ষ সবই তাঁদের হাতে তৈরি। সেজন্য জেনারেশন গ্যাপ্ কথাটায় তাঁদের খুব সুবিধে করে দেয়। কিন্তু কী দেখছি আমরা? স্বার্থপর বলে কি, বোকা কিংবা উল্লুক হয়ে গেছি? অথবা অন্ধ? কিছুই বুঝিনে? আমাদের এ যুগটার ছেলেমেয়েদের বিরুদ্ধে যাঁদের স্বার্থপরতার অভিযোগ, তাঁরা সবাই পরার্থপর? এ সময়ের সমস্ত চেহারাটার দিকে তাকালেই তা স্পষ্ট হয়ে যায়। পরার্থপর পিতৃদেবদের মালিন্য···নাহ্ রিন্‌টি এসব বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করা হচ্ছে। এর চেয়ে অরিন্দম আর কৃষ্ণার গল্প অনেক উপাদেয়। ও সব সেলফ ক্রিটিসিজম-টিজম, অল বোগাস্। লেট্ আওয়ার লার্নেড প্যারেন্ট টু টেল দোজ স্টোরিজ। তারপরে অরিন্দমটা কী করলো? ঘরের ভেতর দরজার আড়ালে যেতে না যেতেই, কৃষ্ণাকে চুমো খেলো তারপরেই হুইস্কির বোতলের মুখটা খুলে ফেলল বাসুদেবের সামনেই···”

সুপর্ণা চেয়ারের পেছনে এলিয়ে পড়ে খিলখিল করে হেসে উঠলো। অবাধ্য রেশমী শাড়ির সবুজ বন লাল ফুল কেঁপে কেঁপে ঝরে পড়তে লাগলো। “বাসুদেব নয়। আমার সামনে। কিছুই মনে নেই তোমার। বাসুদেব

তখন তালা লাগানো অফিস ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল।”

“তোমার সামনে?” শৈবাল যেন স্বস্তিতে এলিয়ে পড়লো ওর চেয়ারে, “সেটা তবু অনেক ভালো। তুমি হলে ওদের বন্ধু। আর বাসুদেব হলো তোমার বাবার অফিসের কেয়ারটেকার। তোমার চোখে ঘটনাটা এরকম। বাসুদেবের চোখে ঠেকতো আর এক রকম। অবিশ্যি তুমি অরিন্দম আর কৃষ্ণার সম্পর্কে মন্তব্য করেছো, নির্লজ্জ, লোভী, নীতিজ্ঞানহীন, স্বার্থপর।”

সুপূর্ণা হাসতে হাসতে, কপালের চুলের গোছা সরিয়ে দিল, “তা বলেছি, কিন্তু রেগে বলিনি। ওদের পাগলামি দেখে আমার হাসি পাচ্ছিল। আর সত্যি লজ্জা করছিল, যদি বাসুদেব দেখতে পেতো? আর কিছু না। একটা সাজানো খালি ঘর পেয়েই ওরা দুজনে যেরকম·· হুইস্কির বোতল খোলাটা কিছু নয়। বাসুদেবই তো জল গেলাস দেবার লোক···কী ব্যাপার? তুমি যেন আবার কিছু ভাবতে আরম্ভ করেছো?”

“আমি?” শৈবাল চমকে সোজা হয়ে বসলো। হাসলো, “না না, কিছুই ভাবছিনে। গোটা ব্যাপারটা একেবারে প্রথম থেকেই আবার শোনা যাক। অরিন্দম অফিসে তোমার ঘরে টেলিফোন করলো। তারপর তোমাকে লাইনে পেয়ে বললো, সুপূর্ণা! আমি আর কৃষ্ণা···”

সুপূর্ণা ওর ঝরে পড়া রেশমী শাড়ি তুলে, বুকের জামায় গুঁজলো। ঘাড় নাড়লো, “উঁহু। অরিন্দম ইন্টারকমে জিজ্ঞেস করলে, সুপূর্ণা, ছটা বাজে। তোমার কি অফিসে এখনো কাজ আছে? আমি বললুম, একটু। কেন বলো তো? অরিন্দম···”

“থাক।” শৈবাল সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়লো “ব্যাপারটা আজকের নয়। দু'দিন ধরেই চলছে। তার চেয়ে একেবারে গোড়া থেকেই শুরু করা যাক। টোটাল অ্যাফেয়ারটার তো শুরু দু সপ্তাহের। মানে, তোমার বিশ্বাস, খাঁটি প্রেম···”

সুপূর্ণা ঘাড়ে ঝাঁকুনি দিল। ঠোঁট বাঁকালো ঈষৎ, “তোমার মতো সকলের চার বছর লাগে না। তোমার হলো তুলনাহীন প্রেম।”

“সেরকম কোনো দাবি নেই।” শৈবাল সিগারেটের শেষাংশ ছাইদানিতে

গুঁজে দিল। "চারিচক্ষের মিলনে প্রথম দর্শনেই উভয়ের হৃদয়ে স্বর্গীয় প্রেম সঞ্চারিত হইল—মানে প্রথম দর্শনেই প্রেম। এই রীতির কথা তুমি বলছো। বেশ, মেনে নিলুম। তবু গোড়া থেকেই শুনি। কী খাবে বল।"

সুপূর্ণা ঘাড় নাড়লো, "কিছুই না। অন্তত তোমার এই ঠাণ্ডা অফিস ঘরে না। বাইরে চল। সময়ও বেশিক্ষণ হাতে নেই। তুমি সঙ্গে আছ বলেই, বড় জোর রাত সাড়ে নটা অব্দি বাইরে অ্যালাউড।"

সুপূর্ণা ওর চাকরিতে বহাল হয়েছে ছ' মাস। ডিপার্টমেন্ট মার্কেটিং। কোনো কোমপানির এ বিভাগে চাকরি পাবার মতো শিক্ষাগত প্রস্তুতি ওর ছিল না। একেবারে অযোগ্যও ছিল না। কমার্সে এম-এ পাশ করে, ও যখন ভাবছিল, বেশ একটা গাল ফোলানো নামের সংস্থায়, এবং এক বিশিষ্ট অডিটরের অধীনে, একাউন্টেন্সিতে হাত পাকাবে ভবিষ্যতের কেরিয়ারের জন্য, তখনই মার্কেট রিসার্চের জন্য নামী কোমপানির বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়েছিল। অথচ দরজায় দরজায় ঘুরে ঐ সমীক্ষার কাজে ওর যাবার কথা নয়। বাবা মা আপত্তি করেছিলেন। শৈবালেরও অন্তরে সায় ছিল না। কিন্তু সুপূর্ণার যুক্তির কাছে ও হার মেনেছিল। যুক্তিটা হলো, 'কোনো কাজই ছোট নয়।' অবিশ্যি ফলটা শেষ পর্যন্ত খারাপ হয় নি। ইণ্টারভিউ পেয়েছিল। এক ডজন মেয়ের সঙ্গে ওর আলাপ হয়েছিল। কৃষ্ণা তখন সেই দলে ছিল না। অরিন্দম সেই মার্কেটিং বিভাগের একজন ছোটখাট অফিসার। মার্কেট রিসার্চের মেয়েদের সাহায্য করাটা ছিল ওর কাজ। প্রত্যেক মেয়ের প্রতিদিনের রিসার্চের রিপোর্ট দেখতেন মার্কেটিং ম্যানেজার। অরিন্দমের সঙ্গে সুপূর্ণার তখন থেকেই একরকমের বন্ধুত্ব হয়েছিল। কারণ, অরিন্দমের বয়স কম। অফিসারসুলভ আচরণ করতো না। অস্থায়ী মার্কেট রিসার্চের মেয়েদের সাহায্যের ব্যাপারে, ও প্রায় সবাইকে ওর সহকর্মীর মর্যাদা দিতো। মেলমেশা করতো বন্ধুর মতো।

এক ডজন মেয়ের মধ্যে, শিকে ছিঁড়েছিল সুপূর্ণার ভাগ্যে। মার্কেটিং ম্যানেজার ওর দৈনিক রিপোর্ট দেখে উৎসাহী হয়েছিলেন। নতুন করে ওর দরখাস্তটা দেখেছিলেন উলটেপালটে। মার্কেটিং-এর সঙ্গে, দাম দস্তুরের

হিসাব নিকাশের সম্পর্কটা বিশেষ কেউ যাচিয়ে দেখে না। সুপূর্ণা দেখতো। ওর রিপোর্টেও সেটা থাকতো। এরকম একটি কাজের মানুষের দারকারও ছিল তখন। মার্কেটিং ম্যানেজার সুপূর্ণাকে ডেকে জানতে চেয়েছিলেন, ঐরকম কোনো পদ ও গ্রহণ করতে ইচ্ছুক কিনা। সুপূর্ণা কারোর সঙ্গে পরমর্শ না করেই মার্কেটিং ম্যানেজারকে ওর সম্মতি দিয়ে দিয়েছিল। বস্তুত-পক্ষে সুপূর্ণার সেটা একটা দৈবযোগে সৌভাগ্যের ঘটনা বলতে হয়।

অস্থায়ী মার্কেট রিসার্চের মেয়েদের কাজের মেয়াদ ছিল দু সপ্তাহের। কোমপানির গাড়িতে বিভিন্ন জায়গায় নেমে যাওয়া, এবং আরো পথ খরচা বাদ দিয়ে ওদের দৈনিক বেতন ছিল পঁচাত্তর টাকা। আধুনিক কোমপানিগুলো বাজার সমীক্ষার জন্য ডজন ডজন ছেলে-মেয়েদের স্থায়ী চাকরি দেয় না। প্রয়োজন হলেই সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেয়। এসব ক্ষেত্রে মেয়েদেরই ডাক পড়ে বেশি।

সুপূর্ণা ওর চাকরিতে বহাল হবার পরে, দুবার বাজার সমীক্ষার জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল। অরিন্দম যদিও ছোটখাটো একজন অফিসার, কিন্তু সুপূর্ণার সহকর্মী। অবিশ্যি বাজার সমীক্ষার মেয়েদের নিয়ে সুপূর্ণার কিছু করার ছিল না। অরিন্দমকেই ঐ বিষয়টি দেখতে হতো। দ্বিতীয় বারের সমীক্ষক মেয়েদের দলে, কৃষ্ণার আবির্ভাব।

অরিন্দম ঐ সব মেয়েদের সাহায্য করে, ভালো ভাবেই কাজ গুছিয়ে নিতে পারতো। ও একজন রসিক যুবক, সন্দেহ নেই। কিন্তু কোনো মেয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে, ওর রসিক প্রাণে প্রেমোদয় ঘটে নি। কৃষ্ণার চোখে চোখ পড়তেই, সেইটি ঘটে গেল। দু সপ্তাহের মেয়াদে, অন্য মেয়েদের থেকে আলাদা করে, ও কৃষ্ণার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলো। দেখা গেল, কৃষ্ণারও একই দশা। দুহুঁ দোঁহা করে লীলা, সাক্ষী অন্তর্যামী। কিন্তু এ সব বিষয় বেশিক্ষণ চেপে রাখা দায়। অরিন্দমের পক্ষে, অফিসে কথাটা প্রাণ খুলে বলবার মতো একজনই ছিল। সুপূর্ণা। অতএব, অফিস ছুটির পরে, সুপূর্ণাকে বন্ধু ও তার প্রেমিকাকে দু তিনটি সন্ধ্যা কিছুক্ষণ সাহচর্য দিতে হলো। আর সব কথা শৈবালকে না শোনালে চলতো না।

কৃষ্ণাকে কি সুপূর্ণার খুব ভালো লেগেছিল ? দেখতে মেয়েটি খারাপ নয় · এক ধরনের আদুরে ফুলটুসি গোছের মেয়ে। চেহারাটি ছোটখাটো হলেও, স্বাস্থ্য ভালো। ওর ইংরেজি বলার ভঙ্গিটি আকর্ষণীয়। কিন্তু বড্ড ভুল বলে। ওর বাবা একজন অবসরপ্রাপ্ত চটকলের লেবার অফিসার। জীবনের শেষ সঞ্চয় নাকি নাকতলায় একটা বাড়ি আর দিদির বিয়ে দিতেই শেষ হয়ে যায়। তারপরেই পর পর দুবার সেরিব্রালে অক্রান্ত হয়ে, একেবারে জ্যান্তে মরা হয়ে আছেন। অথচ ভাই বোনের সংখ্যা চার। আর তাদের সকলের জ্যেষ্ঠ আপাতত কৃষ্ণা। মা আছেন সংসারে। ফলে কৃষ্ণার দায়িত্ব বেশি। টেনশনও। অথচ অরিন্দমকে প্রথম দর্শনেই, পঞ্চশরে কে যে কাকে বিদ্ধ করলো, বোঝা গেল না। কৃষ্ণার এখন অরিন্দমই গতি, মতি ! বাড়ি ফেরার তাড়া নেই। প্রেমে নির্ভয়। অরিন্দমের কাজ মাথায় উঠলো। উভয়েরই নাকি প্রথম প্রেম। বড় উদ্দাম সেই প্রেম।

সুপূর্ণা এই উদ্দামতাকে পছন্দ করেছে। তার মধ্যে অবিশ্যি কথা আছে। কৃষ্ণাকে ওর অরিন্দমের যোগ্য বলে মনে হয় নি ! কিন্তু সেটা ওর দেখবার নয়। অরিন্দম আর কৃষ্ণা উদ্দাম প্রেমে মেতে আছে। এই দেখেই সুপূর্ণার ভালো লাগছে। যে-কারণে শৈবালকে না শুনিয়ে পারে নি, "তোমার আপন ঘরের চৌকাট ডিঙোতে সময় লেগেছিল দু' বছর। যখন তোমার জানার সময় হলো, তুমি জয় করেছো, তখন মাঝে মধ্যে তোমার মধ্যে ঝড় উঠতে দেখা গেল। ডালপালা ভেঙে প্রচুর বর্ষণে ভাসিয়েও দিলে। কিন্তু তার ভেতর থেকেই বোঝা গেল, শৈবাল দত্ত কেবল প্রেমিক নয়। প্রেমিক-সাধক। প্রেম তার কাছে সাধনার বস্তু। অতএব, সুপূর্ণা গুহ হলো তোমার আরাধ্যা দেবী। অথবা কী বলবো ? মাই ফেয়ার লেডি ?"

"বাজে কথা।" শৈবাল আপত্তি করেছে, "ওটা আমার সঠিক মূল্যায়ন হলো না। বলতে পারো, আমার মানুষিক প্রবৃত্তির মধ্যে, প্রকৃতির একটা বড় ভূমিকা আছে। তা বলে, এত ভাবার কোনো কারণ নেই, আমি প্রকৃতির হাতের ক্রীড়নক। যেমন নই প্রবৃত্তির হাতের ক্রীড়নক। এক অর্থে তুমি যেমন প্রকৃতি, তেমনি বিশ্ব নিখিলের প্রকৃতিও আমার মস্তিষ্কে

একটা জায়গা করে রেখেছে। রিন্‌টি, তাতে যদি আমি সাতদিনে চৌকাট ডিঙোতে না পারি, চৌদ্দ দিনের মধ্যে না পারি উদ্দাম হয়ে উঠতে, তা হলে জানবে, আমি নিরুপায় বলেই তা সম্ভব নয়।"

সুপর্ণা চোখ ঘুরিয়ে, গালে হাত দিয়ে বলেছে, "কী নতুন কথাই না শোনালে! তোমার এ কথাগুলো যে শুনবে, সে-ই বলবে, এ সব মাটির সংসারের প্রেমের কথা নয়। উচ্চ মার্গের ঝাঁপিতে তুলে রাখার প্রেম। দরকারের সময়, ঝাঁপি খুলে, আদরে সোহাগে চেখে খেয়ে আবার তুলে রাখতে হয়। আমি অবিশ্যি তাতেই অভ্যস্ত হয়েছি। কিন্তু এখন আমি সময়োপযোগী খাঁটি মাটির সংসারের প্রেম দেখছি। হুঁহু লাগি দোহাঁ মত্ত, এক ঠাঁই বিনা, রহিতে না পারে। একটু অবিশ্যি আদেখলেপনা লাগছে। কিন্তু দোষই বা দিই কেমন করে।"

"দোষ দেবার কিছু নেই রিন্‌টি।" শৈবাল বলেছে, "সংসারে বিবিধের মাঝেই সৌন্দর্য আছে। সত্যও আছে। এ সংসারটা তো অরিন্দম আর কৃষ্ণা ছাড়া নয়।"

অরিন্দম আর কৃষ্ণা যেন লক্ষ্যহীন নক্ষত্রের মতো ছুটে বেড়াচ্ছিল। ওদের এমন একটা জায়গা ছিল না, প্রেম চরিতার্থ করার মতো যেখানে নিভৃতে আশ্রয় নিতে পারে। সুপর্ণার প্রাণ উঠলো কেঁদে। শৈবালকেও কিছু জিজ্ঞেস করে নি। অফিসের কাছেই ওর বাবার অফিস। অফিস সংলগ্ন বিশ্রাম নেবার মতো ঘর বিছানা, খাবার ব্যবস্থা, একটা ফ্রিজ, ছোটখাটো কিচেন, সবই ছিল। বাসুদেব বেরা তার পুরনো বিশ্বস্ত কেয়ারটেকার। রাত্রে সেখানে অফিস ঘরের একপাশে তার ছোট ঘর। ষাট বছরের বাসুদেব, সুপর্ণাকে চেনে ছেলেবেলা থেকেই। সুপর্ণা প্রথমে একটু লজ্জা পেয়েছিল। কিন্তু অরিন্দম আর কৃষ্ণার জন্য কিছু একটা করার দায়িত্ববোধেই লজ্জা ত্যাগ করে, ওদের নিয়ে তুললো বাবার অফিসে। বললো, "বাসুদেবদা, এরা আমার বন্ধু। ঘণ্টা দুয়েক থেকে চলে যাবে। দরকার হলে, তুমি একটু দেখো।" অবিশ্যি আড়ালে আগেই বলে রেখেছিল, "বাবাকে যেন বলো না।"

বাসুদেব বলেছে, "তোমার হুকুম মানছি। কিন্তু দেখো রিনটিদিদি, শেষে তোমার কাছ থেকেই যেন সাহেবের কানে কথাটা না যায়। তা হলে চল্লিশ বছরের বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যাবে।"

অরিন্দম কৃষ্ণাকে ঐরকম একটি নিভৃত ঘরের মধ্যে পেয়ে, প্রথমেই যে-ভাবে জড়িয়ে ধরে চুমো খেয়েছিল, সুপূর্ণার মোটেই ভালো লাগে নি। শৈবালকে ও মুখ ফুটে আরো যা বলতে পারে নি, তা হলো, কেবল চুমো নয়। সেই মুহূর্তেই অরিন্দম আরো অধিক কিছু করতে উদ্যত হয়েছিল; খেয়ালই ছিল না সুপূর্ণা তখনও রয়েছে। বাসুদেব দূরে অপেক্ষা করছিল। কৃষ্ণার পর্যন্ত মনে হয়নি, সুপূর্ণাকে বিদায় জানিয়ে, দরজাটা বন্ধ করা দরকার। এসব যে ওদের প্রেমের উদ্দামতারই অঙ্গ, সুপূর্ণা তখন ততোটা মেনে নিতে পারে নি বলেই, শৈবালের কাছে অভিযোগ করেছে। ওরা লোভী নীতিজ্ঞানহীন নির্লজ্জ স্বার্থপর। সুপূর্ণাকে বাধ্য হয়েই ওদের সামনে যেতে হয়েছিল। অরিন্দম অতএব, সেই ফাঁকে হুইস্কির বোতলের ছিপি খুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। আর হেসে ক্ষমা চেয়েছিল, "সরি সুপূর্ণা।"

"সরিটরির কিছু নেই।" সুপূর্ণা হেসেছিল, "আমি যাচ্ছি। তোমরা দরজা বন্ধ করে দাও। বাসুদেবদা ফ্রিজ থেকে জলের গেলাস আর বোতল আগে দিয়ে যাক। আর খাবার-টাবার কিছু দরকার হলে, বাসুদেবকে বলো, এনে দেবে। গুড নাইট।"

অরিন্দম গভীর কৃতজ্ঞতায়, সুপূর্ণার সঙ্গে করমর্দন করেছে, "জীবনে এ উপকারের কথা ভুলবো না।"

গোড়া থেকে আজ পর্যন্ত, সতরো দিনের এই হলো অরিন্দম-কৃষ্ণার প্রেম কাহিনী। রেড রোডের ধারে, গাছের ছায়ার অন্ধকারে। গাড়ির মধ্যে বসে শৈবাল সুপূর্ণার কথা সব শুনলো। হাওয়া ছিল না। আবহাওয়া গুমোট। গাড়ির ভেতরে গরম হচ্ছিল। ঘামছিল দুজনেই, ঘন সান্নিধ্যে বসে। শৈবাল কোনো অবকাশ না দিয়েই, ঝটিতি সুপূর্ণার ঠোঁটে নিজের ঠোঁট ছোঁয়ালো। একটা সিগারেট ধরালো, "অরিন্দম আর কৃষ্ণাকে আমি বেচারি বলে ছোট করবো না। কিন্তু তোমার মহত্বের তুলনা নেই। এই

একটা বিষয়ে যদি, আজ সমীক্ষা করা যেতো, কতো তরুণ তরুণী, একটু নিভৃত আশ্রয়ের জন্য কলকাতা শহরের পার্কে বাগানে গঙ্গার আর ঝিলের ধারে পাগলের মতো ছুটে বেড়াচ্ছে। অথচ এক মিনিটের সুযোগও পাচ্ছে না, তা হলে দেখা যেতো, চিত্রটা কী নিষ্ঠুর আর নিদারুণ। আমি জানিনে, অরিন্দমের হোটেল ঘর নেবার যোগ্যতা আছে কি না। কিন্তু ঐ সব হাজার হাজার তরুণ-তরণীর হোটেল ঘর ভাড়া করার পয়সা নেই। তারা বেকার। তুমি তাদের জন্য বন্ধুকৃত্য করতে পারো না। সম্ভব নয়। কিন্তু তারা তোমার কীতির কথা শুনলে জয়ধ্বনি দেবে।"

"ঠাট্টা?" সুপূর্ণা ঘাড় বাঁকিয়ে ভ্রূকুটি চোখে তাকালো। দৃষ্টিতে সন্দিগ্ধ জিজ্ঞাসা।

শৈবাল মাথা নেড়ে হাসলো। টেনে ধরলো সুপূর্ণার একটা হাত, "বিশ্বাস কর, সব বিষয়ে ঠাট্টা চলে না। আমি এ সময়েরই বত্রিশ বছরের এক যুবক। অরিন্দম কৃতজ্ঞতায় তোমার করমর্দন করেছে। আমি হলে তোমার মতো বন্ধুর পায়ে হাত দিতুম। এ যুগের ছেলেমেয়েদের স্বার্থপরতার প্রসঙ্গে, আমার স্বীকারোক্তিটার মূলে ছিল এই কথাটাই। এ যুগ আমাদের কোথায়, কোন্ হতচ্ছাড়া শূন্যতায় ছুঁড়ে ফেলেছে। ব্যক্তিগতভাবে আমার সুযোগ সুবিধে নিশ্চয়ই অনেক বেশি। তার মানে, আমি তো যুগ-ছাড়া নই।"

সুপূর্ণা নিজেই শৈবালের দিকে মুখ তুলে ধরলো। তখনই খুব কাছ থেকে অন্য একটা গাড়ির হেডলাইটের আলো যেন ওদের স্নান করিয়ে দিল! সুপূর্ণা তাড়াতাড়ি শৈবালের বুকে মাথাটা নামিয়ে, গুঁজে দিল।

বেলা এগারোটা। শৈবাল অফিসে এসেছে সাড়ে ন'টায়। সাড়ে দশটায় ডাক পড়েছিল জেনারেল ম্যানেজারের ঘরে। জেনারেল ম্যানেজারের ঘর থেকে নিজের ঘরে ঢুকতেই, বাইরের টেলিফোনটা বেজে উঠলো। চেয়ারে না বসে ও রিসিভারটা তুলে নিল, "হ্যালো ?"

"আমি রিনটি বলছি।" ওপার থেকে সুপর্ণার উত্তেজিত স্বর ভেসে এলো। "ওরা গতকাল রাত্রে কী করেছে জানো ?"

শৈবাল বলতে যাচ্ছিল, "তা আর জানি নে ?" কিন্তু তাড়াতাড়ি নিজেই মাথা নাড়লো, "কী করেছে ? কোনোরকম - ?"

"কোনোরকম টোনোরকম কিছু নয়।" সুপর্ণার স্বরে ঝাঁজ, "ওরা গত-কাল সারা রাত্রি ওখানে ছিল। অরিন্দম আজ সকালে কৃষ্ণাকে নাকতলায় বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে নিজের বাড়ি ফিরেছে। অবিশ্যি, অরিন্দমের মুখ থেকে কিচ্ছু শোনবার আগেই, অফিসে এসেই বাসুদেবদার টেলিফোন পেয়েছি। বাসুদেবদাই আমাকে বললে, ওরা সারারাত্রি বাবার অফিসের ঘরে ছিল। আজ সকাল সাতটায় সেখান থেকে দুজনে বেরিয়েছে। আমি ভাবতে পারিনে, একটা ভদ্রলোকের মেয়ে, আনম্যারেড, কী করে বাড়িতে না জানিয়ে সারারাত্রি বাইরে কাটালো।"

শৈবাল যেন সুপর্ণাকে শান্ত করার চেষ্টা করলো, "কৃষ্ণা হয়তো বাড়িতে টেলিফোন করে জানিয়েছে যে···"

"কিসের টেলিফোন ? কোথায় টেলিফোন ?" টেলিফোনের ওপার থেকে সুপর্ণার স্বর রোষে ফেটে পড়লো, "কৃষ্ণাদের বাড়িতে টেলিফোন নেই। সে-সব কথা একটু আগেই আমি অরিন্দমের মুখ থেকে শুনলাম। ও একটু বেলায় অফিসে এসেছে। ও আমার সঙ্গে দেখা করে, নিজেই সব কথা বললে। অবিশ্যি ওর মুখ দেখতে আমার ঘেন্না করছিল। কিন্তু ও

অকপটে সব সত্যি কথা বলেছে—মানে ও যে গতকাল রাত্রে খুবই হেল্পলেস হয়ে পড়েছিল, সেটা আমাকে বুঝিয়েছে। আর কৃষ্ণার কথাও বললো, ও নিজেই কৃষ্ণাকে বাড়ি যেতে দেয় নি। সেইজন্য ও নিজে গিয়ে কৃষ্ণাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এসেছে। অথচ অরিন্দম এর আগে কোনো-দিন কৃষ্ণাদের বাড়ি যায় নি। মা বাবা ভাইবোনরা কেউ ওকে চেনে না। এটা আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছি নে। অরিন্দম যতোই ওকে গার্ড করার চেষ্টা করুক।"

শৈবাল সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলো, "রিন্‌টি, অরিন্দম কৃষ্ণাকে তোমার কাছে গার্ড করবে কেন? ও তো তোমার কাছে সব কথা স্বীকার করছেই। ও নিজেই কৃষ্ণাকে গতকাল রাত্রে বাড়ি ফিরতে দেয় নি। কৃষ্ণা বেচারি—"

"কৃষ্ণা মোটেই বেচারি নয়।" সুপূর্ণার স্বরে অবিশ্বাস আর ঝাঁজ, দুই-ই ভেসে এলো, "আমি অরিন্দমকে বলেছি, তুমি আটকে রাখলে বলেই কৃষ্ণা কী করে বাড়িতে না জানিয়ে সারারাত্রি বাইরে কাটিয়ে গেল, আমি কিছুই বুঝতে পারছি নে। তুমি একটা অচেনা ছেলে। তুমি পৌঁছে দিতে গেলে। কৃষ্ণার মা তোমাকে কিছু বললেন না? অরিন্দম বললে, কৃষ্ণার মা নাকি ওর কথা আগেই কৃষ্ণার মুখ থেকে শুনেছিল। সারারাত্রি দুশ্চিন্তায় ঘুমোতে পারে নি। অরিন্দম নিজে গিয়ে পৌঁছে দিতে, কৃষ্ণার মা নাকি খুব খুশি আর নিশ্চিন্ত হয়েছে। জানি নে, এ কেমন মা, আর কী করেই বা খুশি আর নিশ্চিন্ত হতে পারে। তোমার সঙ্গে তো আমার এতদিনের পরিচয়। বাড়িতে তোমার আমার সম্পর্কের কথা কারোর জানতে কিছু বাকি নেই। কিন্তু আমি তো এখনো ভাবতেই পারিনে, বাড়িতে কোনো খবর না দিয়ে, সারারাত্রি তোমার সঙ্গে বাইরে কোথাও থেকে যাবো। পারি কী?"

শৈবাল হাসলো, "তোমার সঙ্গে কৃষ্ণার তুলনা দিচ্ছো কেন? সব মেয়ে যদি একরকম হতো, তা হলে তো সংসারটার চেহারাই অন্যরকম হয়ে যেতো। তা ছাড়া..."

"তা ছাড়া?" সুপূর্ণার স্বর তৎক্ষণাৎ তারের ভেতর দিয়ে ভেসে এসে

শৈবালের মুখের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

শৈবালের মুখে ঈষৎ উদ্বেগ মিশ্রিত হাসি ফুটলো, "রাগ করো না রিন্‌টি। উদ্দামতার একটা ব্যাপার আছে তো। দুজনের অবস্থার কথা তোমার মুখ থেকে যা শুনেছি, তাতে এরকম ঘটাটা কি খুব অসম্ভব? তা তুমি বন্ধুকে সাহায্য করতে গিয়েও, যতোই নির্লজ্জ, নীতিজ্ঞানহীন স্বার্থপর বল, তুমি শেলটার দিয়েছিলে বলে গতকাল রাত্রে ওরা জীবনে প্রথম— ভেরি ন্যাচারেল। বিশেষ স্বয়ং কৃষ্ণাই যখন থাকতে রাজি হয়ে গেছলো—"

"থাক।" সুপূর্ণা এক কোপে শৈবালের কথা থামিয়ে দিল, "তোমার মুখে ও কথা মানায় না। আমি রাজি হলেই কি তুমি ওরকম ভাবে রাত্রি কাটাতে পারতে?"

শৈবাল মাথা নাড়লো, "না, তা পারতুম না। প্রথমত তোমার বাড়িতে কোনো খবর থাকবে না, আমার পক্ষে সেটা করা সম্ভবই হতো না। তুমিও রাজি হতে পারতে না।"

"আমার বিষয়ে এত নিশ্চিত হচ্ছো কেন?" সুপূর্ণার স্বরে এতক্ষণে কিঞ্চিৎ হাসির তারল্য ভেসে এলো, "রাজি যদি হয়েই যেতাম, তা হলে?"

শৈবাল জবাব দিতে গিয়ে, ভ্রূকুটি চোখে রিসিভারের দিকে তাকালো। তারপরে হাসলো, রিন্‌টি. তুমি ঠিকই বুঝেছো, তোমার বাবা মাকে না জানানোর দায়িত্ব অস্বীকার করা আমার পক্ষে অসম্ভব হতো। তা ছাড়া আমার বাবা মা-ই বা কী দোষ করেছেন বলো? যতো স্বার্থপরই হই, তাঁরা জানেন, আমি অকারণে বেপরোয়া আর উচ্ছৃঙ্খল হতে পারিনে।"

"অকারণে?" সুপূর্ণার স্বরে বিস্ময়, ওর কৌতুকের হাসকে চাপা দেবার চেষ্টা করছে।

শৈবাল হাসলো. "একটা সিগারেট ধরাতে ইচ্ছে করছে। যাই হোক, তা অকারণেই বই কি! আমার যদি তোমাকে নিয়ে বাইরে রাত্রি কাটাতেই হয়, কেনই বা আমি অকারণে, তোমার বা আমার বাড়ির লোকদের সারারাত্রি দুশ্চিন্তায় রেখে দেবো? অন্তত এটা কেন জানাবো না, আমি রাত্রে বাড়ি ফিরবো না।"

"আসলে অরিন্দমের যে গাটস্ আছে, তোমার তা নেই।" সুপূর্ণার স্বরে হাসির ঝঙ্কার এখন স্পষ্ট।

শৈবাল এবার রিসিভারটা নিয়ে চেয়ারে গিয়ে বসলো, "অস্বীকার করবো না। সীতা হরণের বেলায় রাবণের যে গাটস্ ছিল, রামের তা ছিল না। এটা তুলনা নয়। আমি আর অরিন্দম এক নই, এ কথা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু রিন্‌টি গুহ আর কৃষ্ণা এক, এ সিদ্ধান্তে আমি এখনই আসতে পারছিনে।"

"ছাড়ো ওসব কথা।" সুপূর্ণার স্বরে ব্যস্ততার সুর ভেসে এলো, "ছুটির পরে তুমি আমাকে তুলছো, না আমি তোমার কাছে যাচ্ছি?"

শৈবাল হেসে উঠলো, "এত আর্লি তো কোনোদিন এটা ঠিক করা যায় না। পাঁচটায় টেলিফোনে সেটা ঠিক হয়। ভুলে গেলে নাকি?"

"সরি।" সুপূর্ণার খুশির স্বর ভেসে এলো, "ভুলেই যাচ্ছি। কাজকর্ম ছাই কিছুই ভালো লাগছে না। রাখছি।"

লাইন কেটে গেল। শৈবাল রিসিভারটা নামিয়ে রাখলো। মাথা নেড়ে হাসলো। রিন্‌টিটার সত্যি মাথায় ছিট আছে। কখন রাগছে, কখন হাসছে, কোনো কিছুর ঠিক নেই। ওর টেবিলে এক গুচ্ছ কাগজ। প্রত্যেকটাতেই লাল রঙের আর্জেন্ট ছাপ মারা। সবগুলোই এখুনি দেখতে হবে, এবং যথারীতি ব্যবস্থা করতে হবে। ও আগে একটা সিগারেট ধরালো। আর সেই ফাঁকেই মনে পড়লো, তখন পর্যন্ত ও অরিন্দমকে চোখে দেখে নি। অতএব কৃষ্ণাকে দেখার প্রশ্নই আসে না। তথাপি শৈবাল যে ওদের একেবারে বুঝতে পারে না, তা নয়। তার মেকি মূল্যবোধের সম্পর্কে ও সচেতন। কিন্তু নিজেকে যতোটা চিনতে শিখেছে, সেই নিরিখে, সন্দেহ নেই, অরিন্দমের মতো উদ্দাম ও বেপরোয়া ও কোনো কালেই হতে পারবে না। একটা কথা ভাবতেও লজ্জা করছে। তবু নিজের কাছে অস্বীকার করতে পারছে না, কৃষ্ণা মেয়েটিকে ওর কেমন করুণ আর অসহায় মনে হচ্ছে।

বিকেল পাঁচটার আগেই বাইরের টেলিফোন বেজে উঠলো। দুপুরে আধ-

ঘণ্টা বিশ্রাম ছাড়া, শৈবাল টেবিল থেকে মুখ তুলতে পারে নি। অনেকের সঙ্গে কথা বলতে হয়েছে। এখনো ওর কাজ সারতে বেশ বাকি। রিসিভার তুলতেই, ভেসে এলো, "রিন্‌টি।"

"হুঁ। তোমার কাজ শেষ?"

সুপর্ণার একটু উচ্ছ্বাস ভরা ব্যস্ত স্বর ভেসে এলো, "কাজের আবার কোনোদিন শেষ আছে নাকি? অরিন্দম ধরেছে, তুমি আমি, দুজনেই আজ ওদের—মানে কৃষ্ণা অফিসের বাইরে এক জায়গায় অপেক্ষা করছে—আমরা চারজনে কোথাও বেরিয়ে পড়বো। প্লিজ, কাজের দোহাই দিও না। তুমি চলে এসো আমার অফিসের সামনে "

"কিন্তু রিন্‌টি, যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধে হয়।" শৈবাল অস্বস্তিতে হাসলো, "সত্যি কাজের দোহাই দিতেই হচ্ছে। ভাবছিলুম, তুমি টেলিফোন করলে, তোমাকে আমার অফিসে আসতে বলবো। সাড়ে ছটার পরে বেরোবো।"

সুপর্ণার স্বরে আবদার ও জেদ্ একসঙ্গে ভেসে এলো, "না, প্লিজ, তুমি আর কাজ করবে না। আমার বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে তুমি আমি একটু আড্ডা দিতে পারিনে? তুমি গাড়িটা নিয়ে চলে এসো। আমরা এখুনি ডায়মণ্ড-হারবারের দিকে চলে যাবো। এখন বেরোলে রাত্রি দশটার মধ্যে নিশ্চয়ই ফিরতে পারবো। তুমি বললেই, আমি বাড়িতে টেলিফোন করবো।"

"রিন্‌টি, প্রোগ্রামটা আগামীকালের জন্য তুলে রাখলে হয় না?" শৈবালের স্বরে অস্বস্তি ও অসহায়তা। আজ এখুনি আমার বেরোনো সম্ভব নয়।"

সুপর্ণার ঝাঁজ মেশানো দৃঢ় স্বর ভেসে এলো, "না, আজকের প্রোগ্রাম আগামীকালের জন্য তুলে রাখা যাবে না। সব সময় তোমারই একমাত্র কাজ থাকবে, তোমার কথাই রাখতে হবে, তা হয় না। আমি অরিন্দমকে বলেছিলুম, তুমি নিশ্চয় গাড়ি নিয়ে আসতে পারবে। তা আজ পারছো না, আমরা একটা ট্যাকসি নিয়েই যাচ্ছি।"

"তার মানে, আমাকে তোমাদের সঙ্গ থেকে বঞ্চিত করছো।" শৈবালের মুখে বিমর্ষতার ছায়া। হাসি ও স্বরে বিষণ্ণতা।

সুপর্ণার ভেসে আসা স্বরে কোনো পরিবর্তন ঘটলো না, "আমরা তোমাকে বঞ্চিত করছি নে। তুমিই আমাদের সঙ্গে আসতে চাইছো না। কাজ একলা তুমিই কর, আর কেউ করে না। কিন্তু মনে রেখো, কাজ ছাড়াও জীবন আছে। বন্ধুদের কাছে আমার মর্যাদার কোনো মূল্যই দিতে চাও না। যাকগে, কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। তুমি যখন আসতে পারছো না, আমরা একটা ট্যাকসি নিয়েই বেরিয়ে পড়ছি।"

"প্লিজ, রিন্‌টি, একটু বিবেচনা…"

সুপর্ণার ঝাঁজালো স্বর শৈবালের রিসিভারে ঝাঁপিয়ে পড়লো, "বিবেচনার কিছু নেই। ইট ইজ ডিসিশন। আমার থেকে কাজটাই তোমার কাছে চিরদিন বড় হয়ে থাকবে, তা মেনে নিতে পারি নে, মনে রেখো তুমি বন্ধুদের কাছে আমাকে অপমান করলে। ছাড়ছি।"

মুহূর্তেই টেলিফোনের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। সুপর্ণার স্বর শেষ-দিকে কান্নায় রুদ্ধ হয়ে এসেছিল। শৈবাল তবুও নিরুপায়। ও রিসিভারটা আস্তে আস্তে নামিয়ে রাখলো। সুপর্ণার কান্নারুদ্ধ স্বর ওর কানে ভাসছে। কিন্তু সুপর্ণার ক্রুদ্ধ কঠিন কথাগুলোও ও ভুলতে পারছে না। ও বেলার কথার সঙ্গে এ বেলার সহসা ডায়মণ্ডহারবার যাবার সিদ্ধান্তকে মেলানো কঠিন। ও বেলা, সুপর্ণার কথা শুনে মনে হয়েছিল, অরিন্দম আর কৃষ্ণার ব্যাপারে ও অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ। বিশেষ করে কৃষ্ণার সম্পর্কে ওর ধারণা যে মোটেই ভালো নয়, তা বোঝা গিয়েছিল। অরিন্দমের অকপট স্বীকা-রোক্তি সত্ত্বেও। বাবার অফিসের পুরনো বয়স্ক কেয়ারটেকারের কাছে নিজের অসম্মানটা ও ভুলতে পারে নি। শৈবালের অন্তত সেইরকম ধারণা হয়েছিল। তারপর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে, এমন কী ঘটে গেল, বন্ধুপ্রীতিতে হঠাৎ সকলে মিলে বেড়াতে বেরিয়ে পড়বার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল? খুবই অসঙ্গত আর যুক্তিহীন লাগছে। সুপর্ণার কাছ থেকে এমন অসঙ্গত ব্যবহার ও প্রস্তাব, প্রত্যাশা করা যায় না। বিশেষ ওর এমন আকস্মিক রাগ জেদ অত্যন্ত বিস্ময়কর। কেবল কি বিস্ময়কর!

শৈবাল একটা উদ্‌গত দীর্ঘশ্বাস চাপলো। টেবিলে হাত বাড়িয়ে, প্যাকেট

থেকে সিগারেট বের করে ঠোঁটে চেপে ধরলো। লাইটার জ্বালিয়ে সিগারেট ধরালো। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে, মাথা নাড়লো। ঠোঁটে বিষণ্ণ হাসি। মনে মনে বললো, "রিন্‌টি, তোমার চেয়ে কাজকে বড় করে দেখিনি। কাজ তার সমূহ দাবি মিটিয়ে নিয়ে সরে পড়ে। ওটার সঙ্গে জীবনযাত্রার এক-দিকের যোগাযোগ। আমি যদি সাহিত্যিক শিল্পী হতুম, তা হলে কাজের বিষয়টা হয়তো আলাদা করে ভাবতে হতো। তবুও স্বীকার করতে হবে, এখানে আমার সততা ও বুদ্ধিকে ছেড়ে দিতে পারি নে। কিন্তু তুমি তো সমূহ দাবি মিটিয়ে নিয়ে চলে যাবার নও। তুমি আমার অফিসের টেবিলের কাজ নও। তুমি তার চেয়ে অনেক বড়। তোমার দাবি যেমন কাজের মতো নয়, তেমনি আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক, পরস্পরের তথাকথিত নরনারীর দাবিরও অধিক। অন্তত আমি তাই মনে করি। আমি তোমাকে ভালবাসি। কিন্তু সে ভালবাসায় এমন কোনো শর্ত থাকা উচিত নয়, যা জীবনের নিয়ন্ত্রণকে ভেঙেচুরে ফেলবে। চাকুরে শৈবালের মুখে কথাটা স্বার্থপরের মতো শোনাতে পারে। আর যাই হোক, তোমার কাছে আমার স্বার্থপরতার কিছু নেই। চার বছরে যদি আজ তোমার সে-কথা মনে হয়, তা হলে আমি নাচার। তবু উচ্ছ্বাসের বশে কোনো রকমের অসঙ্গতিকেই আমি মেনে নিতে পারি নে..."

লাল অক্ষরে 'আর্জেন্ট' লেখা সমস্ত ফাইলগুলো সামনে টেনে নিল। কিন্তু কেমন একটা অচেনা কষ্ট কোথায় বিঁধে আছে। ও ফাইল খুললো। ইন্টারকম টেলিফোনটা বেজে উঠলো। রিসিভার তুলে নিল তৎক্ষণাৎ, 'ইয়েস ?...না না। আমি তো জানি, সবগুলোই খুব জরুরি।...না, তাও করবো না। আগামীকালের জন্য কিছুই ফেলে রাখবো না। আমি আজই সবগুলো মিটিয়ে ফেলবো।...আজ্ঞে না· মিস্ চৌধুরিকে আমার দরকার নেই। ওঁকে আমি ছেড়ে দিয়েছি। আমি নিজেই টাইপ করে নেবো। 'থ্যাঙ্ক য়ু স্যার...নো মেনশন প্লিজ।'

ডিরেকটর-কাম-জি-এম-এর ফোন। ভদ্রলোক জেনে নিলেন, শৈবাল জরুরি কাজগুলোকে কতোটা গুরুত্ব দিচ্ছে। কিন্তু তিনি নিজেই চাইছিলেন,

কাজগুলো আজ সব শেষ না করে, আগামীকাল করলেও হবে। শৈবাল সেরকমই ভেবে রেখেছিল। আরো টানা দেড় ঘণ্টা কাজ করে, বেশ কিছুটা এগিয়ে রাখবে। তারপরে সুপূর্ণা এলেই উঠে পড়বে। আপাতত আর তার কোনো সম্ভাবনা নেই। ঘটনার মোড় ঘুরে গিয়েছে অন্য দিকে। অতএব, সুপূর্ণাহীন সন্ধ্যা কাজে ডুবে থাকাই ভালো।

পরের দিন লাঞ্চ আওয়ারের পর, শৈবালের খেয়াল হলো, সুপূর্ণা টেলিফোন করে নি। গতকালের জরুরি কাজগুলো এই মাত্র সাঙ্গ হলো। শৈবাল স্বস্তি বোধ করছে। কেবল স্বস্তি নয়। আরও অধিক কিছু। সুপূর্ণাকে দেখতে ইচ্ছে করছে। কাছে পাবার ব্যাকুলতা অনুভব করছে। অন্তত টেলিফোনে গলার স্বরটা এখন শুনতে পেলে ভালো লাগতো। আর আজ ও এখুনি, এই মুহূর্তেই অফিস থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। সুপূর্ণার সাধ মিটিয়ে, ওর বন্ধুদের নিয়ে যে-দিকে খুশি বেড়াতে চলে যেতে পারে। একটা বিশেষ কাজের দায়িত্ব মেটানোর স্বস্তি ও আনন্দ যে কতোখানি, ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ বুঝবে না।

শৈবাল বাইরের টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিল। ডায়াল করতে গিয়ে, থমকে গেল। সুপূর্ণার গতকালের ক্রুদ্ধ ক্ষুণ্ণ জেদের কথাগুলো বড় জোর কানের মধ্যে বেজে উঠলো। ও হয়তো এখনো রেগে আছে। শৈবাল আস্তে আস্তে রিসিভারটা নামিয়ে রাখলো। ওর মুখে ফুটে উঠলো কোমল হাসি। সুপূর্ণা নিজেই বিকেলে হয়তো টেলিফোন করবে। কতোক্ষণ আর মাথা গরম করে থাকবে।

শৈবাল ইন্টারকম্ টেলিফোনের রিসিভার তুলে, দুটো নম্বর ডায়াল করলো। ওপার থেকে জবাব এলো, "অফিসারস ক্যান্টিন।"

"আমি দত্ত বলছি মিঃ গুপ্ত।" শৈবালের স্বরে আলস্যের সুর, "আজ আপনার লাঞ্চের মেনু কী?"

মিঃ গুপ্ত অফিসারস ক্যান্টিনের ম্যানেজার। তাঁর গলার স্বর শৈবালের চেনা। কিন্তু মিঃ গুপ্তের স্বরে রাজ্যের বিস্ময়, "আপনি খোঁজ করছেন লাঞ্চের মেনু? আপনি তো স্যার কোনো দিন আমার এখানে লাঞ্চ করেন না?"

"কোনো দিন না করলে কি একদিনও করতে নেই ?" শৈবাল হাসলো।
মিঃ গুপ্তর বিনীত ব্যগ্র স্বর শোনা গেল, "কেন নেই। নিশ্চয় করতে আছে। মেনুর মধ্যে ফ্রায়েড রাইস্, মুগের ডাল, ইলিশ মাছ, বিন্সের তরকারি আছে। তাছাড়া আছে ভেটকি আর ম্যাকরেলের ফ্রাই, চিকেন স্টু। তাছাড়া যদি আরো কিছু করে দিতে বলেন..."
"আমার এত সব দরকার নেই।" শৈবাল মিঃ গুপ্তকে আশ্বস্ত করলো, "আপনার ওখানে চিকেন স্যাণ্ডউইচ মিলবে না ?"
মিঃ গুপ্তর তৎক্ষণাৎ জবাব, "কেন মিলবে না স্যার ? ইলিশ মাছ ভাজা খাবেন ? খুব ভালো—মানে, বাংলাদেশের ইলিশ আছে। আমি নিশ্চয় আপনাকে খুশি করতে পারবো।"
"আমি মিনিট পনের কুড়ি বাদে যাচ্ছি।" শৈবাল রিসিভার নামিয়ে রাখলো। ওর মুখে হাসি ফুটলো। মিঃ গুপ্ত বোধহয় ধরেই নিয়েছেন, ও ডিরেক্টরের হয়ে অফিসারস ক্যান্টিনের খাবার এবং ব্যবস্থাদি পর্যবেক্ষণে যাচ্ছে। এ সব ক্ষেত্রে এরকম ভাবাটা কিছু অন্যায় নয়। কারণ, এমনটা ঘটতেই পারে। ও বেল টিপে বেয়ারাকে ডাকলো।
বেয়ারা দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো। শৈবাল মুখ না তুলেই বললো, "মিস চৌধুরিকে একবার ডেকে দাও।"
"আজ্ঞে !" বেয়ারা চলে গেল।
শৈবাল দ্রুত হাতে ফাইলগুলো সাজিয়ে ফেললো। গতকালও প্রায় রাত্রি নটা অবধি কাজ করেছে ; সমস্ত টাইপ করা কাগজগুলো আলাদা করে রাখা ছিল। মিস চৌধুরি এলো। অনধিক তিরিশ বছর বয়স। অনতিদীর্ঘ স্বাস্থ্যবতী এবং দেখতে সে যতটা ভালো, তার চেয়েও সযত্নে নিজেকে সাজাতে জানে। ওর নাম পাপিয়া। এক মুখ হাসি নিয়ে ঢুকলো, "গুড আফটারনুন মিঃ ডাট্। শুনলুম, গতকাল অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করেছেন ?"
"গুড আফটারনুন ! অনেক রাত নয়, নটা পর্যন্ত।" শৈবাল ফাইলগুলো আর টাইপ করা কাগজগুলো এগিয়ে দিল, "আমি কিছু কাজ এগিয়ে রেখেছি। আপনি আজ আর আগামীকাল বিফোর লাঞ্চ, আমার সাজিয়ে

রাখা কাজগুলো পর পর শেষ করে দেবেন। খুব জরুরি কাজ। যদি অসুবিধে বোঝেন, আমাকেও বলতে পারেন। অবিশ্যি আমার আবার রুটিনমাফিক কাজগুলো রয়েছে।”

মিস্ চৌধুরি আগে টাইপ করা শিটগুলো হাতে তুলে নিল, “আপনার টাইপ খুব সুন্দর। আমি সব ঠিক করে ফেলবো। আপনি ভাববেন না। বেয়ারাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, ফাইলগুলো নিয়ে যাবে।”

“থ্যাংক্যু মিস চৌধুরি।” শৈবাল হাসলো।

মিস চৌধুরি তার কাজল মাখা চোখে হাসির ঝিলিক হানলো, “নো মেনশন মিঃ ডাট্।”

মিস চৌধুরি বেরিয়ে গেল। শৈবাল ওর ঘর থেকে বেরিয়ে, ক্যান্টিনে যাবার আগে, দু একজনের ঘরে ঢুঁ মারলো। ক্যান্টিনে গেল। দুটো ইলিশমাছ ভাজা খাবার পরে, এক কাপ কালো কফি ছাড়া আর কিছুই খাওয়া সম্ভব হলো না। ঘরে ফিরে যথারীতি কাজে বসলো। জি. এম.-এর ঘর থেকে ডাক এলো বিকেল চারটেয়। আধ ঘণ্টা পরে ফিরে এলো। বাইরের টেলিফোন দুবার বেজে উঠলো। দুবারই আশাহত হলো। কাজের লোক, কাজের কথা। সুপর্ণার স্বর শোনা গেল না। সুপর্ণা সাধারণত পাঁচটা পর্যন্ত অফিস করে। খুব প্রয়োজন হলে, সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত। তার মধ্যে টেলিফোন না এলে, শৈবালই করবে। কিন্তু তা আর করতে হলো না। পাঁচটা বাজতে পাঁচ মিনিট আগেই সুপর্ণার টেলিফোন এলো। তবে ওর সেই স্বাভাবিক আর চেনা স্বরের কথা শোনা গেল না, “রিন্টি।” পরিবর্তে শোনা গেল, “তোমার কাজে ব্যাঘাত করবো না ভেবেছিলুম। তবু করতে হলো। কারণ, গতকাল আমরা কী রকম ডায়মণ্ডহারবার বেড়িয়ে এলুম, তোমার নিশ্চয় জানবার কৌতূহল হচ্ছে?”

“নিশ্চয়ই হচ্ছে।” শৈবালের স্বরে অকৃত্রিম উৎসাহ, “অবিশ্যি বলবো না, আমি বঞ্চিত হয়েছি। কারণ তুমি বলবে, আমি তোমাদের ত্যাগ করেছি···”

সুপর্ণার স্বরে গতকালের উগ্র ঝাঁজ না থাকলেও উত্তাপ মন্দ নেই, “হ্যাঁ,

ত্যাগ করেছো। আর করে ভালোই করেছো। তুমি এলে, ব্যাপারটা তোমার মোটেই ভালো লাগতো না। কৃষ্ণার কথা ছেড়েই দিচ্ছি। অরিন্দমের পকেটে টাকা কম ছিল। আমার কাছেও যা ছিল, তা সামান্যই। অরিন্দম শেষ পর্যন্ত অফিসে একজনের কাছ থেকে টাকা ধার করেছে। কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষে হয় নি। ডায়মণ্ডহারবার থেকে আমরা যখন এসেছি, তখন ট্যাক্সির পুরো ভাড়ার টাকা আমাদের ছিল না। যাই হোক, কী ভাবে সে-সব মিটেছে, তোমাকে বলে লাভ নেই। শুধু জেনে রেখো, তবু আমরা দারুণ এনজয় করেছি।"

"রিন্টি, টাকার ব্যাপারটা তুমি আমাকে···"

শৈবালের কথা থামিয়ে, মাঝখানেই সুপর্ণার স্বর ঝঙ্কৃত হলো, "হ্যাঁ, উচিত ছিল। আমি বোকামি করেছি। তোমার কাজ থাকলেও টাকাটা নিতে পারতুম। যাই হোক, আজ এখন তোমার বেয়ারাকে দিয়ে শ' দুয়েক টাকা পাঠাতে পারবে? হেঁটে এলে দশ মিনিট লাগবে।"

"তা পাঠাচ্ছি।" শৈবালের মুখে বিমর্ষতা ও বিস্ময়ের ছায়া পড়লো, তুমি আজ আমার এখানে আসছো না?"

সুপর্ণার শুষ্ক স্বর ভেসে এলো, "না। আজ আমরা একজায়গায় একটু আড্ডা দেবো। অরিন্দম আর কৃষ্ণা অফিসের নিচে অপেক্ষা করছে। আমি কি তোমার বেয়ারার অপেক্ষা করবো?"

"নিশ্চয় করবে।" শৈবালের মুখে আহত অভিব্যক্তি, "কিন্তু বেয়ারা যাবার দরকার কী? আমি তো আজ ফ্রি। আমি নিজেই যেতে পারি। তোমাদের সঙ্গে "

সুপর্ণার দৃঢ় কিন্তু নিরাসক্ত স্বর ভেসে এলো, "না, আমাদের সঙ্গে তোমাকে আসতে হবে না। অবিশ্যি টাকাটা চাইতে আমার খুবই সংকোচ হচ্ছে। কিন্তু মাসের শেষ। আমার আর অরিন্দম, দুজনের অবস্থাই কাহিল।"

"সেজন্য ভেবো না।" শৈবাল ওর স্বরকে তরল ও স্বাভাবিক রাখলো। কিন্তু ওর বিমর্ষ মুখে গাঢ় বেদনার ছায়া, "বেয়ারা দশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছোবে।"

ওপার থেকে রিসিভার নামিয়ে রাখার আগে, সুপূর্ণার স্বর শোনা গেল, "রাখছি।"

টেলিফোনের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। শৈবাল এক মুহূর্ত দেরি না করে, ড্রয়ার টেনে, ওর পার্সটা বের করলো। দুটো এক শো' টাকার নোট তুলে নিল। পার্স ড্রয়ারে রেখে, একটি খাম বের করলো। নোট দুটো খামের মধ্যে পুরে, উঠে দাঁড়ালো। কোণে একটি কাঠের পার্টিশন সরিয়ে ভেতর থেকে বের করলো গঁদের শিশি। খামের মুখ বন্ধ করার আগে এক সেকেণ্ড ভাবলো। না, নোট দুটো পাঠানো ছাড়া, আর কিছুই পাঠাবার নেই। ও খামের মুখে দ্রুত গঁদ লেপে, মুখ বন্ধ করলো। কাঠের পার্টিশন টেনে বন্ধ করে ফিরে এলো টেবিলে। চেয়ারে বসে নিচে হাত দিয়ে বোতাম টিপলো। তারপরে খামের ওপর লিখলো, "মিস সুপূর্ণা গুহ।"

বেয়ারা দরজা ঠেলে ঢুকলো। শৈবাল খামটা বেয়ারার দিকে বাড়িয়ে ধরলো, "এটা মিস গুহকে তাঁর অফিসে এখুনি পৌঁছে দিয়ে এসো। তিনি যদি কিছু বলেন, আমাকে জানিয়ে যেও।"

"আজ্ঞে।" বেয়ারা খামটি নিয়ে দ্রুত দরজার বাইরে চলে গেল।

শৈবালের মনে হলো, ওর ভেতরে কোনো একটা গানের সুর বাজছে। কোন্ গান, কী সুর, ওর জানা নেই। কিন্তু ওর ঠোঁটে করুণ হাসি ফুটলো। গতকাল সুপূর্ণা খুবই অপমানিত বোধ করেছে। সে জন্য শৈবালকেই মনে মনে দায়ী করেছে। অথচ শৈবাল সত্যি নিরুপায় ছিল। এখনও সুপূর্ণা ভীষণ রেগে আছে। যখন ওর রাগ থাকবে না, মন শান্ত হবে, তখন লজ্জায় দুঃখে হয় তো এই শৈবালের বুকে···

নিজেকে এই সান্ত্বনাটা দিতে গিয়ে থম্‌কে গেল। বুকে একটা তীক্ষ্ণ কষ্ট ওর ভেতরের অচেনা সুরের "অন্ত"-এর উচ্চ রাগে বেজে উঠলো। ও উঠে দাঁড়ালো। কেন দাঁড়ালো, নিজেই জানে না। এখন ওর বাইরে যাবার দরকার নেই। এ সময়ে বাইরের টেলিফোনটা বেজে উঠলো। শৈবাল টেলিফোনটার দিকে তাকালো। ধীরে এগিয়ে গিয়ে, রিসিভারটা তুললো,

"ইয়েস ?"
"তাড়ু বলছিস্ ?"
গলার স্বর শুনেই শৈবাল মায়ের গলা চিনতে পারলো। ওর ডাক নাম তাড়ু। অবাকও হলো, "হ্যাঁ। কী ব্যাপার মা ?"
"না, ব্যাপার তেমন কিছু নয়।" মায়ের ক্লান্ত স্বর ভেসে এলো, "তোর কি আজ কোনো পার্টি বা নেমন্তন্ন আছে। বাড়ি ফিরতে দেরি হবে ?"
শৈবালের মুখে ভ্রূকুটি বিস্মিত জিজ্ঞাসা, "না, কোনো পার্টি নেমন্তন্ন কিছুই নেই। কেন বলো তো ?"
"তাহলে," মায়ের ক্লান্ত শ্বাসে ধরা স্বরে কেমন একটা সংকোচের সুর, "বলছিলুম কি, তোর বাবা তো সেই তিন দিন আগে বন্ধুদের সঙ্গে জঙ্গলে বেড়াতে চলে গেছেন। বীরু আর মীনাকে (শৈবালের দাদা আর বৌদি) আমার ব্যস্ত করতে ইচ্ছে করে না। আমার শরীরটা ভালো লাগছে না তুই কি তাড়ু আজ বাড়ি চলে আসবি ?"
মায়ের স্বরে সংকোচ আর দ্বিধা শুনে, শৈবালের বুকে ভিন্নতর একটা কষ্ট টনটনিয়ে উঠলো। আর মনে হলো, এ যেন একটা দৈব ঘটনার মতো। এ মুহূর্তে মায়ের কাছ থেকে এই ডাক। মা তো কোনো দিনই এমন ভাবে এ সময়ে ডাকেন না। ও দ্রুত স্বরে বললো, "আমি এখুনি যাচ্ছি মা। আমার আজ তেমন কাজও নেই।"
"রাগ করিস নে যেন তাড়ু।" মায়ের শ্বাস টানা ক্লান্ত স্বরে সেই সংকোচ।
শৈবাল হাসলো, "ওরকম করে বললে রাগ করবো।"
মা ওপার থেকে লাইন কেটে দিলেন। শৈবাল দ্রুত ড্রয়ার খুলে পার্স, গাড়ি ও অন্যান্য চাবির গোছা, এবং আরো টুকটাক কিছু জিনিস ট্রাউ-জারের পকেটে ঢোকালো। বাঁ হাতের কবজি উল্টে ঘড়ি দেখলো। ইণ্টারকমের রিসিভারটা তুলে দুটো নাম্বার ডায়াল করলো, "সিন্‌হা, আমি বাড়ি যাচ্ছি। মনে হয়, জি. এম. আজ আর আমাকে ডাকবেন না। তবু কোনো কারণে খোঁজ করলে, তুমি বলে দিও, আমি বাড়িতেই থাকবো।"

"আচ্ছা স্যার।" জবাব ভেসে এলো।

শৈবাল রিসিভার নামিয়ে ঘর থেকে বেরোলো। করিডর দিয়ে সোজা এগিয়ে গেল লিফ্‌টের দিকে। লিফ্‌ট ওপরে উঠছে। লিফ্‌ট এসে দাঁড়ালো। দরজা খুলতেই ওর বেয়ারা বেরিয়ে এলো, "আঁজ্ঞে, উনি আমার জন্যই অফিসের নিচে নেমে দাঁড়িয়েছিলেন। কিছু বলেন নি।"

কে? লিফ্‌টের ভেতর পা দিতে দিতে, শৈবাল ভ্রূকুটি জিজ্ঞাসু চোখে ফিরে তাকালো। এবং পরমুহূর্তেই মাথা ঝাঁকালো, "ও! আচ্ছা, ঠিক আছে।"

লিফ্‌টের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। এটাই টপ ফ্লোর। লিফ্‌ট নিচে নামতে লাগলো।

অন্ত

শৈবাল তিন দিন ধরে অফিসের নানা কাজের মধ্যেও, যতো বার বাইরের টেলিফোন বেজে উঠেছে, একটি স্বর শোনার ব্যাকুল প্রত্যাশা নিয়েই রিসিভার তুলেছে। প্রত্যেকবারই আশাহত হয়েছে। অথচ ও একটা বিষয় বিশেষভাবে অনুভব করছে। সুপূর্ণা ওর জীবনের যেখানে অবস্থান করছে, সেই অবস্থানগত দিক থেকে, ওর দুদিনের ক্রোধ ক্ষোভ জেদ এবং প্রত্যাখ্যান, শৈবালকে একটা জায়গায় স্তব্ধ করে রেখেছে। করে রেখেছে আড়ষ্ট. নিশ্চল অনড়। ও কিছুতেই সুপূর্ণাকে টেলিফোন করতে পারছে না। এর মধ্যে ওর কোনো জয়ের অনুভূতি নেই। সংযম আর একান্ত অধিকারবোধের সংশয় ওর বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ মনে একটা প্রশ্নও জাগছে। এ-বাধার সঙ্গে প্রেমের কোনো অন্তরায় কি ঘটেছে? জবাব মেলে নি। •

সাত দিন পরে, টেলিফোনে একটি মেয়ের গলার স্বর শৈবালকে অবাক করলো। গলার স্বরে লজ্জা সংকোচ ও জড়তা, "আমি কি মিঃ শৈবাল দত্তর সঙ্গে কথা বলছি?"

"বলছেন।" শৈবাল জিজ্ঞাসু স্বরে জবাব দিল।

টেলিফোনের ওপার থেকে মেয়েটির স্বরে একটা করুণ সুর যেন বাজছে. "আপনি আমাকে চিনবেন না। তবে সুপূর্ণার কাছে বোধহয় আমার নাম শুনেছেন। আমার নাম কৃষ্ণা মজুমদার।"

'মানে সুপূর্ণার বন্ধু অরিন্দমের···?' শৈবাল কথাটা শেষ করলো না।

কৃষ্ণার গলার স্বর ক্ষীণ শোনালো, "হ্যাঁ, সপ্তাহখানেক আগেও তাই জানতুম, আমি অরিন্দমের কৃষ্ণা। কিন্তু গত ছদিন আমি ওর কোনো সন্ধান পাচ্ছি নে। সুপূর্ণাকেও পাচ্ছিনে। ভাবলুম আপনি হয়তো মানে সুপূর্ণার কাছ থেকে হয়তো আপনি কিছু শুনেছেন। আপনার কাছে

কোনো খোঁজ পাবো।"

"না, মিস মজুমদার, সুপূর্ণার কাছ থেকে অরিন্দমের কোনো সংবাদ আমি পাই নি।" শৈবালের স্বর অমায়িক কিন্তু গম্ভীর। সুপূর্ণার সঙ্গে ওর গত সাত দিনের ওপর সাক্ষাৎ না হওয়ার কথা বললো না।

কৃষ্ণার ক্ষীণ করুণ স্বর ভেসে এলো। "আমিএমন একটা অবস্থায়আছি, আপনাকে বোঝাতে পারবো না। বুঝতে পারছি নে, অরিন্দম আমাকে চিট করেছে কিনা। কিংবা···"

'শুনুন মিস মজুমদার, এসব কথা শোনার সময় বা মন কোনোটাই আমার নেই।" ভাষার সঙ্গে শৈবালের স্বরের কাঠিন্যের কোনো সঙ্গতি ছিল না। গম্ভীর আর শান্ত ওর স্বর, "আমি আপনাকে বা অরিন্দমকে চিনিনে। কোনো দিন দেখি নি। এ অবস্থায় আপনি আপনাদের কোনো কথা আমাকে বললেও, কিছু বলবার নেই।"

কৃষ্ণাব স্বর শুনে বোঝা গেল খুবই সংকুচিত হয়ে পড়েছে। বোধহয় শৈবালের জবাবটাও ওর কাছে অপ্রত্যাশিত মনে হয়েছে, "মাফ করবেন শৈবালবাবু। একটাই অনুরোধ, সুপূর্ণাকে আপনি বলবেন, ও যেন আমার সঙ্গে একটু দেখা করে।"

"সুপূর্ণার সঙ্গে দেখা হলে বলবো।" শৈবাল রিসিভার নামিয়ে দিল। শৈবালের মুখ ঈষৎ কঠিন দেখালো। কয়েক মুহূর্ত ও অন্যমনস্ক চোখে শূন্যে তাকিয়ে রইলো। তারপরে সিগারেটের প্যাকেটটা টেনে নিল। জি. এম. ইতিমধ্যেই জেনেছেন, ওর মায়ের শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। মায়ের সঙ্গে ওর সম্পর্কও তেমন একটা নিবিড় কিছু ছিল না। কিন্তু বাবার ব্যবহারে মা ক্রমেই ভেঙে পড়ছেন। শৈবাল বাবাকে দোষ দিতে পারে না। ভদ্রলোক তাঁর সারা জীবনে যতোটা করার করেছেন। এখন এই ষাটোর্ধ্বে জীবনটাকে নানাভাবে উপভোগ করে নিচ্ছেন। যেটা খারাপ লাগে, সেটা হলো ভদ্রলোকের আদর্শবাদের কথা। ওটা ওঁদের স্বভাবের আর রক্তের মধ্যে চারিয়ে গিয়েছে। এ সময়ে অসুস্থ মা বড় অসহায়। শৈবাল মাকে সান্নিধ্য দিতে গিয়ে মায়ের কাছে জীবনের নানা

কথা শুনে, কথা বলে, অনেক অজানাকে যেন জানতে পারছে। সব থেকে অবাক লাগে, বাবার প্রতি মায়ের কোনো অভিযোগ নেই। সেটা যে সেকালের অন্ধ স্বামীভক্তি বা ভালবাসা জনিত তা নয়। মা তাঁর নিজেকে দিয়ে. বাবাকে বুঝেছেন। সেই কারণেই বাবার প্রতি তাঁর কোনো অভিযোগ নেই।

সুপর্ণার সঙ্গে দেখা নেই। কিন্তু মায়ের সঙ্গে অবকাশের সময়গুলো ওর জীবনে নিয়ে এলো নতুন একটা দিগন্ত। যে দিগন্তে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখা যায়। কিছুটা চেনা যায়।

শৈবাল কি তবু একেবারে নিশ্চিন্ত ছিল? থাকতে পারেনি। দশম দিনের অসাক্ষাতের পর, ও সুপর্ণার অফিসে টেলিফোন করেছিল। ওরই এক সহকর্মীর জবাব, সুপর্ণা গত সাতদিন অফিসে আসছে না। ও ছুটি নিয়েছে। শৈবাল উদ্বেগ চাপতে পারে নি। সুপর্ণার বাড়িতে টেলিফোন করেছিল। ওর মা অবাক হয়ে বলেছেন, "ও তো কোন্ বন্ধুদের সঙ্গে পুরী বেড়াতে গেছে। তুমি জানো না?"

শৈবাল মাথা নেড়েছে, "না, জানি নে।"

"তুমি আমাদের বাড়িতেও তো অনেক দিন আসো নি। এসো না।" সুপর্ণার মায়ের স্বরে আন্তরিক আহ্বান ছিল।

শৈবাল জানিয়েছে, "মায়ের শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। ভালো হলেই যাবো।"

শৈবাল যেন নতুন করে ওর অবস্থানটি চিনতে পারছিল।

প্রায় চার সপ্তাহ পরে একদিন সুপর্ণা এলো শৈবালের অফিসে। আগে কোনো টেলিফোন করেনি। তেমন কোনো পরিবর্তন ঘটে নি ওর চেহারায়, বা বেশেবাসে। কেবল পরিবর্তন কথায় ও ব্যবহারে। সেই ক্রোধ ক্ষোভ নেই। এলো এক ঝলক আলোর মতো হাসি নিয়ে। "কী কর্মবীর মহাশয়, তোমার খবর কী?"

"কর্মবীর নয়, যন্ত্র বল।" শৈবাল ওর হাতের কলমটা টেবিলে ফেলে হাসলো, "খবর খারাপ নয়। তোমার কী খবর?"

সুপূর্ণা শৈবালের চোখের দিকে তাকালো, "ভালো নয়।"

"কেন ?"

"আমাকে না দেখে, তুমি হয় তো ভালো ছিলে। আমি ছিলুম না।" সুপূর্ণার মুখে বিষণ্ণতার ছায়া পড়লো, "মনটাও ভালো ছিল না। তোমার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছি।"

শৈবালের অকপট হাসিতে একটা স্নিগ্ধতার কিরণ, "ওসব ভুলে যাও। ওরকম হয়েই থাকে। জীবনটা একই ছন্দে সব সময়ে চলবে, বা একই স্রোতে এটা ভাববার কোনো কারণ নেই। ওটাকে অনিবার্য বলে ধরে নিলে, অকারণ ভুগতে হয়।"

"হঠাৎ এই দার্শনিকতা ?" সুপূর্ণার দীর্ঘায়ত চোখে সংশয়। ও তাকালো ঘাড় বাঁকিয়ে।

শৈবাল হেসে ঘাড় বাঁকালো। দার্শনিকতা বিষয়টা তো খারাপ নয়। ওটা জীবনবোধ থেকেই আসে।

"রাখো তোমার এত বড় বড় কথা।" সুপূর্ণার রাঙানো পুষ্ট ঠোঁট ফুলে উঠলো। গলার স্বরে প্রেমোচ্ছল আবদারের সুর, "অনেকদিন তোমার সঙ্গে বেরোইনি। আজ বেরোবো।"

সেটাই তো ছিল প্রায় প্রাত্যহিক একটা নিয়মের মতো। শৈবাল বাঁহাতের কবজির ঘড়ি দেখলো। উঠে দাঁড়ালো তৎক্ষণাৎ, "চলো তাহলে বেরোই।"

শৈবাল এক মিনিটের মধ্যেই তৈরি হয়ে নিল। সুপূর্ণাকে নিয়ে লিফটে নেমে আফিসের বাইরে এলো। গাড়িটা পার্ক করা ছিল যথাস্থানে। চাবি বের করে গাড়ির দরজা খুলে আগে নিজে ঢুকে বসলো চালকের আসনে। দরজা খুলে দিল সুপূর্ণাকে। সুপূর্ণা উঠে বসলো। শৈবাল গাড়ি স্টার্ট করলো।

"কথা বলছো না কেন বলো তো ?" সুপূর্ণার স্বরে অস্বস্তি ও সংশয়।

শৈবাল হাসলো, "আমি তো শুনবো বলে কান পেতে আছি।"

"আমার আবার কী কথা থাকবে ?" সুপূর্ণা শৈবালের কাছে ঘেঁষে বসলো, "যা বলবার তা তো বলেছি। কিন্তু তুমি তো আমাকে একবারও

রিন্‌টি বলে ডাকো নি। আর···আর এদিকে কোথায় যাচ্ছো ?"
শৈবাল হাসলো, "তোমাকে পৌঁছে দিতে।"
"আমাকে কোথায় পৌঁছে দিতে যাচ্ছো তুমি ? সুপূর্ণার স্বরে বিস্ময় ও উত্তেজনা, "উত্তর কলকাতায় কোথায় পৌঁছাবে তুমি আমাকে ? আমাদের বাড়ি তো ওদিকে না ?"
শৈবালের হাসিতে কোনো পরিবর্তন নেই, "আজ আমি সেখানে পৌঁছে দিতে চাই, যেখানে তোমাকে পৌঁছুনো উচিত বলে আমি মনে করি।"
"শৈবাল !" সুপূর্ণা প্রায় চিৎকার করে উঠলো, "তোমার এমন কোনো অধিকার নেই তোমার ইচ্ছেমতো জায়গায় আমাকে পৌঁছে দেবে। আমি ···আমি···অনেকদিন পরে তোমার কাছে এসেছি। তোমার সঙ্গে বেরোতে চেয়েছি···"
সুপূর্ণার স্বর স্তব্ধ হয়ে এলো। গাড়ি দাঁড়ালো। উত্তর কলকাতার সেকালের এক অভিজাত পাড়া। সামনেই বিশাল অট্টালিকাটা অন্ধকারে ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তাটায় তেমন ভিড় নেই। আলোও কম। শৈবাল গাড়ির এঞ্জিন বন্ধ করে নেমে গেল। অন্য পাশে গিয়ে গাড়ির দরজা খুলে ধরলো, অরিন্দমের বাড়ির এ-ঠিকানাটা একদিন তুমিই বলেছিলে। এসো সুপূর্ণা, নেমে এসো।"
সুপূর্ণা পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে গাড়ির মধ্যে বসে রইলো। কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারলো না। শৈবালের স্বরে এমন কিছু ছিল, ওকে কাঁধের ব্যাগটা ধরে নেমে আসতে হলো। শৈবাল দরজাটা লক করে, চেপে দিল, "এটা দার্শনিকতা কিনা, সে বিচার তোমার। তোমাকে এখানে নামিয়ে দিয়ে যেতে আমার কোথায় কতোখানি বাজছে, সেটা ব্যাখ্যা করবো না। আমার ঝরনা অন্ধকারে বহে। তোমার জীবনের পথ তোমারই মানসিকতার দ্বারা নির্ধারিত হবে। আমি এখান থেকে ফিরছি।
"তাড়ু।" সুপূর্ণার রুদ্ধ স্খলিত স্বরের ডাক শোনা গেল।
শৈবাল গাড়িতে নিজের জায়গায় গিয়ে বসে, ইঞ্জিনে চাবি ঘুরিয়ে গাড়ি স্টার্ট করলো, "রিন্‌টি, ডেকো না। আমার জন্য তোমার জীবন থেমে

থাকবে না। কিন্তু যা চার বছরেও অপূর্ণ ছিল, তার পূর্ণতা আশা করা অনুচিত। সাত দিনে প্রেম হয়। চার বছরের প্রাসাদ এক নিমেষেই ভেঙে যায়।"

শৈবাল গাড়ি চালালো। তবু একবার পেছন ফিরে তাকালো। প্রায় অন্ধকার প্রাচীন রাস্তার ধারে বিশাল ভূতুড়ে অট্টালিকার সামনে সুপূর্ণাকে অস্পষ্ট দেখাচ্ছে। শৈবাল সামনে ফিরলো। ও গাড়ি চালাচ্ছে। ওর চোখ ঝাপসা হলে চলবে না।

সহসা

একা কোঁথাও বেড়াতে যাওয়ার মতো বিড়ম্বনা আর কিছুতেই নেই। তা সেটা পৃথিবীর যে-কোনো স্বর্গীয় অপরূপ জায়গাই হোক, আর যতো কদর্য জায়গাই হোক। লোকনাথ একলা কাশ্মীরে বেড়াতে এসে সেটা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। হাড়ে হাড়ে না বলে বরং বলা যায়, ওর সমস্ত অনুভূতির মধ্যে সেটা একটা যন্ত্রণার মতো সর্বদাই বাজছে।

অথচ ওকে কেউ মাথার দিব্যি দেয় নি, একা একা কাশ্মীরে ছুটে আসার জন্য। চরিত্রের দিক থেকেও একাকীত্ব ওর আদৌ পছন্দ না। বৈরাগ্যের ছিটেফোঁটাও ও কখনো অনুভব করে নি। অবিশ্যি ওর এই আটত্রিশ বছর বয়সের অবিবাহিত জীবনে, কখনো-সখনো গঙ্গার ধারে বেড়াতে গিয়ে, সূর্যাস্তের বর্ণাঢ্য আকাশের দিকে তাকিয়ে এক ধরনের নিবিড় অনুভবের মধ্যে ডুবে গিয়েছে। না, কোনো কাব্যিক কল্পনা থেকে সে-রকম ঘটে নি। বরং সেদিক থেকে কবি বুদ্ধদেব বসুর বক্রোক্তিকেও হার মানিয়েছে। তিনি একদা সম্ভবতঃ মনের কোনো বিভাগ থেকে লিখেছিলেন, 'কলকাতার যতো গণিকা, ও তো কবি।' অথবা হয় তো লিখেছিলেন, 'কলকাতায় গণিকা থেকে কবির প্রাদুর্ভাব বেশী।' অন্য কেউ বলেছিলেন, বর্ষাকালের ব্যাঙের ছাতার প্রাদুর্ভাবের মতো বাঙালী যুবকরা এক সময়ে কবি হয়ে উঠে।

কথাগুলো যে একান্তই মিথ্যা, তা বোধহয় বলা যায় না। এমন বাঙালী তরুণের সংখ্যা কম, যে কখনো না কখনো দু' চার ছত্রও কবিতা লেখে নি। লোকনাথ সেদিক থেকেও ব্যতিক্রম। ও ওর এই আটত্রিশ বছর বয়সের জীবনে এক ছত্র কবিতাও লেখে নি। পাঠ্যপুস্তকের বাইরে, কালে-ভদ্রে কবিতার বইয়ে চোখ বুলিয়েছে। সেই চোখ বোলানোও কবিতা পাঠের কোনো আত্যন্তিক আকর্ষণজাত না। নিতান্ত হাতের

সামনে হয় তো কোনো কবিতার বই পড়ে থাকতে দেখেছে। দু'চার পাতা উলটে চোখ বুলিয়েছে। তার বেশী কিছু না।

তবু কখনো-কখনো, সূর্যাস্তের আকাশের দিকে তাকিয়ে লোকনাথ যে মুগ্ধ ও অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে, তা ও নিজেও জানে না। অথবা ওদের যাদবপুরের বাড়ির সজনে গাছটার ডালপালায় চড়ুই পাখিদের লুকোচুরি খেলা দেখতে দেখতে, ও যে হঠাৎ সেইখেলার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছে, তাও থেকে গিয়েছে ওর অবচেতনেই। তা নিয়ে ও কখনো ভাবে নি, চিন্তাও করে নি। আসলে, সে-সবই যে ওর একাকীত্ব অনুভূতিরই একটা বিষণ্ণতা, তা কখনো জানতে পারে নি।

পথে চলতে, বাসে, ট্রামে, কখনো কোনো মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়েও কি ও অন্যমনস্ক হয়ে যায় নি? হয় তো তথাকথিত কোনো আলোড়ন সৃষ্টি করে নি, বা মনে মনে ব্যাকুল হয়ে ওঠে নি। কিন্তু ওর প্রাণের গভীরে কোথায় একটা দূর আকাশে বিজলি চমকের মতো হেনে গিয়েছে, ও নিজেই টের পায় নি। ওটাও ওর অবচেতনই ঘটে গিয়েছে। না, যে কখনো কোনো মেয়ের সঙ্গে মেশে নি। কলেজে, উনিভার্সিটিতে পড়বার সময়ে ওর মেয়ে বন্ধুর সংখ্যা কম ছিল না। পাড়ায়ও অনেক মেয়ের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় আছে। আর এখন ও যে অফিসের একজন একজিকিউটিভ, সেখানে ওর আণ্ডারেই অনেক চাকুরিজীবী রূপসী তরুণীরা আছে। কিন্তু প্রেম? নৈব নৈব' ও ব্যাপারটি ওর জীবনে কস্মিন্‌কালেও ঘটে নি। ও নিজে আজ পর্যন্ত কোনো মেয়েকে প্রেম নিবেদন করে নি বা করতে পারে নি। কোনো মেয়ে ওর দিকে কখনো কিঞ্চিৎ মুগ্ধ চোখে তাকিয়েছে কিনা বা কখনো কোনো মেয়ের কথার মধ্যে আভাস ইঙ্গিত কিছু মিলেছে কিনা ও খেয়াল করে নি। মনে করতে ও পারে না। অথচ কম করে বারো বছরের মধ্যে ওর বন্ধুরা গণ্ডা গণ্ডা প্রেম করেছে, অনেকেই বিয়ে করেছে, বিয়ে করে একাধিক সন্তানের জনকও হয়ে গিয়েছে, আর ও অবাক হয়ে হেসে বলেছে, 'তোরা পারিস বটে।'

বন্ধুরা ওকে বলেছে, 'তোরও না পারার কোনো কারণ নেই। আসলে তুই মোস্ট বোগাস আর ক্যালাস্।'
বন্ধুদের কথায় লোকনাথ বরাবরই অবাক্ হয়েছে, আর ভেবেছে, সত্যি কি ও বোগাস আর ক্যালাস্? কিন্তু নিজেও কিছু কখনো বুঝতে পারে নি। এখনো যথার্থ পারে না। অনেক সময় এমনও ঘটেছে, ওর কোনো বন্ধু, বিশেষ কোনো মেয়ের কথা বলেছে, যে মেয়েটি ওর প্রেমে পড়েছে। ও বিশ্বাস করতে পারে নি। কারণ প্রেমে পড়ার লক্ষণ কী, পড়লে কী রকম অনুভূতি হয়, সে-সব ও কখনো বুঝতে পারে নি। অবিশ্যি একে-বারেই কখনো পারে নি, এমন নয়। দু' একটি মেয়ের ক্ষেত্রে ওর মনে কিছু কিঞ্চিৎ দাগ পড়েছে। তাদের নিয়ে সিনেমা থিয়েটার দেখতে গিয়েছে, রেস্তোর াঁয় খেতে গিয়েছে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। প্রেমের কোনো আলাপ-প্রলাপই হয় নি। কার দোষে? সেটা ও নিজে জানে না। তবে এটাও ওর জানা নেই, প্রেমের প্রাথমিক ক্ষেত্রে পুরুষের একটা অগ্রগামী ভূমিকা আছে। সেই ভূমিকাটা ও কখনো পালন করে নি। আর এটাও ওর জানা নেই, ওর মানসিকতাই এ রকম, কোনো মেয়ে অগ্রগামিনী ভূমিকা নিলে তাও ওর মনকে বিরূপ করে তুলতে পারে।
ফলতঃ শ্রীমান লোকনাথ মিত্রকে নিয়ে যে-সব মেয়ের কিছুটা ইচ্ছা বা দুর্বলতা জেগেছিল, এক সময়ে সবাই ওর কাছ থেকে আস্তে আস্তে দূরে সরে গিয়েছে। অথচ চেহারার দিক থেকে আর দশটা যুবকের থেকে ওর বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য না থাকুক, দেখতে শুনতে ভালোই। দীর্ঘ শরীর, মাজা মাজা রঙ, এক মাথা চুল, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ, চোখা নাক, মোটা ভ্রূ, সব মিলিয়ে ওর চেহারার মধ্যে একটা ব্যক্তিত্ব আছে। ওর কথাবার্তা ব্যবহার আচরণের মধ্যেও অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। সাধরণতঃ ও আমায়িক এবং বিনীত। বুদ্ধিমান তো বটেই। বিদ্যাবুদ্ধির ধারটা কিছু বেশীই। আটত্রিশ বছর বয়সেই চাকরির ক্ষেত্রে ও যেখানে উন্নীত হয়েছে, ওর বয়সী অনেকের কাছেই সেটা ঈর্ষার বিষয়। অথচ কোম্পানি থেকে গাড়ি, ফ্ল্যাট ভাড়া, মোটা বেতন, এসব কোনো কিছুই ওকে সমাজ

ও বন্ধুদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে নি।

অতএব, লোকনাথ, সব দিক থেকেই এক কথায় সমুজ্জ্বল। কিন্তু ওর গৃহক্ষেত্রটি যেমন নিরালা, আত্মীয়-স্বজন ভাগ্যটিও তেমনি মন্দ। বাড়িতে আছেন ওর বিধবা বৃদ্ধা মা, আর একটি ছোট বোন। বোনের বয়স প্রায় পঁচিশ। এম. এ. পাস করে এখন একটা ইস্কুলে চাকরি করছে। লোক-নাথের বাবা বেঁচে থাকতে দুই বোনের বিয়ে দিয়েছে ও নিজে। বাকী ছোট বোনটির বিয়ের জন্য ওর পক্ষে যতোটা সম্ভব, চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, যাকে বলে এ্যারেঞ্জড ম্যারেজ, দেখেশুনে ব্যবস্থা করে বিয়ে দেওয়া, ওর তিন বোনের ক্ষেত্রে তাই হয়েছে। ওদের বাড়িতে প্রেমজ বিবাহের কোনো ইতিহাস নেই। এবং লোকনাথ যতোটা জানে, ওর ছোট বোনেরও একই ব্যাপার। ছোট বোনের ছেলে বন্ধু নেই, এমন না। মাঝে মধ্যে তাদের কারো কারোকে বাড়িতে আসতেও দেখা গিয়েছে। কিন্তু প্রেমের ঘটনা যে কিছু নেই, সেটা বোঝা যায়। থাকলে বিয়ের জন্য যে চেষ্টাচরিত্র চলেছে, ছোট বোন নিশ্চয়ই তাতে বাধা দিত অথবা লোকনাথকে কিছু বলতো। অথচ লোকনাথ প্রায়ই শুনতে পায়, ওর বন্ধুর বোনেরা প্রেম করে বিয়ে করেছে।

যাই হোক, লোকনাথ বোনের বিয়ের চেষ্টা করলেও ওর নিজের বিয়ের চেষ্টা কেউ করছে না। একমাত্র মা মাঝে মাঝে অসহায়ভাবে বলেন, 'খোকা, (এটাই লোকনাথের ডাক নাম, এবং এ নামে ডাকবার জন্য এখন মা ছাড়া কেউ বেঁচে নেই।) ছেলের বউয়ের মুখ দেখার ভাগ্যি বোধহয় আমার বেঁচে থাকতে আর হবে না।'

লোকনাথ মায়ের কথা শুনে উদাসভাবে হাসে, বলে, 'মা, সংসারের সব ছেলে বা সব মেয়ের বিয়ে হবেই, বিধাতা বোধহয় প্রজাপতির এমন কোনো নির্বন্ধ সৃষ্টি করেন নি।'

মা যেন খানিকটা উৎকণ্ঠিত বিস্ময়ে বলে ওঠেন, 'কী যে বলিস তুই। তাই আবার কখনো হয় নাকি ? জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে, মানুষের জীবনে এই এই তিনটি বিষয়ে কোনো এদিক-ওদিক হবার জো নেই। ওটাও

বিধাতারই বিধি।'

লোকনাথ হয় তো মায়ের সঙ্গে তর্ক করতে পারে, সারা জীবনে বিয়ে না করে বার্ধক্যে পৌছেছে, এমন ভূরি ভূরি প্রমাণ দিতে পারে। কিন্তু কী লাভ? মা তাঁর ধ্যান-ধারণা বিশ্বাস নিয়ে যে বয়সে পৌছেছেন, এখন তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে যাওয়া বা প্রমাণ দেওয়াটা বৃথা। কোনো কিছু দিয়েই, ও মায়ের বিশ্বাসকে টলাতে পারবে না! যেমন ও ভালো করেই জানে, মা ওর বিয়ের কথা মাঝে মধ্যে বললেও অন্তর থেকে তিনি চান ছোট বোনের বিয়ে দেওয়াটাই ওর সর্বাগ্রে কর্তব্য। বিবাহযোগ্যা অবিবাহিতা বোনের বিয়ের আগে, কোনো অগ্রজের বিয়ে করা অনুচিত, মায়ের মনের এই কথাটা লোকনাথ জানে। সেই কারণেই তিনি যতোটা ভাবী পুত্রবধূর মুখদর্শনের কথা বলেন, তার থেকেও অনেক বেশী ছোট কন্যার বিয়ের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেন। না, লোকনাথের মনে সেজন্য কোনো তিক্ততা সৃষ্টি হয় না। কারণ এটা ওর নিজেরও বিশ্বাস, যতো অবিলম্বে সম্ভব, ছোট বোনের বিয়ে দেওয়া ওর কর্তব্য। এটাকে ও স্বতঃসিদ্ধ মেনে নিয়েছে বলেই মনে কোনো তিক্ততা নেই।

আত্মীয়স্বজন বিষয়ে মন্দ ভাগ্যের কথাটাও এই কারণেই আসে। কথাটা লোকনাথ নিজেও কখনো সম্যক ভাবে নি, আত্মীয়স্বজনরা ওর বিয়ের বিষয়ে উদ্যোগ নিতে পারে। অথচ সমাজ সংসারে এরকম ঘটনা অখ্‌চারই ঘটছে। যার বিয়ের উদ্যোগ আয়োজন করার কেউ নেই, আত্মীয়স্বজনরাই এগিয়ে এসে তার বিয়ের ব্যবস্থা করে। বিশেষ করে লোকনাথের মতো একটি ছেলের ক্ষেত্রে এই উদ্যোগটা আরও বেশী করে হওয়া উচিত ছিল। পাত্র হিসাবে, সমাজের বিচারে ওকে সর্বগুণসম্পন্ন সুযোগ্য বলতেই হবে। এমন কি সংসারের ক্ষেত্রেও, ও বাবা মায়ের একমাত্র ছেলে, যা অনেক কন্যার পিতামাতাকেই প্রলুব্ধ করার পক্ষে যথেষ্ট। এমন পাত্রের সন্ধানে প্রতিদিন পত্র-পত্রিকার বিস্তর বিজ্ঞাপনের ঢেলখেল হচ্ছে। অথচ লোকনাথ প্রজাপতি জগতের নেপথ্যেই থেকে যাচ্ছে।

লোকনাথ নিজেও অবিশ্যি আত্মীয়-স্বজনের ক্ষেত্রে খানিকটা নির্বিকার।

কলকাতার বুকে আত্মীয় বলতে ওর তিন মামার তিনটি পরিবার। তাঁদের যে তেমন আনাগোনা আছে, তাও না। আর ভাগ্যের এমনই পরিহাস, লোকনাথের মামারা সকলেই প্রায় দুঃস্থ, সংসার চালাতে গিয়ে পর্যুদস্ত। লোকনাথদের বাড়িতে তাঁদের আবির্ভাব মানেই কিছু কিঞ্চিৎ আর্থিক সাহায্য। অস্বীকার করার উপায় নেই, লোকনাথের উপার্জনের ক্ষেত্রে এবং মাত্র তিনজনের সংসারটা ওদের যথেষ্ট সচ্ছল। অতএব, ও যখন যা পারে, মামাদের আর্থিক সাহায্য করে থাকে। এর জন্য ওর মনে কোনো গ্লানি নেই, বরং মামাদের পরিবারগুলোর জন্য ও একটা উদ্বেগ আর কষ্ট বোধ করে থাকে। তা ছাড়া লোকনাথ মায়ের মনের কথাও বোঝে। মা চান, লোকনাথ যেন কখনোই মামাদের প্রত্যাখ্যান না করে। সেক্ষেত্রে আবার লোকনাথকে নিয়ে মায়ের একটা বিশেষ গৌরববোধ আছে। যাঁরা নিজেদের জীবন অতিবাহিত করতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন, তাঁরা ভাগিনেয়র বিয়ের কথা ভাববে, এ-রকম আশা করা বৃথা। যদিও লোকনাথ এদিকটা কখনো ভেবেও দেখে নি।

জীবন ও সংসারের এই পশ্চাদ্‌পটে, মার্জিত রুচিবান উজ্জ্বল স্বাস্থ্য লোক-নাথ প্রতিদিন অফিসে যায়। প্রতিদিনই তার এফিসিয়েন্সি নতুন নতুন রূপে প্রকাশিত হয়। তার কারণ, সংসারে মানুষের কাছে যে-বিষয়টি বিরল, সেই নিজের করণীয় কাজটার প্রতি ওর যথেষ্ট আকর্ষণ, উৎসাহ আর উদ্দীপনা আছে। অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রেই এমনটি ঘটে না। যে কারণে নিতান্ত গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে মানুষের কাজে অবহেলা ও অনীহা। অবিশ্যি সকলকেই তাদের মনোমত কাজ দেওয়া যাবে, এমন স্বর্গরাজ্য কখনো সৃষ্টি হবে, তেমন সম্ভাবনা নেই, অতীতেও কোনো কালে ছিল না। চাকরি, চাকরির পরে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আড্ডা, বাড়ি ফিরে এসে আবার অফিসেরই ফাইল ঘাঁটা বা ওর নিজস্ব বিষয় অর্থনীতি ও আইনবিষয়ক বইপত্র পড়াশোনা, এটাই ওর দৈনন্দিন জীবনের চিত্র। এর মধ্যে এক-মাত্র যেটা ব্যতিক্রম এবং বৈশিষ্ট্য তা হলো প্রতি বছর শরতের শেষে হেমন্তের শুরুতে একবার বাইরে বেড়াতে যাওয়া। এই বেড়াতে যাবার

যাবতীয় খরচটাও কোম্পানি থেকেই পায়। তার অঙ্কটাও খুব কম না। নেহাত ব্যাচেলর, বিবাহিত হলে অঙ্কটা আরও বাড়তো।

লোকনাথ পাহাড়ের আকর্ষণটাই বেশী অনুভব করে। বিশেষ করে হিমালয়। সমুদ্রতীরেও যে কোনো কোনো বছর না যায়, এমন না। কিন্তু সমুদ্রের নিরন্তর ঢেউ আর আছড়িয়ে পড়া তরঙ্গ এবং সেই দূর আকাশে একটি রেখার সীমা, এ-সবের মধ্যে কোথায় যেন একটা ক্লান্তি-কর একঘেয়েমি বোধ করে। কিন্তু পাহাড়ের প্রতিটি বাঁকে বাঁকেই নতুন দৃশ্য। নতুন গাছপালা, ফুল, পাখি, পতঙ্গ এবং বিচিত্র বর্ণের বিন্যাস। এই দৃশ্যের সঙ্গে পাহাড়ের গভীর নৈঃশব্দ, এবং সহসাই সেই নৈঃশব্দের বুকের ওপরে ঝরনা বা পাহাড়ী নদীর কলধ্বনি বেজে ওঠে। এ-রকমটা একমাত্র পাহাড়ে পর্বতেই সম্ভব।

লোকনাথ এবারে এসেছে কাশ্মীর। হিমালয়ের এই সুদীর্ঘতম হ্রদ এবং নদীবাহিত আশ্চর্য উপত্যকা দেখে ও মুগ্ধ। কিন্তু হরিয়ানা, পাঞ্জাবের লোকের ভিড়টাই, ওর একাকীত্বটাকে বেশী সূচ্যগ্র হয়ে বিদ্ধ করছে। পাহাড়ের নিরালা নির্জনতাই ওর পছন্দ। কিন্তু যেখানেই পা বাড়াবে, সেখানেই যদি গুচ্ছের মহিলা-পুরুষের ভিড়ের মধ্যে পড়তে হয়, তখন সত্যি মনে হয়, একা কোথাও বেড়াতে যাওয়ার মতো বিড়ম্বনা আর কিছু নেই। এমন কি এই হিমালয়ের স্বর্গে এসেও না। লোকের ভিড়ের মধ্যে থাকতে হবে, অথচ কথা বলা যাবে না, একে বিড়ম্বনাই বলে।

লোকনাথের কাছে সব থেকে যেটা খারাপ লাগছে, তা হলো পঞ্জাব হরি-য়ানার ভদ্রলোকদের কাণ্ডকারখানা। ও যেখানেই যাচ্ছে সর্বত্রই বাচ্চা ছেলেমেয়েদের মুখে ড্যাডি মাম্মি শুনে ও ক্লান্ত। আর সব বাচ্চার নামই তাদের বাবা-মায়েরা বেবী রেখেছে? মহিলা-পুরুষদের ঘোড়ায় ছোটা, বা প্রচুর মদ্যপান, এ সবে লোকনাথের কিছু যায় আসে না। যদিও বাড়া-বাড়ি সব ক্ষেত্রেই বিরক্তিকর। কাশ্মীরে সেই বিরক্তকর ব্যাপারটির প্রাদুর্ভাবও বড় বেশী। একজন পুরুষকেও চোখে পড়ে না, যার গায়ে জাতীয় পোশাক আছে লোকনাথেরও অবিশ্যি তা নেই। এই পাহাড়ের

শীতে তা হলে বালাপোষ গায়ে দিয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়। অথবা কাশ্মীরী-দের মতো ঝালঝোপপা 'ফেরণ' পরতে হয়। নেহাত মহিলাদের কারো কারো গায়ে শালোয়ার কামিজ এবং গরম জামা আছে। অন্যথায় সকলের আচার আচরণ কথাবার্তা দেখেশুনে জায়গাটা ভারতবর্ষ না ভেবে এই গ্রহের অন্য পিঠের কথা ভাবা যেতো। ইংরেজীতে কথা বলতেই হবে, এমন মাথার দিব্যি এঁদের কে দিয়েছে? তাও যদি নির্ভুল হতো একটা কথা ছিল।

লোকনাথ শ্রীনগরে যেমন একলা একটি মাঝারি ধরনের লাকসারি হাউসবোটে আছে, তেমনি লোকজনের সঙ্গে সঙ্গে বাসে না বেড়িয়ে একলা ট্যাকসি নিয়েও বেড়াতে পারতো। খরচটা একটু বেশী, তা ছাড়া একে-বারে একলা বেড়াবার থেকে কিছু লোকজন থাকলে খারাপ লাগে না। কিন্তু লোকজন একটু মনের মতো না হলে ভালো লাগে না। বেড়াবার উত্তেজনা মানুষের থাকতেই পারে। তা বলে সর্বত্র নেত্যকেত্যও সহ্য হয় না। আর যে-কোনো বাসে উঠলেই বোম্বাই হিন্দী ফিল্মের রেকর্ড বাজতে থাকবে। তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে, অনেকেই গান জুড়ে দেয়। বিরক্তিকর, অসম্ভব বিরক্তিকর।

তবু ইতিমধ্যেই দিল্লী থেকে আগত একটি পাঞ্জাবী দম্পতীকে লোকনাথের ভালো লেগেছে। ও কাশ্মীরে এসে পৌঁছেছে মাত্র চারদিন, শ্রীনগর আর তার আশপাশের মোগলাই ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো ঘুরে দেখা ছাড়া, এক দিন গিয়েছিল গুলমার্গ। গুলমার্গ থেকে খিলানমার্গ। গুলমার্গই ওর ভালো লেগেছে। মনে মনে ইচ্ছা, সেখানে দু'দিন কাটিয়ে যাবে। প্রায় গুলমার্গ পর্যন্ত বাস যায়। তারপরেই ঘোড়ায় চড়া ছাড়া উপায় থাকে না। গুলমার্গ থেকে খিলানমার্গে ঘোড়ায় চেপে যাবার সময় প্রায় একটা দুর্ঘটনাই ঘটে গিয়েছিল। অনভ্যাসের ফোঁটায় কপাল চড়চড় করে, ব্যাপারটা সেই রকম। লোকনাথ দু'টি গাছের মাঝখান দিয়ে যখন ঘোড়া চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, তখনই ওর বাঁ পাশ থেকে একটা বেয়াদপ ঘোড়া তার আরোহীসহ এসে পড়েছিল ওর ঘোড়ার গায়ে। কিংবা, আসলে ওর

ঘোড়াটাই বেয়াদপি করেছিল কিনা, ও যথার্থ বুঝে ওঠার আগেই রীতি-মতো একটি সংঘর্ষ। তৎক্ষণাৎ একটি মহিলার স্বরে আর্তনাদ। লোকনাথের বাঁ হাঁটুতে আঘাত লেগে রেকাব থেকে ঝুলে পড়েছিল পা। পতন থেকে কোনো রকমে নিজেকে বাঁচিয়ে তুলেই দেখতে পেয়েছিল, অন্য ঘোড়াটির সওয়ার একজন বেলবট আর উলেন জামা গায়ে মহিলা! লোকনাথ আতঙ্কিত চোখে দেখেছিল, ভদ্রমহিলার ঘোড়ার পেটের সঙ্গে বাঁধা পিঠের স্যাডেলটা ডান দিকের রেকাবসহ ঝুলে পড়েছে। মহিলাও অসহায়ভাবে ডান দিকে হেলে পড়ে, নিজেকে পতন থেকে বাঁচাবার জন্য। ঘোড়ার ঘাড়ের ছাঁটা কেশর বাঁ হাতের মুঠিতে চেপে ধরেছিল।

লোকনাথ নিজে অপরাধ করেছে কী না, তা বুঝে ওঠার আগেই ইংরেজীতে ক্ষমা চেয়ে, একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিল, 'আপনি দয়া করে আমার হাতটা ধরুন।'

মহিলা ডান হাত বাড়িয়ে লোকনাথের প্রসারিত হাতটি চেপে ধরে ইংরেজীতে বলেছিলেন, 'শিথিল স্যাডেলের জন্য আমি হয় তো পড়েই যাবো। আপনি বরং তাড়াতাড়ি ঘোড়া থেকে নেমে, আমাকে নামতে সাহায্য করুন।'

লোকনাথের পক্ষে বাঁ দিকে নামার যথেষ্ট অসুবিধা ছিল। কেন না, ওর নিজের বাঁ পা রেকাব থেকে খসে পড়েছিল। মহিলার কথা শুনে প্রকৃতপক্ষে ও বাঁ দিকে লাফ দিয়েই নেমেছিল। মহিলার হাত আর ওর হাত ধরাই ছিল। লোকনাথ নেমে পড়ায় স্বাভাবিকভাবে মহিলার পক্ষেও আর টাল সামলিয়ে ঘোড়ার ওপর ত্রিভঙ্গ অবস্থায় বসে থাকা সম্ভব ছিল না। বলতে গেলে, তিনি লোকনাথের ঘাড়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলেন। সামনে পিছনে আরও অনেক মহিলা-পুরুষ অশ্বসওয়াররা ছিল, যারা অনেকেই তরুণ-তরুণী এবং কেউ খিলানমার্গ থেকে নেমে আসছিল, কেউ উঠছিল। তাদের ভিতর থেকেই কেউ কেউ, বিপদগ্রস্ত লোকনাথ আর মহিলাকে দেখে হেসে উঠেছিল, কোনো ফুর্তিবাজ যুবক শিস্ দিয়ে উঠেছিল, আর একটি তরুণীর উল্লসিত স্বর শোনা গিয়েছিল, 'বাস্ ঔর ক্যায়া, আভি

ফটো খিচ্‌লো।'

কিন্তু এ-সব ঘটনার মধ্যেই মহিলা যখন লোকনাথের হাত ছেড়ে নিজেকে বিন্যস্ত করায় ব্যস্ত, তখনই লোকনাথের বয়সী একজন হ্যাটকোট পরা স্বাস্থ্যবান ফরসা ঘোড়সওয়ার ভদ্রলোক তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন। উৎকণ্ঠিত উচ্চস্বরে ইংরেজীতে বলে উঠেছিলেন, 'ডার্লিং, কী ব্যাপার ? তোমার কোনো গুরুতর চোট লাগে নি তো ?'

বলতে বলতেই ভদ্রলোক একজন পাকা ঘোড়াসওয়ারের মতো লাফ দিয়ে ঘোড়া থেকে নেমেছিলেন। তাঁর হাতে ছিল একটি লিকলিকে ছপ্‌টি। তিনি রীতিমতো ক্রুদ্ধ, সন্দিগ্ধ এবং রক্তাভ চোখে লোকনাথকে একবার দেখেই, মহিলাকে দু' হাতে জড়িয়ে ধরেছিলেন, এবং লোকনাথের দিকে আবার একবার দেখে, মহিলাকে বলেছিলেন, 'নিশ্চয়ই কোনো ইচ্ছাকৃত নাটকীয় ঘটনা ঘটাবার চেষ্টা হয়েছিল ?'

ভদ্রমহিলার ফ্যাকাশে রক্তহীন মুখে তখন রক্তের সঞ্চার হয়েছিল। তিনি ঘাড় ঝাঁকিয়ে তাঁর ঘাড় ছাঁটা চুলে ঝাপটা দিয়ে ইংরেজীতে জবাব দিয়েছিলেন, 'না, না, ইচ্ছাকৃত বা চেষ্টাকৃত কোনো নাটকীয় ঘটনা ঘটানো হয় নি। আসলে আমার স্যাডেলটাই ছিল লুজ্‌, ঘোড়াটাও একটু বদ্‌মেজাজী। আমি এই ভদ্রলোকের বাঁ পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলাম, হঠাৎ আমার ঘোড়াটাই ওঁর ঘোড়ার ঘাড়ের ওপর গিয়ে পড়লো। আর আমার স্যাডেলটা ঘুরে যেতেই আমি পড়ে যাচ্ছিলাম। এ ভদ্রলোক আমাকে না ধরে ফেললে আমি ঘোড়ার ওপর থেকেই পড়ে যেতাম। উনি নিচে নেমে যেতে ওঁর ঘাড়ের ওপর পড়েছিলাম, নইলে ছোটখাটো পাথরের টুকরোয় আমি নিশ্চয় ঘায়েল হতাম।'

লোকনাথ ভদ্রলোকের প্রাথমিক রুষ্ট, ক্রুদ্ধ অভিব্যক্তি এবং কথাবার্তা শুনে খানিকটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। মনে মনে যে রাগ হয় নি, বা অপমানিত বোধ করে নি, তাও না। অথচ এই বিদেশ বিভূঁয়ে খানিকটা অসহায় বোধও করেছিল। তবে ভেবেই নিয়েছিল, ভদ্রলোক যদি ছপ্‌টি ঘুরিয়ে বেশী আস্ফালন করেন, তা হলে ও সমুচিত জবাব

দিতে দ্বিধাবোধ করবে না। তার জন্য যে কোনো রকম দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার মুখোমুখি হবার জন্য ও প্রস্তুত ছিল।
ইতিমধ্যে ওদের ঘিরে কিছু ভ্রমণকারী মহিলা-পুরুষ অশ্বসওয়ারদের একটা জটলা শুরু হয়ে গিয়েছিল। তাদের চোখ মুখের ঔৎসুক্য দেখে বোঝা যাচ্ছিল, তারা একটি বিবাদ সংঘর্ষের মজা দেখার প্রত্যাশা করছিল। কিন্তু ভদ্রমহিলার কথা শুনতে শুনতে ভদ্রলোকের ক্রুদ্ধ সন্দিগ্ধ মুখ কেবল স্বাভাবিক হয়ে ওঠে নি, তিনি হাসতে হাসতে সাগ্রহে লোকনাথের দিকে একটি হাত বাড়িয়ে দিয়ে হেসে ইংরেজীতে বলেছিলেন, 'মাফ্ করবেন, আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারি নি। এসব জায়গায় কিছু লোকের প্রগল্ভতার বাহুল্যে অনেক সময় বাজে ঘটনা ঘটে যায়। আমি স্বভাবতঃই আমার স্ত্রীর জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলাম।'
লোকনাথও ভদ্রলোকের হাত ধরে হেসে বলেছিল, 'আপনার পক্ষে সেটাই স্বাভাবিক। আসলে আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঘটনাটা ঘটে গিয়েছিল।'
'ওটা আপনি না বললেও এখন আমি বুঝতে পারছি।' বলে হেসে তিনি স্ত্রীর দিকে তাকিয়েছিলেন। তখনো তিনি স্ত্রীকে এক হাত দিয়ে ধ'রে রেখেছিলেন, এবং সমবেত জটলার দিকে ভ্রূকুটি চোখে তাকিয়ে হিন্দীতে বলেছিলেন, 'হুজৌর ঔর হুজৌরাইন, খেল্ খতম্, আভি আপলোক আপনা খেল্ মে যা সক্তে হ্যায়।'
ভদ্রলোকের বলার মধ্যে এমন একটি ভঙ্গী ছিল, সকলেই যেন একটু অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে, নিজেদের ঘোড়া ছুটিয়ে সরে পড়েছিল। তবে দু চারজন তরুণ-তরুণী আওয়াজ দিতে ছাড়ে নি। কিন্তু লোকনাথকে অবাক্ করে দিয়ে, এক ঘোড়সওয়ার যুবক তার অন্য ঘোড়সওয়ার সঙ্গিনীকে পরিষ্কার বাঙলায় বলে উঠেছিল, 'যাক, সুন্দ-উপসুন্দের লড়াইটা তা হলে লাগলো না।'
লোকনাথ অবাক্ হয়ে যুবক অশ্বসওয়ারটির দিকে তাকিয়েছিল। বাঙালী! কিন্তু যুবকটি তখন তার সঙ্গিনীসহ ঘোড়া চালিয়ে খিলানমার্গের দিকে

উঠতে আরম্ভ করেছিল। লোকনাথের মুহূর্তেই মনে পড়ে গিয়েছিল চলে যাওয়া যুগলটিকে। ও নার্গিস হ্রদে ওর হাউসবোটের পাশেই একটি ছোট হাউসবোটে গতকাল এবং আজ সকালেও দেখেছে। আশ্চর্য, ওরাও তা হলে সুন্দ-উপসুন্দের লড়াই দেখে মজা পাবার প্রত্যাশায় ছিল! আর লোকনাথ ভাবছিল, পাঞ্জাব বোম্বাই থেকে আসা অবাঙালীরাই একমাত্র এ-রকম একটা, অপরের সংকট দেখে, মজা পাবার আশায় ছিল।

'আরে কী হলো মিস্টার।' মহিলার স্বামী ভদ্রলোক আবার লোকনাথের হাত টেনে ধরে, ঝাঁকুনি দিয়ে বলেছিলেন, 'আপনি হঠাৎ কী নিয়েএতো চিন্তিত হয়ে পড়লেন?'

লোকনাথ ঝটিতি নিজের অন্যমনস্কতার খোলস থেকে বেরিয়ে এসে হেসে বলেছিল, 'না, মানে সমস্ত ব্যাপারটাই এমন আকস্মিক, আমি তার চমকের ঘোরটাই এখনো যেন কাটিয়ে উঠতে পারছি না।'

ওঁরা স্বামী-স্ত্রী সশব্দে হেসে উঠেছিলেন। স্বামী বলেছিলেন, 'আসলে ধরে নিন, এটা একটা কোইন্‌সিডেন্স্‌। এই দৈব ঘটনা সম্ভবতঃ আপনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটানোর জন্যই। আমাদের পরিচয়টাই আগে দি। আমরা এসেছি দিল্লী থেকে। আমি সেখানে একটি কলেজে সামান্য শিক্ষকতা করি, বিষয় অর্থনীতি। আমার নাম প্রেমজিৎ গুপ্তে। আর ইনি আমার স্ত্রী, নয়না গুপ্তে, সম্প্রতি দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশের ওপরে রিসার্চ ওয়ার্ক করছেন।'

লোকনাথ নিজের নাম বলে, বলেছিল, 'আমি বাঙালী, কলকাতা থেকে এসেছি। একটি কোম্পানিতে চাকরি করি। আমারও বিষয় অর্থনীতি, তবে তার সঙ্গে আইনও আছে।'

মিঃ গুপ্তে হেসে উঠে বলেছিলেন, 'তার মানে আপনি কোম্পানির একজন কেউকেটা। অর্থনীতি আর আইন, এ দুয়ের বন্ধন মানেই কোম্পানির চাবিকাঠি আপনার হাতে।'

লোকনাথ বিনীত হেসে তাড়াতাড়ি বলেছিল, 'না, না, আমি সামান্য এক-জন মানুষ।'

'বুঝেছি, বুঝেছি মিঃ মিত্র, আপনি অতি ক্ষুদ্রতম মানুষ।' নয়না হেসে ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলেছিলেন, 'কিন্তু শক্তিতে পরমাণুর মতো।'
লোকনাথ কিছু বলার আগেই প্রেমজিৎ বলে উঠেছিলেন, ঠিক বলেছো নয়না, খুব ঠিক বলেছো।' বলে তিনি লোকনাথের দিকে ফিরে বলেছিলেন, 'কিন্তু এখানে আর আমাদের সময় নষ্ট করার বোধহয় কোনো কারণ নেই। আপনি কোন্ দিকে যাচ্ছিলেন?'
লোকনাথ বলেছিল, 'খিলানমার্গের দিকে।'
'আমরাও ওদিকেই যাচ্ছিলাম।' প্রেমজিৎ বলেছিলেন, 'চলুন, তা হলে যাওয়া যাক। আপনি কি একলাই? নাকি আপনার অর্ধাঙ্গিনী আগেই এগিয়ে গিয়েছেন?'
লোকনাথ হেসে বলেছিল, 'না, না, আমি একলাই।'
নয়না জিজ্ঞেস করেছিল, 'তা অর্ধাঙ্গিনীকে সঙ্গে নিয়ে আসেন নি কেন?'
লোকনাথ হেসে জবাব দিয়েছিল, 'সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য যাই বলুন, আমার জীবনে এখনো অর্ধাঙ্গিনীর আবির্ভাব হয় নি।'
প্রেমজিৎ চোখ টিপে বলেছিলেন, 'ওহ্, আপনি এখনো একলা বিহঙ্গ, সারা আকাশে রাজত্ব করে বেড়াচ্ছেন?'
লোকনাথের সঙ্গে ওঁরা স্বামী-স্ত্রীও হেসে উঠেছিলেন। দেখা গিয়েছিল, তিনজনের তিনটি ঘোড়াই আশেপাশে ঘাসে মুখ দিয়ে বেড়াচ্ছিল ' লোকনাথ বলেছিল, 'মিসেস গুপ্তে, আপনার ঘোড়ার স্যাডেলের বেল্ট শক্ত করে বেঁধে নেওয়া উচিত। আপনাদের ঘোড়াওয়ালা কোথায়?'
'সে হয় তো এতক্ষণে খিলানমার্গের গ্লেসিয়ারে উঠে বসে আছে, জবাব দিয়েছিলেন প্রেমজিৎ, 'আমিই নয়নার ঘোড়ার স্যাডেল এঁটে দিচ্ছি।' বলে তিনি এগিয়ে গিয়ে নয়নার ঘোড়ার।স্যাডেলটা সোজা করে বসিয়ে, শিথিল বেল্ট টেনে আঁটতে আঁটতে বলেছিলেন, 'আসলে এসব সীজনে ঘোড়াওয়ালাগুলোর খালি পয়সা রোজগারের দিকে নজর। স্যাডেলের বেল্ট পর্যন্ত ভালো করে বাঁধে নি।
অতঃপর লোকনাথ গুপ্তে পরিবারের সঙ্গে ঘোড়ায় চেপে, আস্তে আস্তে

খিলানমার্গের দিকে উঠেছিল। ওর মস্তিষ্কে যদিও সেই বাঙালী যুবকের 'সুন্দ-উপসুন্দের কথাটা রীতিমতো একটা বিদ্বিষ্ট তীক্ষ্ণতায় বিঁধেছিল, তবুও গুপ্তে দম্পতীর দিকে তাকিয়ে দেখছিল। ওর অনুমান করতে অসুবিধা হয় নি, প্রেমজিৎ গুপ্তে ওরই বয়সী হবেন। নয়না গুপ্তে অনধিক তিরিশ। স্বামী-স্ত্রী দু'জনকেই বাইরে থেকে দেখলে গম্ভীর আর গর্বিত মনে হয়। কথাবার্তা আলাপেই বোঝা গিয়েছিল, ওঁরা কেবল দেখতেই সুন্দর না, কথায় আচরণেও যথেষ্ট অমায়িক ও ভদ্র। অবিশ্যি প্রেমজিৎ প্রথমে যে ভাবে যুগপৎ ক্রুদ্ধ ও উদ্বিগ্ন মুখে এগিয়ে এসেছিলেন, সেটা অস্বাভাবিক কিছু না। তার কারণটাও তিনিই ব্যাখ্যা করেছিলেন। অতি উৎসাহী কৌতুকপরায়ণ তরুণ-তরুণীরা অনেক সময়েই নাকি নানা রকম নাটকীয় ঘটনা ঘটায়।

খিলানমার্গের দিকে উঠতে উঠতেই, কথাবার্তায় জানা গিয়েছিল, গুপ্তে দম্পতী ডাল হ্রদে একটি হাউসবোটে আছেন। লোকনাথ যে নাগিন হ্রদের হাউসবোটে আছে, তাও জানিয়েছিল। পরের দিন তাঁরা সোনেমার্গ যাবার কথা ভাবছিলেন এবং লোকনাথকেও আহ্বান করেছিলেন। লোকনাথ মনে মনে উৎসাহই বোধ করেছিল, এবং জানিয়েছিল, ও ওর হাউসবোটের মালিককে সোনেমার্গে যাবার বাসের কথা জিজ্ঞেস করে ব্যবস্থা করবে।

খিলনমার্গের গ্লেসিয়ার ঠিক সেই রকম না, যেখানে পদার্পণ করা যায় না। বরং বরফ ঠেলে অনেকেই উঠে সেখানে স্কি করছিল। অবিশ্যি স্কির নামে এক ধরনের চাকা লাগানো খেলনা ঠ্যালাগাড়িতে চেপে, বরফের ঢালু দিয়ে দ্রুত নেমে আসছিল। যথার্থ স্কি করার মতো দু' চার জনকে চোখে পড়েছিল। তা ছাড়া, খিলানমার্গের বরফ ঠিক স্কির উপযোগীও ছিল না।

প্রেমজিৎ বলেছিল 'মিঃ মিত্র, আপনি কি স্কি করতে জানেন?'

—'আদৌ না।' লোকনাথ জবাব দিয়েছিল, 'আমি বরফে উঠবোই না। আপনারা কি যাবেন?'

প্রেমজিৎ তাকিয়েছিলেন স্ত্রীর দিকে, 'তোমার কী অভিপ্রায় নয়না?'
'আমিও তো একজন স্কি এক্সপার্ট।' নয়না চোখ ঘুরিয়ে হেসে বলেছিলেন, 'তবে এসেছি যখন, একবার ওই ঠ্যালায় চেপে গড়িয়ে নেমে আসবো। মিঃ মিত্রও চলুন না।
লোকনাথের বাঁ পায়ে কিছুটা ব্যথা লেগেছিল, আর সেটা লেগেছিল নয়নার ঘোড়ার গায়ে ধাক্কা খেয়েই।
সে-কথা চেপে গিয়ে বলেছিল, 'আপনারা ঘুরে আসুন। আমি আপনাদের শ্লেজগাড়ির খেলা দেখবো।'
'শ্লেজগাড়ির খেলা? বেশ বলেছেন।' নয়না খিলখিল করে হেসে উঠেছিলেন।
অগত্যা প্রেমজিৎ আর নয়না ঘোড়া থেকে নেমে এগিয়ে গিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই শ্লেজগাড়ির মতো ঠ্যালাওয়ালারা ওঁদের দু'জনকে ঘিরে ধরেছিল। দু'জনের হাতে একজন লাঠি ধরিয়ে দিয়ে বুঝিয়ে বলেছিল, নিচে নামবার সময় দরকার হলে, পা আর লাঠি দিয়ে কীভাবে ব্রেক কষতে হবে।
লোকনাথ বরফের ঢালুর নিচে দাঁড়িয়ে দেখছিল, যেন কাশীর গঙ্গার ঘাটে স্নানের মতো ভিড় হয়েছে। অনেকে নিজদের মধ্যে বরফ ছোঁড়াছুঁড়ি করে, হেসে দৌড়াদৌড়ি করছিল। এরকম একটি জায়গায় দৃশ্যটা খারাপ লাগছিল না। আসলে লোকনাথ খুঁজছিল সেই বাঙালী যুগলটিকে। ভিড়েব মধ্যে সহসা তাদের চোখে পড়ছিল না। ওর চোখ দুটো বারেবারেই প্রেমজিৎ আর নয়নার ওপর গিয়ে পড়ছিল। ওঁরা দুজনেই তখন বরফ ঠেলে ঠেলে ওপরে উঠছেন।
লোকনাথ ভিড়ের চারপাশে দেখছিল। তারপর হঠাৎ-ই ওর চোখে পড়েছিল নৌকোর মতো একটি বড় ঠ্যালায়, সেই বাঙালী যুগল। দেখে স্বামী-স্ত্রীই মনে হয়েছিল। পাশের হাউসবোটে দেখেও মনে হয়েচিল স্বামী-স্ত্রী। তবে বয়সটা নিতান্ত নবদম্পতীর মতো মনে হয় নি। সম্ভবতঃ বিয়ের পরেই মধুযামিনী যাপন করতে আসে নি। অবিশ্যি ঠিক কিছুই বলা যায়

না। হতেও পারে। যুবকটির বয়স, লোকনাথের অনুমান, ওর থেকে কম না। মেয়েটির বয়স নয়না গুপ্তের মতোই হবে। তবে অনেক সময় বাঙালী মেয়েদের বয়সে কম দেখায়। সে রকমও হতে পারতো।

লোকনাথ দেখেছিল, নৌকার মতো ভারী কাঠের চাকা-বিহীন ঠ্যালায় বাঙালী যুবকটিকে পিছন থেকে জাপটিয়ে জড়িয়ে ধরে রেখেছে মেয়েটি বরফের ঢালু দিয়ে ওদের কাঠের ঠ্যালা বরফ ছিটিয়ে নেমে আসছিল। যুবকটির হাতে লাঠি। মেয়েটি তার কাঁধের পাশ দিয়ে মুখ এগিয়ে এনে খিলখিল করে হাসছিল। যদিও হাসিটা শোনা যাচ্ছিল না। দেখেই অনেক সময় হাসির রকম বোঝা যায়।

লোকনাথ যুগলটিকে হাউসবোটে দেখে বাঙালী ভাবে নি। বাঙালী ভ্রমণকারীর সংখ্যা এখানে কম। পুরুষ-মহিলাদের পোশাক-আশাক দেখে কিছুই বোঝার উপায় নেই। হয় তো বাঙালী দম্পতীটিও লোকনাথকে দেখে বাঙালী বলে ভাবতেই পারে নি। পারলে কখনো সুন্দ-উপসুন্দের তুলনা দিয়ে ও-ভাবে বাঙলায় শোনাবার মতো করে বলতে পারতো না। কিন্তু কথাটা শোনামাত্রই লোকনাথ কেবল রুষ্ট হয় নি, কেমন একটা অপমানকর জ্বালা যেন সেই থেকেই ওর মস্তিষ্কে বিঁধে আছে। সেটা ও নিতান্তই বাঙালী বলে না। আসলে, দম্পতীটির চিন্তাধারা ও রসিকতাই ওর মনে তীক্ষ্ণ অপমানে বেজেছে। সৎ মানুষ কি ওরা কখনো দেখে নি? নারীঘটিত হঠাৎ কোনো ঘটনা ঘটলেই, সেখানে কেবলই অবৈধ রসের সন্ধান? ঘটনা দেখামাত্রই ওরা ঠিক করে নিয়েছিল, তিলোত্তমাকে ঘিরে একটা সুন্দর-উপসুন্দের লড়াই ফেলে কিছুটা মজা লুটে নেবে? ও-রকম একটা পরিবেশে কোনো দুর্ঘটনাই কি নরনারীকে ঘিরে ভাবা যায় না? মানুষ কোথাও বেড়াতে বেরিয়ে পড়লে কি সে তার বিবেক, বাস্তব-বোধ, অন্য মানুষের প্রতি বিশ্বাস, সমাজ সংসারের সব স্বাভাবিক বোধ-গুলোকে ঘরের আলমারিতে কুলুপ দিয়ে এঁটে রেখে আসে?

লোকনাথকে এই জিজ্ঞাসাগুলো আহত করেছিল, ঘটনাস্থলের মজা দেখবার সকলের কথা ভেবেই। কিন্তু অপমানের জ্বালাটা বড় বেশী

বিঁধেছিল বাঙালী যুবকের বাঙলা কথার খোঁচায়। তাদের কথায় স্পষ্টতঃই বোঝা গিয়েছিল, নয়না গুপ্তের সামনে লোকনাথের সঙ্গে প্রেমজিতের একটা লড়াই ঘটবেই। এটাই তাদের প্রত্যাশা ছিল। যদিও সেটা অসম্ভব কিছু ছিল না। প্রেমজিতের প্রথম আবির্ভাবের ভাবভঙ্গী মোটেই ভালো ছিল না। কিন্তু একটি অবাঙালী দম্পতীর কাছ থেকে লোকনাথ যে ব্যবহার পেয়েছিল, একজন বাঙালী দম্পতীর কাছে সেটাও আশা করার ছিল না। কষ্ট আর অপমানটা সেখানেই।

লোকনাথ অবিশ্যি জানতো, অপমানের জ্বালাটা হজম করা ছাড়া ওর উপায় ছিল না। কেন না, নাগিস লেকে, ওর পাশের একটা ছোট হাউস-বোটে বাঙালী দম্পতীটি থাকলেও তাদের আচরণের প্রতিবাদ করা ওর পক্ষে সম্ভব ছিল না। খিলানমার্গের গ্লেসিয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে বাঙালী দম্পতীটির দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে ওর মনে হয়েছিল, দম্পতীটি তাদের বরফের বুকে কাঠের ঠ্যালায় চেপে খেলা সাঙ্গ করে নেমে এলেই ও সরাসরি বাঙলায় কিছু শুনিয়ে দেবে।

কিন্তু ও জানতো, ওর পক্ষে তা কোনো রকমেই সম্ভব ছিল না। ওর চরিত্রের দিক থেকেই নিজের সঙ্গে সেটা একটা অনিবার্য বিরোধিতা। এবং ও যখন গুপ্তে দম্পতীর জন্য অপেক্ষা করতে করতে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে একটি সিগারেট টানছিল, তখনই বাঙালী দম্পতীটি হাসতে হাসতে নেমে এসেছিল ওর সামনে দিয়েই। দু'জনেই দু'জনের হাত ধরাধরি করে ছিল, গায়ে গায়ে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে পুলকিত উচ্ছ্বাসে হাসছিল।

স্বাভাবিক, লোকনাথ ভেবেছিল। সমতলের বাঙালী পাহাড়ে বরফে দৌড়াদৌড়ি ছুটোছুটি করতে পেলে আনন্দ হবারই কথা। লোকনাথ দ্রুত দৃষ্টি চালনা করে দেখে নিয়েছিল, মেয়েটির কাঁধের নিচে পর্যন্ত ছাঁটা চুলের মাঝখানে সিঁথিতে সিঁদুরের রেখা। দেহের ছিপছিপে গড়ন, অথচ স্বাস্থ্যের উজ্জ্বলতাই যেন বলে দিয়েছিল, মেয়েটির বয়স ছাব্বিশ-সাতাশের বেশী না। সেই তুলনায় যুবকটির বয়সও ছত্রিশ-সাঁইত্রিশের বেশী মনে হয় নি। তারা দেহের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে হাত ধরাধরি করে নেমে আসতে

আসতে লোকনাথকে প্রথমে দেখতে পায় নি। যুবকটি বাঙলায় বলেছিল, 'রত্না, এক মিনিট একটা সিগারেট ধরিয়ে নিই।' বলে দু'জনে হাতছাড়া-ছাড়ি করেছিল।

যুবকটি যখন সিগারেট ধরাচ্ছিল রত্না নাম্নী স্ত্রী তখন আশেপাশে তাকিয়ে বলেছিল, 'আমাদের ঘোড়া দুটোকে দেখতে পাচ্ছি না তো?'

যুবক সিগারেট ধরিয়ে, এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলেছিল, 'কিছু ভাবতে হবে না। ঘোড়াওয়ালা আমাদের ওপর ঠিক নজর রেখেছে. এখুনিই ঘোড়া নিয়ে আসবে। ভুলে যাচ্ছো কেন, লোকটা এখনো টাকা পায় নি।'

লোকনাথের কাছ থেকে দশ পনরো হাত দূরেই দম্পতীটি দাঁড়িয়েছিল। ও কয়েক মুহূর্ত ওদের দেখেই অন্যদিকে চোখ সরিয়ে নিয়েছিল আর মিনিটখানেক পরেই যুবকের গলায় বাঙলা বিদ্রূপের সুরে শোনা গিয়েছিল, 'আরে, রত্না, ওই যে ওখানে দাঁড়িয়ে সেই সুন্দ-উপসুন্দের একজন না?'

লোকনাথের সমস্ত শরীর আর মুখটা শক্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ও নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে স্বাভাবিক থাকবার চেষ্টা করেছিল। দম্পতীটির দিকে আদৌ ফিরে তাকায় নি। যেন তাদের অস্তিত্ব বা ভাষা, কোনো কিছু সম্পর্কেই ও অবহিত ছিল না। মেয়েটি—যার নাম রত্না, সে বলেছিল, 'এখন আর ওদের কারোকেই তুমি সুন্দ আর উপসুন্দ বলতে পারো না। বরং উলটোটাই ঘটেছে। চোখের সামনেই দেখেছো, ওরা নিজেদের মধ্যে কী রকম বন্ধুত্ব করে নিয়েছিল।'

যুবকের জবাবা স্বর শোনা গিয়েছিল, 'তা অবিশ্যি ঠিক। তবে তার কারণটা আমি বুঝতে পারছি।'

'কী কারণ?' রত্নার গলায় অবাক্ জিজ্ঞাসা শোনা গিয়েছিল।

যুবকটি বলেছিল, 'আমি বাজি ফেলে বলতে পারি ওরা এক জাত, একই প্রভিন্সের লোক নিশ্চয়ই। মিটমাট করে নিতে কোনো অসুবিধেই হয় নি।'

যুবকটির প্রাদেশিক মনোভাব লোকনাথকে রীতিমতো ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। কিন্তু ও মুখ ফিরিয়ে একেবারেই নির্বিকার ছিল এবং মনে মনে

ক্ষোভ অপমানবোধ থাকলেও বাঙালী দম্পতীটির মূঢ়তা ও মনে মনে খানিকটা উপভোগও করছিল।

রত্নার স্বর শোনা গিয়েছিল, 'তোমার কথা সত্যি নাও হতে পারে অনল। হয় তো সত্যি সত্যি এই লোকটি আর মহিলার অনিচ্ছাতেই একটা অ্যাকসিডেন্ট ঘটে গেছলো। হাজব্যাণ্ড লোকটি সেটা বুঝতে পেরেছিল, বিশ্বাসও করেছিল।'

লোকনাথ রত্নাকে স্বামীর নাম ধরে ডাকতে শুনে বুঝে নিয়েছিল, বাঙালী দম্পতীটি তথাকথিত আধুনিক। আজকাল দাম্পত্য জীবনে স্বাধীনতার কিছু না থাক, পশ্চিমী হাওয়ার ঝলকে পরস্পরের নাম ধরে ডাকাটা বেশ প্রচলিত হয়ে উঠেছে। অবিশ্যি লোকনাথের কাছে সেটা যে খুব খারাপ লাগে, তা বলা যায় না, তবে যে যুবক সামান্য একটা ঘটনার মধ্যে মানসিক বিকৃতি আর প্রাদেশিকতার গন্ধ খুঁজে পায়, তার যে কোনো আধুনিকতাই এর কাছে মেকি বলে মনে হয়।

যুবক অর্থাৎ অনল নামক যুবকটির স্বর শোনা গিয়েছিল, 'তোমার কথাটা আমি পুরোপুরি মেনে নিতে পারলাম না রত্না। এখানে এসেই কয়েক-দিনের মধ্যে অনেক বেলেল্লাপনাই তো দেখলাম। বিশেষ করে অবাঙালী—সো-কলড্ অ্যাংলিসাইজড্ ইণ্ডিয়ানদের। অ্যাকসিডেণ্ট ওটা মোটেই নয়। হয়তো ওই বেলবট পরা দেশী মেমসাহেবটির সঙ্গে আমাদের এই সাহেবের (লোকনাথকে দেখিয়ে) একটু লটঘট হয়ে গেছলো। দেখলে না, উগ্রচণ্ডী হাজব্যাণ্ডটিকে মেমসাহেব কেমন তাড়াতাড়ি বুঝিয়ে দিল, ও লোকটির কোনো দোষই নেই।'

'যাহ্, তুমি খালি খারাপ দিকটাই দেখছো।' রত্নার স্বরে কৌতুক মেশানো প্রতিবাদ শোনা গিয়েছিল এবং তার পরেই বলেছিল, 'এই যে আমাদের ঘোড়াওয়ালা ঘোড়া নিয়ে এসে গেছে, চলো যাই।'

যুবকের স্বর আবার শোনা গিয়েছিল, 'ও তুমি যাই বলো রত্না, আমার কাছে ব্যাপারটি মোটেই সুবিধের মনে হয় নি। তোমার সঙ্গে যদি কারো ও রকম, ঘোড়ার গায়ে ঘোড়া আর গায়ে পড়াপড়ি দেখতাম, আমি

লোকটাকে নির্ঘাত চাবকাতাম।’
‘খুব হয়েছে বীরপুরুষ।’ রত্নার স্বর শোনা গিয়েছিল, তোমার ওই বরফের হ্যাঁচকানিতে আর ঘোড়ায় চেপে আমার কোমরে ব্যথা ধরে গেছে। এখন হাউসবোটে ফিরে খানিকক্ষণ চিৎ হয়ে শুয়ে থাকবো।’
অনলের স্বর শোনা গিয়েছিল, ‘উঁহু, চিৎ না, উপুড় হয়ে শোবে, আমি তোমার কোমর টিপে দেবো।’ জবাবে রত্নার গলা শোনা গিয়েছিল, ‘আচ্ছা চলো আগে, তারপরে দেখবো কে কার কোমর টিপে দেয়।’ ছু’জনেই ঘোড়ায় চেপে লোকনাথের পাশ দিয়েই চলে গিয়েছিল। লোকনাথ না দেখার ভান করেও দেখে নিয়েছিল। যাবার সময় অনল আর রত্না, ছু’-জনেই ওর দিকে তাকিয়ে দেখেছিল। ওদের ঠোঁটে ফুটে উঠেছিল রঙ্গ-কৌতুকের হাসি। বলা বাহুল্য, লোকনাথের কাছে সেটাও আদৌ উপ-ভোগ্য হয় নি। তবে তাদের শেষের কথা কয়টি লোকনাথের কাছে বেশ স্বাভাবিক মনে হয়েছিল।
লোকনাথকে গুপ্তে দম্পতীর জন্য বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় নি। ওঁরা ওঁদের পোশাক-আশাক বরফে বেশ খানিকটা ভিজিয়ে নিয়ে এসেছিল। ঘোড়ায় চেপে গুলমার্গের নিচে এসে ঘোড়া ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। একটু নিচেই অপেক্ষা করছিল ওদের আলাদা আলাদা বাস। বিদায় নেবার আগে শেষ কথা হয়েছিল, সন্ধ্যাবেলায় নেহরু পার্কে দেখা হবে, এবং তখনই ঠিক করে নেওয়া হবে, কোন্ বাসে একসঙ্গে পরের দিন সোনেমার্গ যাওয়া হবে।

লোকনাথ ওর হাউসবোটে ফিরে পাশের ছোট হাউসবোটটির দিকে তাকিয়ে দেখেছিল। তখন স্নান খাবারের সময় হয়ে গিয়েছিল। অনল আর রত্নাকে বোটের বাইরের ডেকে দেখা যায় নি। লোকনাথ স্নান খাওয়া সেরে, যথারীতি একখানি বই নিয়ে বোটের ডেকে আরামকেদারায় রোদে পিঠ দিয়ে বসেছিল। দিনের বেলা ও কোনো দিনই ঘুমোতে পারে না। অফিসে চাকরি করেই এ অভ্যাসটা ওর হয়েছে। এমন কি রবিবারেও

ঘুমোয় না। সিনেমা থিয়েটার দেখার বাতিক তেমন নেই। নিতান্ত বিদেশের বিশেষ কোনো ফিল্ম উৎসব ছাড়া। অবিশ্যি আজকাল কলকাতার থেকে বম্বেতে কিছু ভালো ছবি তৈরি হচ্ছে। কলকাতার দু'-এক জন পরিচালকের ছবি বাদ দিলে, লোকনাথ কালেভদ্রে বম্বের ছবিও দেখতে যায়। তবে ওর অবকাশের সব থেকে বড় বন্ধু, যখন ও একলা, তখন বিভিন্ন বই। তবে তা গল্প-উপন্যাস না, বিজ্ঞান ও ভৌতিক ব্যাপার থেকে শুরু করে অর্থনীতি, আইনের বইও থাকে।

এই শরতের মরশুমে কাশ্মীর, বিশেষ করে শ্রীনগর সব সময়েই ভ্রমণকারীদের ভিড়ে সরগরম। কী বা জলে, কী বা স্থলে, সর্বত্রই। লোকনাথের দৃষ্টি বই থেকে বারে বারেই টেনে নিয়ে যাচ্ছিল হ্রদের বুকে রঙ-বেরঙের শিকারাগুলোর দিকে। শিকারার যাত্রীরাও সব রঙ-বেরঙের, এবং সারা পৃথিবীর নরনারীই তার মধ্যে ছিল।

হ্রদের ওপারেই সর্পিল সমতল রাস্তা চলে গিয়েছে। ওর ওপারেই পাইন বন, এবং তার সবার ওপরে, দূরান্তরে রুপোলী মুকুট পরা পর্বতশীর্ষ। তার ওপরে নীল আকাশ। লোকনাথ কখনো বইয়ের দিকে, কখনো বাইরের প্রকৃতি ও হাসিখুশী নরনারী, শিকারা, রাস্তার ওপরে চলমান যানবাহনের দিকে দেখছিল, এবং পাশের হাউসবোটের কথা ওর মনেই ছিল না। হঠাৎ ওর কানে মেয়েলি বাঙলা কথা ভেসে এসেছিল, 'এই অনল, এ যে সেই লোক।'

লোকনাথ মুহূর্তের মধ্যেই শক্ত হয়ে উঠেছিল। চোখ ফিরিয়ে তাকায় নি, এবং যেমন দূরের দিকে তাকিয়েছিল, তেমনিই নিজেকে নিশ্চল আর নির্বিকার রেখেছিল। অনলের গলাও ওদের বোটের ডেক থেকে শোনা গিয়েছিল, 'তাই তো বটে! মালটি আমাদের একেবারে পাশের বোটেই?'

'আহ্‌, কী আজেবাজে কথা বলছো? রত্নার গলা শোনা গিয়েছিল, 'ধরো যদি ভদ্রলোক বাঙালী হন? তা হলে?'

অনল জোর দিয়ে বলেছিল, 'আমি বাজি রেখে বলতে পারি, লোকটি কখনোই বাঙালী নয়। তা হলে আমাদের কথা শুনে একবারও ফিরে

তাকাতো। দেখছো না, ও ওর নিজের তালেই আছে। মাতৃভাষা এমন জিনিস, কেউ বললে একবার না একবার তাকিয়ে দেখবেই।'

লোকনাথ মনে মনে হেসেছিল। মাতৃভাষার প্রতি ওর নিশ্চয়ই দুর্বলতা আছে, কিন্তু অনলের মতো লোকের বাক্যে কোনো আকর্ষণ ছিল না, বরং বিকর্ষণটাই বেশী বোধ হয়েছিল। রত্নার গলা শোনা গিয়েছিল, 'তা ঠিক। তবে তোমার ওই মাল-টাল বলা উচিত না।'

লোকনাথ লক্ষ্য করছিল, মাথায় ঢাকনাবিহীন একটা শিকারা অনলদের বোটের দিকে এগিয়ে আসছে। ও আড়চোখে দেখে নিয়েছিল, অনল আর রত্না বাইরে যাবার জন্য সাজগোজ করেছে। অনল বলে উঠেছিল, 'উচিত না মানে? ও কি আমাদের কথা বুঝতে পারছে? তুমি দেখছি লোকটির ওপর একটু বেশী সদয় হয়ে উঠছো।'

'ওর ওপর আমার সদয়-নির্দয় হবার কী আছে? রত্না হেসে উঠে বলেছিল, 'বিশেষ করে যার নাড়ীনক্ষত্র কিছুই জানি না।'

লোকনাথ দেখছিল শিকারাটা প্রায় অনলদের বোটের গায়ে এসে লাগছে। অনল বলেছিল, 'বলা যায় না, হয়তো সকালে লোকটার সেই মেমসাহেব আর তার হাজব্যাণ্ডকে পটাতে দেখে তোমার ভালোই লেগেছে।'

'কী যে সব আজেবাজে কথা বলো।' রত্না যেন কিঞ্চিৎ বিরক্ত হেসে বলেছিল, 'ছেলেরা সবাই জেলাস্।'

অনল কিছু বলবার আগেই, শিকারার সামনে সাধারণ ময়লা কোটপ্যাণ্ট পরা যে লোকটি দাঁড়িয়েছিল, সে অদ্ভুত ইংরেজীতে বলেছিল, 'কাম স্যার, হিয়ার শিকারা, টেক ইউ ল্যাণ্ড। বলতে বলতে সে নিজে বোটে উঠে এসেছিল।

অনল আগে শিকারায় নেমে, হাত ধরে রত্নাকে নামিয়ে নিয়েছিল। ভেসে গিয়েছিল এদের শিকারা। হাউসবোটের অনেক মালিক বা কর্মচারিরাই ইংরেজীতে কথা বলার চেষ্টা করে। এই চেষ্টাটা তাদের কষ্ট করেই করতে হয়, বিশেষ করে ভারতের বাইরের বিদেশীদের জন্য। কিন্তু দেশীয় লোকদের সঙ্গে হিন্দীতে কথা বলতে অসুবিধা কোথায়? কাশ্মীরে তথাকথিত হিন্দী

ও পাঞ্জাবী অর্থাৎ উর্দু মেশানো বাজারি বোলচাল ভালোই চালু আছে। অন্যথা ভারতবর্ষের অনেক অঞ্চলের লোকের পক্ষেই কাশ্মীর বেড়ানো সম্ভব ছিল না। অবিশ্যি লোকনাথের ভাগ্য ভালো ওর হাউসবোটের মালিকটি হিন্দীতে কথা বলে, আচরণে যথেষ্ট অমায়িক এবং থাকে হাউস-বোটের পিছনেই একই বাড়িতে। হাউসবোটের পিছনে একটি সুইচ টিপলেই তখন কুটিরে বেল বেজে ওঠে, তৎক্ষণাৎ সে বা আর কেউ ছুটে আসে।

লোকনাথ কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখেছিল, অনল আর রত্নাকে নিয়ে মাথা খোলা শিকারাটা ক্রমে সোজাসুজি রাস্তায় ওঠার ঘাটের দিকে এগিয়ে চলেছে। ও হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখেছিল। বেলা তখন পৌনে তিনটা। সেপ্টেম্বরের বেলা ছোট হয়ে আসছিল। ও মনে মনে স্থির করে-ছিল একটি লাক্সারি শিকারাতে সরাসরি জলের পথেই নেহরু পার্কে যাবে। স্থির করা মাত্রই ও বোটের ভিতরে ঢুকে, শোবার ঘর থেকে হাউসবোটের মালিকের বাড়ির ঘণ্টা টিপে দিয়ে, নিজের পোশাক পরতে আরম্ভ করেছিল।

হাউসবোটের লোকটি কয়েক মিনিটের মধ্যেই এসে পিছনের বন্ধ দরজায় নক্ করেছিল। লোকনাথ দরজা খুলে দিয়ে হিন্দীতে বলেছিল, 'একটা বেশ ভালো গদিওয়ালা মাথা ঢাকা শিকারা ডেকে নিয়ে আসুন। আমি এই শিকারাতেই নেহরু পার্কে যাবো এবং আসবো।'

লোকটি 'জী বহোত্ আচ্ছা' বলেই পিছন দিক দিয়েই চলে গিয়েছিল। প্রায় কুড়ি মিনিটের মধ্যে হাউসবোটের সামনে সে একটি শিকারা এনে হাজির করেছিল। শিকারার ভিতরটি প্রকৃতই রাজকীয়ভাবে সাজানো ছিল। ফুলতোলা ঝালরের পরদাগুলো গুটিয়ে রাখা ছিল। ভিতরের পাটা-তনের ওপর বিছানো ছিল উলের গাব্বা। মখমলের বিছানা, বালিশ এবং তাকিয়া।

লোকনাথ বেশ খুশী হয়েছিল, এবং মনে মনে ভেবে রেখেছিল, গুপ্তে দম্পতীর সঙ্গে যদি কোনো শিকারা না থাকে বা মোটরবোট, তাহলে

ওর শিকারাতেই ওঁদের আসতে অনুরোধ করবে, এবং ওঁদের ডাল হ্রদের হাউসবোটে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক রকম, ঘটে যায় আর এক রকম। প্রথমতঃ লোকনাথ নেহরু পার্কের ভিড়ের মধ্যে গিয়ে মোটেই খুশী হতে পারে নি। পার্কটি একটি ছোটখাটো দ্বীপবিশেষ। সাজিয়ে রাখবার চেষ্টা করলেও লোকে তা মোটেই রাখতে দেয় নি। বাদামের খোলা চারদিকে ছড়ানো। একদল ছেলে জলে নেমে সাঁতার কাটছিল, তার মাঝে মাঝেই পার্কের ওপর এসে দৌড়াদৌড়ি করছিল। মোটরবোটগুলোর শব্দ রীতিমতো বিঘ্নকর মনে হয়েছিল। এবং সব থেকে দুর্ভাগ্যের কথা গুপ্তে দম্পতীর দেখা মেলে নি। অথচ নেহরু পার্কের প্রোগ্রাম-প্রস্তাবটা তাঁরাই দিয়েছিলেন!

লোকনাথ বলতে গেলে প্রতিটি নরনারীর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রেমজিৎ আর নয়নাকে খুঁজেছিল। সব থেকে দুর্ভাগ্যের বিষয়, অনল আর রত্নাও নেহরু পার্কেই বেড়াতে গিয়েছিল। ওরা লোকনাথকে দেখতেও পেয়েছিল। কিন্তু লোকনাথের কোনো কৌতূহল ছিল না ওদের নিয়ে। অতএব, ওরা কী বলাবলি করছিল, তা শোনবার রুচিও ছিল না। ওদের মোটামুটি বোঝা হয়ে গিয়েছিল।

নেহরু পার্কে একটি বিশেষ সময় অবধিই ভ্রমণকারীদের বেড়াতে দেওয়া হয়। সন্ধ্যা নামতে নামতেই সবাইকে দ্বীপটি ত্যাগ করতে হয়। লোকনাথ শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করেও প্রেমজিৎ আর নয়নার দেখা না পেয়ে ওর রাজকীয় শিকারায় ফিরে এসেছিল। আর সেই মুহূর্ত থেকেই কাশ্মীরে বেড়াতে যাওয়ার একাকীত্ব যেন ওকে বড় বেশী পীড়া দিচ্ছিল।

লোকনাথ হাউসবোটে ফিরে আসার আগে শিকারা থেকে শহরে নেমে, একটা এক্কা গাড়িতে চেপে শ্রীনগর শহরটার কিছু অংশ ঘুরে বেড়িয়েছিল। তার মধ্যেই নেমে এসেছিল রাত্রি। ওর মনের কোণে একটা ক্ষীণ প্রত্যাশা ছিল, হয় তো পথে-ঘাটে কোথাও গুপ্তে দম্পতীর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে! দুঃখের বিষয়, তা হয় নি। ও হাউসবোটে ফিরে এসে বেল টিপে লোকটিকে ডেকে খাবার দিতে বলার সঙ্গে সঙ্গেই জিজ্ঞেস করে-

ছিল, পরের দিন সোনেমার্গ যেতে হলে কখন কোথা থেকে কীভাবে রওনা হতে হবে?

হাউসবোটের লোকটি বলেছিল, সাহেব যদি সোনেমার্গ যেতে চান, তা হলে সেই রাত্রেই বাসের সীট বুক করে রাখা উচিত। লেকের ধারে রাস্তা থেকেই বাস এসে লোকনাথকে সকালবেলা তুলে নিয়ে যাবে। সারাদিন পরে বিকালে সোনেমার্গ থেকে বাস রওনা হয়ে রাত্রি সাতটা-আটটার মধ্যেই শ্রীনগর পৌঁছে যাবে। কিন্তু লোকনাথের যেটা জিজ্ঞাস্য ছিল, তা হলো বিশেষ একটি বাসই সোনেমার্গ যায় কিনা? লোকটি জানিয়েছিল, একাধিক বাস যায়।

লোকনাথ হতাশ হয়েছিল। কারণ গুপ্তে দম্পতী যদি পরের দিন সোনে-মার্গ যান, কোন্ বাসে যাবেন, তার কোনো ঠিক নেই। হয় তো লোক-নাথের সঙ্গে ওঁদের একত্রে যাত্রা হবে না। তবুও হাউসবোটের লোকটিকে টাকা দিয়ে তখনই যেকোনো লাকসারি বাসের একটি আসন সংরক্ষণের জন্য পাঠিয়েছিল।

লোকনাথের কপালটা সত্যি মন্দ। সকালবেলা প্রাতঃরাশ সেরে, শিকারায় উঠে, ও যে লাকসারি বাসটিতে ওর সংরক্ষিত আসনে এসে বসলো, সেই বাসে প্রেমজিৎ বা নয়না ছিল না। অথচ সেই বাঙালী দম্পতী অনল আর রত্না ছিল। বাস ছাড়ার আগেই গাড়ির ভিতর হিন্দী সিনেমার সস্তা আর অধিক প্রচলিত রেকর্ডের গান বাজতে আরম্ভ করেছিল। বাসের প্রতিটি আসনই ভরতি হয়ে গিয়েছিল, এবং যথাসময়ে সোনেমার্গের পথে রওনা হলো। কিন্তু প্রেমজিৎ আর নয়না এলেন না।

লোকনাথ যেতে যেতে বাইরের প্রকৃতি উপভোগ করছিল, আর তার মধ্যেই ভাবলো, কোনো জরুরী কারণে হয় তো গুপ্তে দম্পতীকে দিল্লী ফিরে যেতে হয়েছে। এ ছাড়া ওর মনে আর কোনো সান্ত্বনাই ছিল না। কিন্তু এক সময়ে ডাইনে এক পাশে দু'দিকে বরফের পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে বেগবতী নদী প্রবাহিত হতে দেখে এবং বাঁয়ে বিশাল উঁচু পর্বত-

মালা দেখতে দেখতে সবই ভুলে গেল। পথে যেতে যেতে প্রচুর আখরোটের গাছ, মাঝে মাঝে চিনার বৃক্ষ এবং কাশ্মীরের কৃষকদের ধাপে ধাপে চাষের জমি কেটে ধান চাষ করা দেখে ও মুগ্ধ হয়ে গেল। ধান জমিগুলো যেন লম্বা-চওড়া সিঁড়ির মতো ধাপে ধাপে নেমে এসেছে। পাহাড়ের ওপরে কোথাও জল ধরা আছে, সেখান থেকে মাঝে মাঝেই জল ছেড়ে দেওয়ায়, অনেক ঝর্নার মতো, ধাপে ধাপে সেই জল নেমে আসছে।

লোকনাথ ওর হাউসবোটের মালিকের কাছেই শুনেছিল, কাশ্মীরের অধিবাসীরা অধিকাংশই অন্নভোজী। ঠিক অন্নভোজী বললে যা বোঝায়, তাও না। শাকান্নভোজী। লোকটি বলেছিল, শালি আর করম শাক কাশ্মীরীদের সব থেকে প্রিয় খাদ্য। শালি মানে চাল, অর্থাৎ ভাত। আর করম এক শ্রেণীর মিষ্টি শাক। অথচ এদেশের কাঞ্চনবর্ণ, কালো চোখ মেয়েপুরুষদের নিজস্ব পোশাক দেখলে এবং চলাফেরায় ভাবাই যায় না, নিতান্ত বাঙালীর মতোই এরা শাকান্নপ্রিয় জাতি। তবে ভ্রমণকারীদের কাছে নানা রকমে রোজগারের সুযোগে এদের শিরদাঁড়ায় যেন কোথায় কিঞ্চিৎ ভার নেমে গিয়েছে। যেন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। কেবল কুর্নিশ আর টাকা।

লোকনাথের এ ধারণা হয়েছে অবিশ্যি শহরের এবং বিশেষ দর্শনীয় জায়গার লোকদের দেখেই। গ্রামের লোকের সঙ্গে এর আদৌ কোনো পরিচয় হয় নি। ওর মতো একজন বিদেশী ভ্রমণকারীর পক্ষে তা বোধহয় সম্ভবও না।

সোনেমার্গের পথে যেতে যেতে লোকনাথের পুরাণের কথা মনে পড়েছিল। পুরাণের অন্তরীক্ষ আসলে কাশ্মীর, এবং এখানকার অধিবাসীদেরই যক্ষ বলা হতো। আর যক্ষ ও যক্ষিণীরা যে দেখতে সুন্দর ছিল, তা বর্তমান কাশ্মীরবাসীদের দেখেও বোঝা যায়।

লোকনাথ দেখলো, সোনেমার্গের তেপান্তরে বাস ঢোকবার আগেই বাঁদিকে সবুজ ঘাস ছাওয়া পাহাড়ে কয়েক শো মেষ চরে বেড়াচ্ছে। আর বাস গিয়ে মাঠের পাশে একটি পান্থশালার সামনে দাঁড়াতেই সবাই ঝুপঝাপ করে লাফিয়ে নামতে আরম্ভ করলো। লোকনাথ দেখলো, শুধু ওদের

একটি বাস না আরো তিনটি বাস, গোটা চারেক প্রাইভেট কার এবং দু'টি জীপও এদিকে-ওদিকে পার্ক করে রয়েছে।

পান্থশালার কাছ থেকেই দেখা যাচ্ছে দূরের গ্লেসিয়ার। খিলানমার্গের বা গুলমার্গের সঙ্গে সোনেমার্গের তফাৎ, গ্লেসিয়ারের বরফে গিয়ে পা দিতে পারবে না। দূর থেকেই দেখতে হবে এবং রৌদ্র ঝলকিত গ্লেসিয়ার দেখবার জন্য সান-গ্লাস অবশ্যই দরকার। অন্যথায় ধাঁধানো চোখে গ্লেসি-য়ারের দিকে চোখ রাখা অসম্ভব।

লোকনাথ লক্ষ্য করলো, যারা আগে এসে পৌঁছেছে, তারা পান্থশালা থেকে কিছু খেয়ে নিয়েই ঘোড়া ছুটিয়ে দূরের উঁচু পাহাড়ে ও পাইন বনে ছড়িয়ে পড়েছে। কিংবা কেউ কেউ হয় তো ফিরে এসেই খাবে। এদিকে পান্থশালার নোকর বেয়ারা খানসামারা খাদ্য আর পানীয় দিতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। লোকনাথ দেখলো, অনল তার স্ত্রী রত্নার পাশে দাঁড়িয়ে বীয়ারের বোতলসুদ্ধই চুমুক দিচ্ছে এবং রত্নাকেও পান করতে অনুরোধ করছে। রত্না ঠোঁট বাঁকিয়ে মাথা নাড়ছে, খাবে না। কিন্তু ওষ্ঠরঞ্জনীর পরোয়া না করে যেভাবে মহিলারা বীয়ার পান করছেন, মনে হচ্ছে সারা-জীবনের তৃষ্ণা তাঁরা মিটিয়ে নেবেন এই মুহূর্তে। পুরুষদের তো কথাই নেই।

লোকনাথ সকলের মুখের দিকে দেখতে দেখতে এক জায়গায় ওর চোখ আটকিয়ে গেল। নয়না গুপ্তে না? সামনের ভিড় থেকে বেশ খানিকটা দূরে একজন ভদ্রলোকের সামনে দাঁড়িয়ে হাসছে। হাতে যে দু'জনেরই বীয়ারের গেলাস, তা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। ভদ্রলোক প্রেমজিৎ নন, নতুন মুখ, বয়সও কিছু কম। মাথায় ফারের টুপি। নয়নার পাশে আর এক তরুণী মহিলাও দাঁড়িয়ে বীয়ারই পান করছেন। কিন্তু প্রেমজিৎ কোথায়? লোকনাথ ওদিকে পা বাড়াবে ভেবেও থমকিয়ে গেল। প্রেমজিৎ হয় তো আশেপাশেই কোথাও আছেন। তা হলে ওঁরা কাশ্মীর ছেড়ে যান নি, এবং গতকালের প্রোগ্রাম অনুযায়ী আজ সোনেমার্গেও এসেছেন। অথচ গতকাল নেহরু পার্কে যান নি, লোকনাথের সঙ্গে হাউসবোটেও কোনো

রকম যোগাযোগ করে জানান নি ঠিক কোন্ বাসটিতে ওঁরা এখানে আসছেন। স্বভাবতঃই নয়না গুপ্তের দিকে এগিয়ে যেতে ওর দ্বিধা হলো। কতোটুকুই বা পরিচয়। সামান্য একটি দৈব দুর্ঘটনা, তার জন্যই দৈবাৎ পরিচয়। গুপ্তে দম্পতী হয় তো লোকনাথের কথা ভুলেই গিয়েছেন। না গিয়ে থাকলেও ওর সঙ্গে যোগাযোগ করার কোনো প্রয়োজন বোধ করে নি।

লোকনাথ নয়নার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে, পান্থশালার সামনের ভিড়ের দিকে তাকালো, অনল এখনো বীয়ার গলায় ঢেলে চলেছে। রত্না একটা বেঞ্চে বসবার জায়গা পেয়ে বসে পড়েছে, এবং ওর সামনে ধূমায়িত প্লেটের খাবার দেখে মনে হলো, কাবাব জাতীয় কিছু রয়েছে, তার সঙ্গে পরোটা বা রুটি। পরিবেশ এবং আবহাওয়ার একটি বিশেষ প্রবণতা মনের মধ্যে জাগিয়ে তোলে। লোকনাথেরও তুললো। সোনেমার্গের রৌদ্রালোকিত এই পাহাড় ঘেরা সবুজ সমতল প্রান্তে উলের পোশাকে যেন বেশ একটু গরমই লাগছে। টাই বাঁধা অবস্থায় জামার ভিতরে একটু ঘামও হচ্ছে। বীয়ারের বোতলগুলো দেখে মনে হচ্ছে, বরফের চাংড়া থেকে তুলে দিচ্ছে। তার মানেই ঠাণ্ডা। এক বোতল বীয়ার খাওয়া যেতে পারে। তাতে একাকীত্ব ঘুচবে না বটে, একটা আমেজ আসবে। তারপর ঘোড়ায় চেপে গ্লেসিয়ারের দিকে ঘুরে এলেই হবে।

লোকনাথ পান্থশালার সামনে এগিয়ে যাবার জন্য পা বাড়াতেই পিছন থেকে একটি হাত ওর কাঁধে এসে পড়লো, সেই সঙ্গেই সহাস্য ইংরেজী সম্বোধন, 'মিঃ মিত্র না?'

লোকনাথ ফিরে তাকিয়ে দেখলো, প্রেমজিৎ গুপ্তে। প্রেমজিৎ ওর কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে করমর্দনের জন্য এগিয়ে দিলেন। লোকনাথ হাত বাড়িয়ে দিল, কিন্তু নয়নাকে দেখার কথা বললো না। বরং বললো, 'আমি আপনাদের সাক্ষাতের আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম কোনো কারণে হয় তো আপনারা শ্রীনগর ত্যাগ করেছেন।'

'আদৌ নয়, আদৌ নয়।' প্রেমজিৎ লোকনাথের হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে

বললেন, 'গতকাল অবিশ্যি আমাদের আচরণে খুবই ক্রুটি হয়ে গেছে। আপনাকে কথা দিয়েও নেহরু পার্কে যেতে পারি নি, আর এমন সময় করতে পারি নি, একবার আপনার হাউসবোটে গিয়ে খবরটা দিয়ে আসি। কিন্তু মিঃ মিত্র, ক্রুটিটা ইচ্ছাকৃত না। গতকাল গুলমার্গে, আপনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমাদের ডাল লেকের হাউসবোটে গিয়ে দেখি, আমার ছোট শালী আর তার স্বামী এসে হাজির। ফলে সব ব্যাপারটাই ওলট-পালট হয়ে গেছে।

লোকনাথ এখন বুঝতে পারলো, ভিড়ের বাইরে নয়না কাদের সঙ্গে বীয়ার পান করছেন, আর হেসে হেসে গল্প করছেন। ও তাড়াতাড়ি বললো, 'না, না, মিঃ গুপ্তে, এটাকে আপনি ক্রুটি বলছেন কেন ? এমনটা তো ঘটতেই পারে।'

'আপনি নিশ্চয়ই কাল বিকেলে আমাদের খোঁজে নেহরু পার্কে গেছলেন ?

'তা গেছলাম।' লোকনাথ হেসে বললো, 'আমি একলা মানুষ, আমার আর কী করার আছে বলুন। তারপরেও আমি শ্রীনগরের রাস্তায় ঘোড়া-গাড়ি চেপে ঘুরে বেড়িয়েছি।'

'সত্যি দুঃখিত মিঃ মিত্র।' প্রেমজিৎ আবার লোকনাথের হাতে চাপ দিয়ে অন্তরঙ্গভাবে বললেন, 'আমার ভায়রাভাইটি আবার খুব হইচই করার লোক। গতকাল গুলমার্গ থেকে ফিরতেই সে বোতল গেলাস নিয়ে বসে গেল। আমার আর নয়নার লাঞ্চের কথা বলা ছিল। ইন্দর—মানে আমার ভায়রাভাই, সে আবার হাউসবোটের লোককে নতুন করে লাঞ্চ বানাবার হুকুম জারি করলো। ফলে, নানা গল্পে-গুজবে, পানভোজনে আমাদের লাঞ্চই শেষ হয়েছিল প্রায় বিকেলে। তখন আর নেহরু পার্কে যাবার সময় ছিল না। সব থেকে দুর্দৈব, আপনার নাগিস লেকের হাউস-বোটের নামটাও আমরা ভুলে গেছলাম। নয়নার তো ভীষণ মন খারাপ। ওর খালি এক কথা, 'মিঃ মিত্র আমাদের নিশ্চয়ই বাজে লোক ভাবছেন।'

লোকনাথ এবার প্রেমজিতের হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, 'ছি, ছি, কী যে বলেন। আমি মোটেই সে-রকম কিছু ভাবি নি। বরং বলতে পারেন,

আমি আপনাদের জন্য একটু চিন্তিতই হয়েছিলাম।'

প্রেমজিৎ তখন মুখ তুলে নয়নাদের দিকেই তাকিয়ে খুঁজছিলেন। এই সময়েই সেই বাঙলা কথা আবার লোকনাথের প্রায় পাশ থেকেই শোনা গেল, 'রত্না, দেখে যাও। যোগাযোগ ঠিকই আছে বলছি, এরা নিশ্চয়ই এক জায়গার, এক জাতের লোক।'

'যা খুশী হোক তাতে আমাদের কী?' রত্না বললো, 'চলো ঘোড়া কোথায় আছে, সেদিকে যাই। গ্লেসিয়ারটা দেখে আসি।'

লোকনাথ একবার অনল আর রত্নার দিকে তাকালো। অনল রত্নার হাত ধরে ভিড়ের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। রত্না যেন কী ভাবে একবার লোকনাথ আর প্রেমজিতের দিকে তাকালো। চলে যেতে যেতে বললো, 'তিলোত্তমাটি কোথায় গেলেন?'

অনলের অস্পষ্ট হাসি ও স্বর শোনা গেল, 'আছে, কোথাও আছে।'

'চলুন মিঃ মিত্র, নয়নারা যেখানে রয়েছে, আমরা সেদিকে যাই।' বলে লোকনাথের হাত ধরেই তিনি এগিয়ে চললেন।

ভিড়ের বাইরে নয়নাদের কাছাকাছি আসতেই, নয়নার চোখ প্রথম লোকনাথের দিকে পড়লো। চকিতেই ওঁর বীয়ার স্ফুরিত মুখে যেন রক্তের ঝলকটা উছলিয়ে উঠলো। এগিয়ে এসে অনায়াসে হাত বাড়িয়ে দিলেন, 'হ্যালো, হ্যালো মিঃ মিত্র, আপনি তা হলে সোনেমার্গে এসেছেন?'

লোকনাথও হাত বাড়িয়ে নয়নার হাত স্পর্শ করলো, বললো, 'হ্যাঁ, এই আশায়, যদি আপনাদের দেখা পেয়ে যাই।'

'কিন্তু আপনি বোধহয় আমাদের আসল কথা কিছু শোনেন নি?' নয়না নিজের বোন ও ভগ্নীপতির দিকে তাকালো।

প্রেমজিৎ বললেন, 'আমি সব কথাই মিঃ মিত্রকে বলেছি নয়না। তুমি তোমার বোন ও ভগ্নীপতির সঙ্গে ওঁর পরিচয় করিয়ে দাও।'

নয়না পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'মিঃ মিত্র, কলকাতা থেকে এসেছেন। গতকাল আমাকে জোর বাঁচিয়ে দিয়েছেন। আর এই আমার বোন ময়না, ওর স্বামী ইন্দর চৌহান।'

নমস্কার বিনিময়ের কোনো প্রশ্ন নেই, পুরো পশ্চিমী কেতায় সকলের সঙ্গেই করমর্দন। ইন্দর চৌহান কোন্ প্রদেশের লোক, লোকনাথ ঠিক অনুমান করতে পারলো না। ধরে নিল, মহারাষ্ট্রীয় হতে পারেন। বয়স ত্রিশ বত্রিশের বেশী নয়। খুব ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন, 'মিঃ মিত্র আর গুপ্তেজীর জন্য আমি দু' বোতল বীয়ার নিয়ে আসছি। এ ভাবে চলতে পারে না।' বলেই নিজের গেলাস হাতেই পান্থশালার দিকে ছুটে গেল।

নয়না হেসে বললেন, 'এসব ব্যাপারে ইন্দরের খুব উৎসাহ।'

সকলের সঙ্গে লোকনাথও হাসলো, এবং দেখা গেল, ইন্দরের উৎসাহই কেবল না, কাজ হাসিল করবার ক্ষমতাও তার ভালোই। ভিড়ের মধ্যে অতি অল্প সময়েই একজন বেয়ারার হাত দিয়ে সে চারটি বীয়ারের বোতল ও দুটি গেলাস এনে হাজির করলো। কাছে কোনো টেবিল না থাকায়, নিজের গেলাস বোতল মাটিতে নামিয়ে রেখে, প্রেমজিৎ আর লোকনাথের গেলাসে বীয়ার ঢেলে দিল। বীয়ার পান করতে করতেই জানা গেল ইন্দর সস্ত্রীক বোম্বেতে থাকে। সেখানে তার এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট বিজনেস আছে।

লোকনাথের এক বোতলেই বেশ আমেজ লেগে গেল। মাঝে মাঝে এক একটা বাতাসের ঝলকে আরামই লাগছিল। কথায় কথায়, সবাই সবাইকে দিল্লী বোম্বে কলকাতায় বেড়াতে আসার আমন্ত্রণ জানালো। ইন্দরের অর্ডার অনুযায়ী ইতিমধ্যে কাবাব আর পরোটা এসে গেল। বেলাও হয়েছে। বীয়ার পেটে গিয়ে সকলের ক্ষুধাও বাড়িয়ে তুলেছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্যুফে স্টাইলে সকলের খাওয়াটা বেশ তৃপ্তির সঙ্গেই মিটলো। ইন্দর কারোকে একটি টাকাও দিতে দিল না, নিজেই সব দিল। তারপরে ঘোড়ায় চেপে, চোখে ঠুলি লাগিয়ে সবাই গ্লেসিয়ার দেখতে যাত্রা করলো।

লোকনাথের মনে হলো, যতোই পাহাড়ের ওপর দিয়ে ঘোড়ায় চেপে এগিয়ে চলেছে, রৌদ্র ঝলকানো বরফ যেন তাতেই তরল ধারায় কাছে এগিয়ে আসছে। যদিও এ সময়ে বরফের গলবার কোনো কারণই নেই।

চোখের দেখায় সেই রকম মনে হচ্ছে। লোকনাথের এক পাশে নয়না, অন্য পাশে প্রেমজিৎ, প্রায় গায়ে গায়ে। মাঝে মাঝেই তিনজনের রেকাবের সঙ্গে রেকাবে ঠেকে যাচ্ছে। ইন্দর আর ময়না কয়েক কদম এগিয়ে। তা ছাড়াও আশেপাশে সামনে-পিছনে অনেকেই ঘোড়ায় চেপে চলেছে। তার মধ্যে স্থানীয় দরিদ্র ছেলেমেয়েরা এদিকে-ওদিকে ছোটাছুটি করছে। আর হাত বাড়িয়ে বলছে, 'পয়সানা বাবুজী, পয়সানা।'

শুনতে এক রকম. কথাটার আসল মানে, 'পয়সা দিন বাবুজী, পয়সা দিন।' লোকনাথের কোনো ধারণা নেই, এ অঞ্চলে চায-আবাদ কেমন হয়। সম্ভবতঃ মেষপালকই বেশী এ দিকের লোকজনের চেহারার সঙ্গেও শ্রীনগর বা তার নিকটবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীদের চেহারার অমিল লক্ষিত হয়। অনেকটা যেন তাতার মঙ্গোল মেশানো।

পাহাড়ের খানিকটা নিচে নেমে পাইন বনের এক পাশে দাঁড়াতেই হয়। তার বেশী নামা সম্ভব নয়. এবং গ্লেসিয়ার সেখান থেকেই সব থেকে নিকটবর্তী। লোকনাথের গরম লাগছিল। গলার টাইটা আলগা করে দিয়ে ও একটা সিগারেট ধরালো। ময়না চৌহান ছিল তার পাশেই। হাত বাড়িয়ে বললো, 'মিঃ মিত্র, আমাকে একটা সিগারেট দিন।'

'নিশ্চয়ই।' লোকনাথ তাড়াতাড়ি কোটের পকেট থেকে কিং সাইজ সিগারেট প্যাকেট বের করে লাইটারসহ ময়নার দিকে এগিয়ে দিল।

ময়না বললো, 'উঁহু, ওতে হবে না মিঃ মিত্র। আপনি লাইটারটা দিয়ে ধরিয়ে দিন।'

ফলে লোকনাথকে ময়নার অনেকটা কাছে এগিয়ে গিয়ে সিগারেট দিতে হলো। তারপর লাইটার জ্বালিয়ে ধরিয়ে দিল।

নয়না বলে উঠলো, 'ময়নার সব নেশাই চাই।'

'আপনি কি ধূমপান করবেন?' লোকনাথ নয়নাকে জিজ্ঞেস করলো।

নয়না মাথা নেড়ে বললো, 'অভ্যস্ত নই।'

লোকনাথ প্রেমজিৎ আর ইন্দরের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো। দু'জনেই মাথা নাড়লেন। যার অর্থ, ওঁরা কেউ ধূমপান করেন না। অবিশ্যি

গতকালও প্রেমজিৎকে ধূমপান করতে দেখা যায় নি।

'রত্না, ব্যাপারটা দেখ।' কাছ থেকেই অনলের বাঙলা বুলি শোনা গেল, 'আর একটা জুটিও জুটে গেছে। লোকটার এলেম আছে বলো। এক ঘোড়ার ধাক্কাতেই দুটি সুন্দরীকে জুটিয়ে ফেলেছে।'

রসের মন্তব্যটি যে লোকনাথকে নিয়েই, সেটা বুঝতে ওর অসুবিধা হলো না। কিন্তু ছেলেটাকে ও মনে মনে করুণা না করে পারলো না। হতভাগাও বললো মনে মনে। রত্নার মতো সুন্দরী স্ত্রী সঙ্গে থাকতে অন্য মেয়েদের কী করে সুন্দরী ভাবছে?

রত্না বললো, 'তোমার কি হিংসা হচ্ছে নাকি? তাহলে তুমি চেষ্টা করে দেখ, ঘোড়ার ধাক্কা দিয়ে সুন্দরীদের সঙ্গে জমাতে পারো কিনা।'

'হিংসে আমার মোটেই হয় নি।' অনল বললো, 'আমি খালি মজাটা দেখছি। লোকটা এলো আমাদের সঙ্গে এক বাসে, এখানে এসে ঠিক জুটে গেছে আবার। কিন্তু আমার বাবা সুন্দরীতে দরকার নেই। ঘোড়ার ধাক্কা দিতে গিয়ে শেষটায় মারামারিতে জড়িয়ে পড়বো?'

রত্না বললো, 'ওহ্, মারামারির ভয়েই লড়তে পারছো না। বীরপুরুষ বটে!'

অনল বললো, 'তা ছাড়া আমার দরকারই বা কী? রত্না চৌধুরী থাকতে আমার কোনো সুন্দরীকে দরকার নেই।'

যাক জানা গেল, ওদের পদবী তাহলে চৌধুরী। লোকনাথের অবিশ্যি তাতে কিছুই যায় আসে না। সব ব্যাপারটাই ওর কাছে কৌতুককর। তবে গতকালের সুন্দ-উপসুন্দ তুলনার কথাটা এবং আরও অন্যান্য কিছু মন্তব্য এখনো ওর মনে একটা অপমানের জ্বালায় বিঁধে আছে। অনল চৌধুরী কী করে, কোথায় থাকে, কে জানে? কিন্তু ওকে খুব রুচিবান বলা যায় না। কারণ, লোকনাথকে গতকাল থেকেই ও কখনো যথার্থ ভদ্রলোক ভাবতে পারে নি। যেন ও এখানে যেমন তেমন করে খানিকটা রোমান্স করতে এসেছে। অনল এবং নিশ্চয়ই রত্নাও বিশ্বাস করতে পারে নি, নয়নার সঙ্গে সংঘর্ষটা ওদের ইচ্ছাকৃত কোনো ঘটনা নয়। ওরা ধরেই নিয়েছে, সব ব্যাপারটা বানানো। যার অর্থ, নয়নার চরিত্রের প্রতিও

ওদের একটা অবিশ্বাস আছে।

'কী ব্যাপার মিঃ মিত্র? আপনি এমনভাবে চোখে ঠুলি এঁটে গ্লেসিয়ার দেখছেন, আমার কথার কোনো জবাবই দিচ্ছেন না?' খুব কাছ থেকেই বলে উঠলেন।

লোকনাথ চমকে উঠে হেসে বললো, 'ক্ষমা করবেন। মিসেস গুপ্তে. আমি সত্যিই একেবারে অন্যমনস্ক হয়ে গেছিলাম।'

'গ্লেসিয়ারের দিকে তাকিয়ে এতো কী ভাবছিলেন? বিশেষ কারোর মুখ?' নয়না চোখের তারা ঘুরিয়ে হাসলেন।

লোকনাথ হেসে বললো, 'না না, আমার সে রকম মুখের সঙ্গে কোনো পরিচয় আজও ঘটে নি। এমনিই নিতান্ত হিমালয়ের আশ্চর্য রূপ দেখ-ছিলাম। আপনি কী বলছিলেন?'

নয়না বললেন, 'আমরা বেশ কয়েকদিন হলো এসেছি। মোটামুটি সবই দেখা হয়ে গেছে। আগামীকাল ফিরে যাবার কথা ভাবছি। আপনি আজ রাত্রে আমাদের সঙ্গে এলে খুব খুশী হবো।'

'সানন্দে রাজী।' লোকনাথ বললো, 'কিন্তু আপনারা আগামী কালই চলে যাবেন শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল।'

নয়না বললেন, 'এখান থেকে ফেরবার পথে দিল্লীতে আপনাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখছি। এক দিনের জন্যে হলেও আমাদের অতিথি হবেন।'

'খুবই চেষ্টা করবো মিসেস গুপ্তে।' লোকনাথ বললো, 'সামান্য সময়ের জন্য হলেও আপনাদের বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করেছে।'

নয়না বললেন, 'দিল্লীতে গেলে বিশ্বাস করবো, আপনাকে আমরা মুগ্ধ করতে পেরেছি।'

লোকনাথ হেসে উঠলো।

সূর্যাস্তের আলোয় আকাশ লাল। গ্লেসিয়ারেও তারই প্রতিবিম্ব। এখন আর চোখ ধাঁধানো ঝলক নেই। কিন্তু ফেরবার সময় হলো। ফিরে গিয়ে বাসে ওঠবার পথে প্রেমজিতের সঙ্গে কথা হলো, শ্রীনগরে পৌঁছে বাস ডাল লেকের কাছে যেখানে দাঁড়াবে, সেখানে ওঁরা লোকনাথের জন্য

অপেক্ষা করবে। ইতিমধ্যে বাস ড্রাইভাররা জোরে জোরে হর্ন বাজিয়ে যাত্রীদের ডাকতে আরম্ভ করেছে।
লোকনাথের মুখে হঠাৎ কয়েক ফোঁটা জল পড়তেই ও আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলো, সূর্যাস্তের রক্তরাঙা আকাশে কখন মেঘের কালিমা ছড়িয়ে পড়েছে। ইলশেগুঁড়ি ছাটের মতো বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করেছে। বাসযাত্রীরা ঘোড়ার পয়সা মিটিয়ে যে যার বাসের দিকে ছুটছে। লোক-নাথও ছুটলো।

সোনেমার্গ থেকে কয়েক মাইল যাবার পরেই সব গাড়িগুলোকে পর পর দাঁড়িয়ে পড়তে হলো। একটি দুঃসংবাদ শোনা গেল, একটু আগেই বেশ ভালো রকম বৃষ্টিপাতের ফলে ল্যাণ্ডস্লাইড হয়ে রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আশার কথা, পাহাড় ভাঙার বহর সে রকম বিরাট কিছু না। ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই গাড়ি চলাচল শুরু করতে পারবে। রাস্তা পরিষ্কারের কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে।
দুঃসংবাদটির মধ্যে কিছুটা স্বস্তি ও সান্ত্বনা থাকলেও, অন্ধকার নেমে আসা পাহাড়ের কোলে সকলেই যেন কিঞ্চিৎ মুষড়ে পড়লো। তবে বাসের ভিতর বসে থাকতে কেউ রাজী না। বৃষ্টিও আর পড়ছিল না। সকলেই বাসের বাইরে পা বাড়ালো। লোকনাথ জানে, প্রেমজিতদের বাস ওর আগে রয়েছে। বাইরে নেমে ওঁদের সঙ্গে দেখা করার কথা ভাবলো। কিন্তু যেহেতু ওর আসনটা বাসের পিছন দিকে, সামনের ভিড়টা কাটবার অপেক্ষায় বসে রইলো।
এ সময়েই অনল দরজার কাছ থেকে ইংরেজীতে বলে উঠলো, 'এই যে মিস্টার, আপনি বোধহয় নামবেন না? তাহলে আপনি আমাদেব এই ব্যাগটার দিকে একটু দয়া করে খেয়াল রাখবেন।' বলে বাসের ছোট বাঙ্কে রাখা একটি বৃটিশ এয়ার মার্কা ব্যাগ দেখিয়ে দিল।
লোকনাথ ভুরু কুঁচকে শক্তমুখে অনলের দিকে তাকালো, এবং পরিষ্কার বাঙলায় বললো, 'আপনি কি আমাকে বলছেন? মাপ করবেন, আমি

আপনার মাল পাহারা দেবার জন্য এখানে বসে থাকতে আসি নি।'
বলেই ও উঠে দাঁড়ালো।

অনলের মুখ দেখে মনে হলো, ওর মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয়েছে। আর ওর পাশে রত্নার চোখেমুখে রাজ্যের বিস্ময়! ওরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনের দিকে একবার চোখাচোখি করলো, তারপরে অনল একবারে তোতলা হয়ে গিয়ে বললো, 'আ-আ-মানে আপনি বা-বাঙালী?'

বাস থেকে তখন প্রায় সবাই নেমে গিয়েছে, কেবল দরজার কাছে বিস্ময়াহত অনল আর রত্না। লোকনাথ কয়েক পা এগিয়ে বললো, 'হ্যাঁ, তবে আমি নিজেকে প্রধানতঃ একজন ভারতীয় বলেই ভাবি। দেখি, দয়া করে পথটা ছাড়ুন, আমাকে নামতে দিন।'

অনল আর রত্না যেন চমকিয়ে ওঠে, অতি মাত্রায় ব্যস্ত হয়ে দরজার কাছ থেকে দু'জনে দু'দিকে সরে গেল। লোকনাথ বাসের বাইরে বেরিয়ে এলো, এবং তৎক্ষণাৎ ওর মনে একটা প্রশ্ন জাগলো, ও কি অকারণ একটু বেশী রূঢ় হয়ে উঠলো? ওর বাঙালী পরিচয়টা জেনে দু'জনেরই যে রকম মুখের পরিবর্তন হয়ে গেল, নিজের মনটাই যেন তাতে কিঞ্চিৎ খচখচিয়ে উঠলো।

কিন্তু তার কোনো কারণ নেই। গতকাল থেকে অনল আর রত্নার মন্তব্যগুলো লোকনাথের পক্ষে ভোলা সম্ভব না। বিশেষ করে অনলের মন্তব্যগুলো। তার মন্তব্যগুলো ছিল রীতিমতো রুচিহীন। অতএব লোকনাথের রূঢ়তার কোনো প্রশ্নই নেই। তা ছাড়া যে লোক সম্পর্কে গতকাল থেকে ওরা একটা বাজে ধারণা করে বসে আছে, সেই লোককেই নিজেদের মালের খবরদারির দায়িত্ব দেওয়ার মানে কী? সেটা তো আরও অভদ্রতা।

লোকনাথ বাইরে বেরিয়ে দেখলো, প্রায় প্রত্যেকটা গাড়িরই ভিতরের আলো জ্বলছে। কোনো কোনোটার হেডলাইটও। চারদিকে ছড়িয়ে পড়া নরনারীর ভিড়টাকে অনেকটা ছায়াচারীদের মতো দেখাচ্ছে। স্পষ্ট করে কারোকেই প্রায় চেনা যাচ্ছে না। মেঘটা কেটে যাওয়ায় দিনের শেষের স্তিমিত আলোটা আবার ফুটেছে, যদিও সেই আলোয় স্পষ্ট করে কিছুই দেখা যায় না। এক পাশে বরফের স্তর কাটা নদী বেগে প্রবাহিত হচ্ছে।

বিশাল রকমের দেহকে দেখাচ্ছে যেন মোটা কাচের মতো। প্রবল গর্জনের শব্দে আশেপাশের সবাই গলার স্বর চড়িয়ে কথা বলছে।

লোকনাথ সামনে এগোবার জন্য নদীর দিকে না গিয়ে ডান দিকের পাথরের ওপর দিয়ে গেল। অনেকেই ইতিমধ্যে নদীর ধারে বা ডান দিকের শিলাখণ্ডের ওপর বসে গিয়েছে। ধূমপান, গল্প, হাসি এমন কি কোনো কোনো গুচ্ছ গানও শুরু করে দিয়েছে। ল্যাণ্ডস্লাইডের আকস্মিক সংবাদের পরে সবাইকেই যেমন প্রথমে কিঞ্চিৎ চিন্তিত মনে হয়েছিল, এখন আর কারোকেই সে রকম মনে হচ্ছে না। তা ছাড়া আর একটা ব্যাপার দেখেও লোকনাথ মনে মনে না হেসে পারলো না, গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে পড়ায় অনেকেরই প্রাকৃতিক বেগও যেন বেড়ে গিয়েছে। মহিলা-পুরুষ নির্বিশেষে এদিকে-ওদিকে পাহাড়ের আড়ালে চলে যাচ্ছে।

'মিঃ মিত্র না?'

লোকনাথ একজনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়লো, দেখলো ইন্দর চৌহান। ও খুশী হয়ে বললো, 'হ্যাঁ, আমি আপনাদের খোঁজেই যাচ্ছিলাম।'

'আমাকে মিঃ গুপ্তে পাঠালেন আপনার খোঁজে।' ইন্দর বললেন, 'আমার ব্যাগে একটা আস্ত হুইস্কির বোতল রয়েছে। চলুন, সবাই মিলে ওটার সদ্ব্যবহার করি।'

এখন আবার হুইস্কি? অবিশ্যি এতে অবাক্ হবার কিছুই নেই। লোকনাথের কলকাতার অনেক বন্ধুবান্ধবেরই এ রকম পানাসক্তি আছে। কিন্তু এই গুপ্তে আর চৌহান পরিবার ধূমপান করেন না, সুরাপানে খুবই উৎসাহী। অবিশ্যি ময়না ছাড়া। লোকনাথ ইন্দরের সঙ্গে এগিয়ে যেতে যেতে বললো, 'বীয়ারই এখনো আমার পেটে রয়েছে, হুইস্কি আর পারবো না। তবু আপনাদের সঙ্গে গল্প তো করা যাবে।'

'আরে মিঃ মিত্র, এটা কি কোনো কথা হলো?' ইন্দর বললেন, 'বীয়ারের পরেই তো হুইস্কি জমে ভালো। বেস্‌টা ঠিক থাকলে আর ভাবনা নেই। বীয়ার হলো বেস্, এর পরে আপনি যা খুশী তাই পান করতে পারেন।'

লোকনাথও ও যুক্তিটা জানে, 'হুইস্কি আফটার বীয়ার, নো ফিয়ার' অথবা

'বীয়ার আফটার হুইস্কি, ভেরি রিস্ক।' একটু এগিয়েই দেখা গেল, শিলাখণ্ডের ওপর প্রেমজিৎ নয়না ময়না বসে আছেন। সামনেই যে গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে, তার ভিতরের আলোর টুকরো এসে পড়েছে ওঁদের গায়ে। লোকনাথকে দেখে সবাই একযোগে ডেকে উঠলেন, 'আসুন স্বাগতম্ মিঃ মিত্র।'

নয়না তাঁর হাতে তুলে ধরলেন একটি স্কচ্ হুইস্কির বোতল। আশেপাশের অনেকের চোখেই যেন লুব্ধ কৌতুকের ঝিলিক। ইন্দর বললেন, 'নয়না বহেন, আপনিই আগে শুরু করুন। লেডিজ ফার্স্ট।'

লোকনাথ অবাক্ হয়ে দেখলো, নয়না একবার ওর দিকে দেখে, কাঁচা হুইস্কির বোতল ঠোঁটে চেপে ঢাললেন। বোতল এগিয়ে দিলেন ময়নার দিকে। ময়নাও সেইভাবেই বোতলে চুমুক লাগালো। না, লোকনাথ কোনো মহিলাকে ইতিপূর্বে এ রকম নীট হুইস্কি পান করতে দেখে নি, একমাত্র স্কচ্ অন্ রক ছাড়া। তবু তার সঙ্গে বরফের টুকরো থাকে। ময়না বোতলটা লোকনাথের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, 'মহিলাদের পরেই আমাদের অতিথি চুমুক দেবেন।'

প্রেমজিৎ বলে উঠলেন, 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।'

লোকনাথ বেশ খানিকটা ব্যস্ত উদ্বিগ্ন হয়ে বললো, 'আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা চাইছি। নীট হুইস্কি আমি একেবারেই চুমুক দিতে পারি না।'

'কিন্তু এখানে আপনি জল গেলাস পাবেন কোথায়?' নয়না বললেন, 'গেলাস যদিও বা থাকতো, এই নদীর জল কিছুতেই মুখে দিতে পারবেন না। এই বরফ-গলা জল মুখে দিলেই আপনার দাঁত নষ্ট হয়ে যাবে।'

লোকনাথ হেসে বললো, 'তার জন্য ঠিক বলছি না। আসলে এখন হুইস্কি পানের তেমন ইচ্ছে বোধ করছি না।'

ময়না ঘাড় কাত করে হেসে বললো, 'মহিলাদের নিয়ে ট্রয় আর লংকাপুরী ধ্বংস হয়ে গেছলো, আর আপনি আমাদের কথায় একটা চুমুকও দেবেন না?'

সবাই হেসে উঠলেন। প্রেমজিৎ বললেন, 'মিঃ মিত্র তো আজ রাতে

আমাদের সঙ্গে ডিনার খাবেন, তখনই একটু পান করবেন। এখন মহিলা-দের সম্মান রক্ষার্থে নেহাত একবার ঠোঁট ছোঁয়াবেন।'

লোকনাথ জানে, এই ঠোঁট ছোঁয়াবার ব্যাপারের মধ্যে একটি বিশেষ সেন্টিমেন্টের প্রশ্ন রয়েছে। ঠোঁট না ছোঁয়ালে এঁরা ভাবতে পারেন লোকনাথ ইচ্ছা করেই স্পর্শটি এড়িয়ে গেল। অগত্যা ময়নার হাত থেকে বোতলটি নিয়ে ওকে একবার ঠোঁট ছুঁইয়ে ঈষৎ পরিমাণ হুইস্কি মুখে নিতেই হলো, আর ওর জিভ মাড়ি গলা যেন জ্বলে গেল।

তারপর হাতে হাতে ঘুরতে লাগলো হুইস্কির বোতল। চললো নানা গল্প। কিন্তু বেশীক্ষণ চললো না। হঠাৎই সাড়া পড়ে গেল রাস্তা সাফ হয়ে গিয়েছে, এখনই সব গাড়ি ছাড়বে। লোকনাথ তখনকার মতো বিদায় নিয়ে তাড়াতাড়ি নিজের বাসে ছুটে গেল। এখন সবাই ঠেলাঠেলি করে উঠছে, যদিও তার কোনো দরকারই নেই। কারণ একটি যাত্রীকেও ফেলে কোনো বাস যাবে না।

লোকনাথ বাসে উঠে পিছনে ওর সিটের দিকে যেতে যেতে এক পাশে অনল আর রত্নাকে পাশাপাশি দেখতে পেলো। ওরা দুজনেই লোকনাথের দিকে তাকিয়েছিল। চোখের দৃষ্টিতে কেবল গভীর কৌতূহল আর জিজ্ঞাসা নেই। কিছুটা অস্বস্তি আর গ্লানিও যেন রয়েছে। অন্ততঃ ওদের সেই সরস হাসি উচ্ছলতা যেন দূরীভূত, এবং ম্লান দেখাচ্ছে। লোকনাথ তাড়াতাড়ি চোখ সরিয়ে নিজের জায়গায় গিয়ে বসলো। পিছনে বসে দেখলো, অনল রত্নাকে কিছু বলতে গেল। রত্না মুখ ফিরিয়ে নিল জানলার দিকে।

পরের দিন নিজের হাউসবোটে লোকনাথের ঘুম ভাঙতে বেশ একটু বেলাই হয়ে গেল। গত রাত্রে ডাল হ্রদে প্রেমজিতদের হাউসবোট থেকে পানভোজন আড্ডা শেষ করে ফিরতে রাত্রি বারোটা বেজে গিয়েছিল। কাশ্মীরের পক্ষে রাত্রিটা বেশ বেশী। অবিশ্যি লোকনাথের ফিরে যাবার জন্য একটি শিকারা কিছু বেশী টাকার চুক্তিতে ধরে রাখা হয়েছিল।

রাত্রে শিকারায় ফেরার সময় পুলিসের একটি শিকারা ওর গতিরোধ করেছিল, এবং তাদের একমাত্র দেখার ছিল, ওর শিকারায় কোনো মেয়ে আছে কিনা। বিশেষ করে কাশ্মীরী মেয়ে। কারণ কাশ্মীরে নাকি গণিকা-বৃত্তি নিষিদ্ধ এবং সে রকম কিছু ঘটলে নির্ঘাত পুলিসের হাতে ধরা পড়তেই হয়। অবিশ্যি এসব ক্ষেত্রে নাকি আবার টাকা ম্যাজিকের মতো-কাজ করে।

লোকনাথের ও সব নিয়ে কোনো মাথাব্যথা ছিল না। পুলিসকে ও বলেই দিয়েছিল, ও একটা ডিনার সেরে ফিরছে। পুলিসও ওকে কোনো রকম জ্বালাতন করে নি।

লোকনাথ আজ বেশী বেলায় ঘুম থেকে উঠে, প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করে, দাড়ি কামালো স্নানের পরে, প্রাতঃরাশ খেয়ে নিল। শ্রীনগরে দেখবার মতো আর কোনো আকর্ষণীয় বস্তু ছিল না। হাউসবোটের লোকটির সঙ্গে অন্যান্য জায়গায় বেড়াতে যাবার বিষয়ে কথা হচ্ছিল। লোকটি ওকে মোটামুটি কয়েকটি জায়গায় বেড়াতে যাওয়ার কথা বললো, যেমন পহেলগাঁও, মাত্তন, উলর লেক, ক্ষীরভবানী ইত্যাদি। লোকটির একটি প্রস্তাব ওর খুবই ভালো লাগলো। হ্রদের ওপর দিয়ে নৌকায় নাকি গোটা উপত্যকার চল্লিশ মাইল বেড়ানো যায়। তবে তা সময়সাপেক্ষ এবং ব্যবস্থা করতেও সময় লাগবে।

এইসব কথাবার্তা চলাকালীনই বাইরের কলিং-বেলটা বেজে উঠলো। হাউসবোটের লোকটি লোকনাথকে বললো, 'আপ বৈঠিয়ে সাব, ম্যায় দেখতে হুঁ।' সায়েব হাউসবোটকে লিয়ে কোই নয়া ট্যুরিস্ট লোগ আয়া মগর বাহার মে তো রিজার্ভ লিখা হ্যায়।' বলতে বলতে সে বেরিয়ে গেল।

লোকনাথ তখন ভাবছে, শ্রীনগর ছেড়ে কোন্ দিকে যাবে? কলকাতা থেকে এবং এখানে এসেও ভ্রমণবার্তার কাগজপত্র পড়ে জেনেছে, পহেলগাঁও জায়গাটি নাকি খুব সুন্দর। কাশ্মীরে এলে পহেলগাঁও অবশ্য দ্রষ্টব্য। অতএব ও মনে মনে পহেলগাঁও স্থির করে বাইরে বেরোবার জন্য তাড়াতাড়ি পোশাক বদলাতে লাগলো, এবং ওর পোশাক বদলানো শেষ

হবার আগেই, বেডরুমের পর্দার আড়াল থেকে হাউসবোটের লোকটি বললো, 'সাব, আপকো সাথ এক সাব ঔর মেমসাব ভেট করনে আয়া। উন্ লোগ্‌কো ম্যায় ডেকমে কুশিপর বৈঠায়া।'

লোকনাথের ভুরু কুঁচকে উঠলো। সাব মেমসাব কে হতে পারে? প্রেমজিৎ আর ময়না? ওঁদের তো আজ প্লেনে দিল্লী ফিরে যাবার কথা। তাহলে নিশ্চয়ই ইন্দর আর ময়না। ও আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গলার টাই বাঁধতে বাঁধতে বললো, 'ঠিক হ্যায়। আপ্ অন্দর আ সাক্‌তা।'

হাউসবোটের লোকটি ঘরের মধ্যে ঢুকলো। লোকনাথ চেয়ারে বসে জুতো মোজা পরে, মাথার চুলে চিরুনি চালাতে চালাতে হিন্দীতে বললো, 'আমি ভাবছি, আজই পহেলগাঁও চলে যাবো।'

হাউসবোটের লোকটি বললো, 'আজ আর কখন যাবেন? সকালের বাসে গেলে সুবিধে হতো। দুপুরে গেলে পৌছুতে আপনার দেরি হয়ে যাবে।'

লোকনাথ গায়ে কোট চাপিয়ে বললো, 'আমি বাইরে যাচ্ছি, দেখি কী করা যায়।' বলে ও বাইরের ডেকে এসে বিস্ময়ে যেন হোঁচট খেলো। আর ওকে দেখেই অনল আর রত্না চেয়ার ছেড়ে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো।

'আপনারা? কী মনে করে?' লোকনাথের স্বর যেন ওর অনিচ্ছাতেই খানিকটা কঠিন আর রূঢ় শোনালো, এবং ওর মুখও গম্ভীর হয়ে উঠলো। অনল আর রত্নাও অপ্রস্তুত আড়ষ্ট হয়ে উঠলো। অনল হাসবার চেষ্টা করে বললো, 'আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করতে এলাম। আপনি একজন বাঙালী, আমাদের পাশের হাউসবোটেই রয়েছেন, অথচ—।'

'কিন্তু গতকালই আপনাকে আমি বলেছিলাম, বাঙালী হওয়াটা কোনো বড় কথা নয়।' লোকনাথ বাধা দিয়ে বললো, 'আমি প্রধানতঃ ভারতীয় কথা বলতে বলতে চকিতে ওর চোখ একবার রত্নার মুখের দিকে পড়লো। আর হঠাৎ-ই যেন ওর মনটা অনুতপ্ত হয়ে উঠলো। রত্নার মুখ করুণ, চোখের দৃষ্টিতে দ্বিধাজড়িত হাসিটা যেন এইমাত্র লোকনাথের কথায় করুণতর হয়ে উঠলো।

রত্না তথাপি একটু হাসবার চেষ্টা করে বললো, 'ও বোধহয় আপনাকে ঠিক করে বলতে পারছে না। আসলে আমরা আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছিলাম।'

লোকনাথকে রত্নাই যেন এবার বিপাকে ফেলে দিল। খানিকটা অবাক্ হবার ভান করেই বললো, 'ক্ষমা ? কেন ? না, না, এর কোনো মানে হয় না।' বলেই সহসা যেন ও সম্বিত ফিরে পেয়ে তাড়াতাড়ি বললো, 'আপনারা দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন না।'

অনল কিছুটা অস্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে বললো, 'বসে আপনার সময় নষ্ট করবো না। আপনি নিশ্চয়ই কোথাও বেরোচ্ছেন।'

'এখানে বেরোনো মানেই তো বেড়াতে যাওয়া।' লোকনাথ বললো, 'এসেছেন যখন একটু বসুন, আপনাদের সঙ্গে আলাপ করা যাক।'

অনল আর রত্না নিজেদের মধ্যে একবার দ্বিধাজড়িত দৃষ্টি বিনিময় করলো, কিন্তু তৎক্ষণাৎ বসতে পারলো না। অনল বললো, 'আগে আমাদের পরিচয়টা আপনাকে দিতে চাই।'

'বোধহয় আমি আপনাদের নাম দুটো অন্ততঃ জানি।' লোকনাথ বললো, 'এমন কি পদবীও। আপনার নাম অনল চৌধুরী। আর ওর নাম রত্না।'

অনল আর রত্না, দু'জনের চোখেই অপার বিস্ময়। এখন আর ওদের দু'জনকে তেমন করুণ বিষণ্ণ আর অপ্রস্তুত দেখাচ্ছে না। অনল অবাক্ স্বরে জিজ্ঞাসা করলো, 'কী করে জানলেন ?'

'আপনারা দু'জনে দু'জনকে ওই নামেই ডাকাডাকি করছিলেন যতোদূর মনে পড়ছে।' লোকনাথ হেসে বললো।

রত্না বলে উঠলো অনলকে, 'এবার বুঝতে পারছো, উনি আমাদের কথা কতোটা শুনেছেন ? আর ওঁর সামনেই বাঙলাতে আমরা যা মনে এসেছে তাই বলেছি।'

অনল বললো, আর সেইজন্যেই আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি।'

'আরে না, না। ক্ষমা চাইবার কি আছে ?' লোকনাথ অন্তর থেকে মেনে না নিলেও ভদ্রতার সঙ্গে হেসে কথাটা বললো, 'বসুন আপনারা। কতো-

ক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন ?'

রত্না বললো, 'আপনি বসতে বলেছেন, এটাই আমাদের ভাগ্য। কিন্তু আপনি যতোক্ষণ না বলছেন আমাদের ক্ষমা করেছেন, ততোক্ষণ সত্যি বসতে পারছি না।'

অনল বললো, অন্যায় তো আমরা সত্যি করেছি। আশ্চর্য, জীবনে এ রকম ভুল কখনো হয় নি। একজন বাঙালীকে চিনতে পারলাম না ?'

'অবাঙালী হলেও সত্যি কথা বলতে কি আপনি আমাকে যা ভেবেছিলেন আমি তা নই।' লোকনাথ হেসে হেসে না বলে পারলো না, 'ভুল বোঝার ক্ষেত্রে একজন বাঙালী অবাঙালীর মধ্যে তফাৎ করা যায় ?'

রত্না বললো, 'ও কথা বলে আর লজ্জা দেবেন না।'

'আমার নাম লোকনাথ মিত্র।' লোকনাথ বললো, 'অবিশ্যি আপনাদের আগেই বলা উচিত ছিল।'

অনল বললো, লোকনাথবাবু, আমার হয়তো একটু বাঙালী সেন্টিমেন্ট আছে. তবু আপনার কথাই ঠিক। না জেনে বুঝে কারো সম্পর্কেই ও রকম মন্তব্য করা উচিত নয়। আপনার কাছে করজোড়ে ক্ষমা চাইছি।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। ও কথা আর বারে বারে বলতে হবে না।' লোকনাথের মন অনেকটা নরম হয়ে এলো। রত্নার দিকে তাকিয়ে বললো, 'বসুন। আলাপটা তা হলে একটু চায়ের সঙ্গেই হোক।'

রত্না বললো, 'আপনি বেরোচ্ছিলেন। এ সময়ে ব্যস্ত করা—।'

'বেড়াতে এসেও যদি ব্যস্ত হই, তাহলে তো মুশকিলের কথা।' লোকনাথ বললো, এবং বোটের ড্রইং রুমের দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে থাকা খিদ্‌মদগারকে হিন্দীতে বললো, 'এখানে আমাদের তিনজনের জন্য চা নিয়েআসুন। আর একটু কিছু খাবার—।'

রত্নাই তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললো, 'না, না আমরা এইমাত্র ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়েছি। আপনি আমাদের চা খাওয়াচ্ছেন, এটাই তো আশাতীত ব্যাপার!'

লোকনাথ হাউসবোটের লোকটিকে শুধু চা আনতে বলে অনল আর

রত্নার দিকে তাকিয়ে হাসলো। রত্নাকে বললো, 'বেশী বলে আমাকে লজ্জা দেবেন না। বসুন আপনারা।'

অনল আর রত্নার সঙ্গে, আর একটা চেয়ারে লোকনাথও বসলো। শ্রীনগরের সেপ্টেম্বরের উজ্জ্বল রোদ ওদের গায়ে। হাঁসের মতো রঙীন শিকারাগুলো হ্রদের বুকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দূরে রৌদ্র বিচ্ছুরিত কনক-কিরিট পর্বত-শিখর। অনল আর রত্না তখনো বারেবারে নিজেদেরই মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করছে। তারপরে রত্না হঠাৎ খানিকটা যেন আহত অথচ হেসে উঠে বললো, 'তুমি একটা যাচ্ছেতাই।'

লোকনাথ অবাক হয়ে ফিরে তাকালো। অনল বললো, 'দেখুন তো লোক-নাথবাবু, অপরাধ যখন করেই ফেলেছি, ক্ষমা চাওয়া ছাড়া আর কী করতে পারি?'

'কেন, আবার কী হলো?' লোকনাথ জিজ্ঞেস করলো।

অনল বললো, 'রত্না আমাকে এখনো ক্ষমা করতে পারছে না।'

লোকনাথের সঙ্গে রত্নার চোখাচোখি হলো। ওর ডাগর কালো চোখে ও ন্যাচারেল রঙে রাঙানো ঠোঁটে হাসি ফুটলো, বললো, 'আমার ক্ষমা করার কোনো প্রশ্নই নেই।'

অনল বললো, 'কিন্তু তুমি আমাকে এখনো চোখ দিয়ে খুসছো।'

'খুসছে? সেটা আবার কী?' লোকনাথ অনল আর রত্নার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো।

রত্না খিলখিল করে হেসে উঠলো। অনল বললো, 'খুসছে মানে শাসাচ্ছে। ক্ষমা তো আমি চেয়েছিই। এখন রত্না যদি বলে তাহলে আরো আরো কিছু করতে পারি।'

রত্নার হাসিটি লোকনাথের অন্তরকে যেন উজ্জ্বলতার ছোঁয়া দিল। এখন আর ওর মনে কোনো গ্লানি বা অভিযোগ নেই। বরং প্রেমজিৎ আর নয়নাকে হারিয়ে, নতুন দম্পতীর সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওর মনটা যেন খুশীই হয়ে উঠছে। ও বললো, 'অনলবাবু আর কী করতে পারেন? ও-প্রসঙ্গ তো মিটে গেছে।'

অনল বললো, 'কী জানি, রত্না হয় তো চাইছে, আমার ব্যবহারের জন্য আমি এখন নাকে খত্ দিই।'
রত্না আবার খিলখিল করে হেসে উঠলো। লোকনাথও হাসলো, বললো, 'সেটা একটু বেশী বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। উলটে তাহলে এখন আমাকেই ক্ষমা চাইতে হয়।'
'আপনাকে ? কেন ?' রত্না ঘাড় বাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করলো।
রত্নার ঘাড় বাঁকানো ভঙ্গিটা লোকনাথের চোখে মরালীর মতো লাগলো। বললো, 'সোনেমার্গে আমিও তো আপনাদের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহারই করেছিলাম।'
অনল বললো, 'আপনি কতোটা রূঢ় কথা বলেছিলেন, সে সব আমরা ভাবি নি। আপনি বাঙলায় কথা বলে উঠতেই লজ্জায় আর সংকোচে রীতিমতো বুক কেঁপে উঠেছিল।'
সকলের হাসির মধ্যেই হাউসবোটের লোকটি চা নিয়ে এলো। চেয়ার ঘিরে ডেকে একটি টেবিলের ওপর সে চায়ের ট্রে বসিয়ে দিয়ে চলে গেল।
রত্না ঝুঁকে পড়ে বললো, 'চা-টা আমি তৈরি করছি।'
'ওটা হোস্টের কাজ।' লোকনাথ বললো।
রত্না বললো, 'বাঙালী মেয়েরা কিছু কিছু কাজ হোস্টের হাত থেকে নিতেই ভালবাসে।' বলে লোকনাথের দিকে তাকিয়ে হাসলো, তারপরে অনলের দিকে, এবং চা করতে করতেই মুখ না তুলে বললো, 'একটা কথা না জিজ্ঞেস করে কিন্তু পারছি না। নিতান্ত মেয়েলী কৌতূহল ভেবে ক্ষমা করবেন।'
'আমাকে বলছেন ?' লোকনাথ জিজ্ঞেস করলো।
রত্না বললো, 'হ্যাঁ একলা বলেই একলা এসেছেন, নাকি আর একজনকে রেখে এসেছেন ?'
লোকনাথ প্রশ্নটা শোনা মাত্রই অন্তর্নিহিত অর্থটা বুঝতে পারলো। অনল বরং ভুরু কোঁচকালো। রত্নার নতমুখে হাসি, চকিতে একবার চোখ তুলে লোকনাথের মুখের দিকে দেখলো। লোকনাথ বললো, 'আপনার কথাটা

যদি ঠিক বুঝে থাকি, তাহলে তার জবাব হচ্ছে, ও-সব পাট আমার জীবনে নেই।'

'নেই মানে?' রত্নার হাত প্রায় কেঁপে গেল, ছিল তাহলে?'

লোকনাথ হেসে বললো, 'না-না নেইও। আমি ঝাড়া হাত-পা মানুষ।'

রত্না তাকালো অনলের দিকে। অনল বললো, 'কথাটা কিন্তু পরিষ্কার হলো না লোকনাথবাবু। ঝাড়া হাত-পা মানুষ বলতে আজকাল যে কাকে বোঝায়, জানি না। বিয়ে না করেও অনেকেই সংসার নিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন।'

লোকনাথ বললো, 'হিমশিম না খেলেও সংসারেই বাস করি। মা আছেন, একটি ছোট বোন আছে। অন্যান্য বোনদের বিয়ে হয়ে গেছে। সংসারের কর্তা আমিই।' লোকনাথ হেসে বুকে আঙুল ঠুকলো। আবার বললো, 'এর পরে জিজ্ঞেস করবেন না, এখনো একলা আছি কেন?'

'তা জিজ্ঞেস একবার করতেই হচ্ছে।' অনল বললো, 'সব কিছুরই সময় বলে একটা কথা আছে।'

লোকনাথ বললো, 'তাহলে বলতে হয়, এবারের মতো বসন্তগত জীবনে।'

রত্না তাকালো লোকনাথের দিকে। চায়ের কাপ ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, 'মনে হচ্ছে, একটা ব্যাকগ্রাউণ্ড আছে, মানে অ্যান ওল্ড স্টোরি।'

'আদৌ না।' লোকনাথ বললো, 'আপনি প্রেমের কথা বলছেন তো? ওসব কিছুই নেই। ধরে নিন না, সকলের জীবন তো এক রকম হয় না। ওসব চিন্তা মন থেকে আজকাল ছেড়ে দিয়েছি। আসুন, নাগিস লেকের হাউসবোটে বসে একটু গরম চা উপভোগ করা যাক।'

অনল চায়ের কাপ নিয়ে রত্নার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলো। রত্না যেন কিঞ্চিৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়লো। হঠাৎই যেন কয়েক মিনিটের জন্য নীরবতা নেমে এলো। তারপরে রত্না ঈষৎ হেসে বললো, তবু 'এবারের মতো বসন্তগত জীবনে রবীন্দ্রনাথের ও-গানটি গাইবার সময় আপনার বোধহয় এখনো আসে নি।'

'তা চাল্লিশ ছুঁই ছুঁই বয়সে ও গানটাই তো গাওয়ার কথা।' লোকনাথ হেসে বললো, 'ডস্টয়েভস্কি তাঁর নোটস্ ফ্রম এ আণ্ডারগ্রাউণ্ড বইয়ে

বলেছেন, চল্লিশ বছর বয়সের পরে একমাত্র মূর্খেরাই বেঁচে থাকতে চায়।'
রত্না বললো, 'ডস্টয়েভস্কির ধারণা তো উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। তারপরে পৃথিবী অনেক বদলেছে।'
লোকনাথ কিছু জবাব দেবার আগেই হাউসবোটের লোকটি সামনে এসে জিজ্ঞেস করলো, শিকারা ডাকতে হবে কী না? লোকনাথ হিন্দীতে বললো, 'হ্যাঁ। শিকারা তো ডাকতেই হবে। এখানে বসে থেকে কী করবো?'
অনল জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি এখন কোথায় যাবেন?'
'উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণ বলতে পারেন।' লোকনাথ বললো, 'তবে শ্রীনগরে আর থাকতে ইচ্ছে নেই। আজ যদি নাও হয়, আগামীকাল সকালেই পহেলগাঁও যাবো ভাবছি।'
রত্নার দু' চোখে খুশীর ঝিলিক ফুটলো, 'পহেলগাঁওয়ে তো আমরাও যাচ্ছি। আপনি আমাদের সঙ্গেই চলুন না।'
অনল বলে উঠলো, 'খুব ভালো হয়। আমরা আজই যাচ্ছি। বলতে গেলে আমরা বেরিয়েই পড়েছি। হাউসবোটের পাওনা গণ্ডা সব মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর ঘণ্টাখানেক বাদেই আমাদের বাস। যাবার আগে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম।'
'কিন্তু আমার পক্ষে এক ঘণ্টার মধ্যে তাড়াহুড়ো করে বেরুনো সম্ভব নয়।' লোকনাথ বললো, 'আপনারা আজ যান। আমি কাল যাচ্ছি।'
অনল বললো, 'তা হলে আপনার থাকবার ব্যবস্থা আমরাই করে রাখবো।' বলতে বলতে সে উঠে দাঁড়ালো।
রত্না উঠে দাঁড়ালো। বললো, 'তা হলে লোকনাথবাবু আসছেন কিন্তু। আমরা ভাবছি পহেলগাঁওয়ে গিয়ে তাঁবুতে থাকবো। আপনার জন্যও একটা সিঙ্গল তাঁবু বলে রাখবো।'
লোকনাথ উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'তাই হবে। তবে, আপনাদের দেখে মনে হচ্ছে মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে এসেছেন। তার মাঝখানে আমি এক মূর্তি-মান বেরসিক—।'
তার কথা শেষ হবার আগেই রত্না আর অনল হেসে উঠলো। অনল

বললো, 'কে বললে আপনাকে আমরা মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে এসেছি ?'
'অনুমান করছি।'
'আপনার অনুমান একেবারেই ভুল।' রত্না বললো, 'আমাদের চার বছর বিয়ে হয়েছে। আর এই চার বছরে অনেক জায়গাতেই ঘুরেছি।'
লোকনাথের মনে একটা জিজ্ঞাসা জাগলেও সে চুপ করে থাকলো। তবু মনে মনে না ভেবে পারলো না। চার বছর বিয়ে হয়েছে, অথচ এখনো কি ওদের কোনো সন্তান হয় নি ? অবিশ্যি হলেও রেখে আসার ব্যবস্থা করতে কোনো অসুবিধা নেই। আজকাল অনেকেই তা করে থাকে।
অনলদের শিকারা মালপত্র নিয়ে অপেক্ষা করছিল। চলে যাবার আগে রত্না হঠাৎ লোকনাথের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কিছু মনে করবেন না। আপনার সেই অবাঙালী বন্ধুরা কোথায় গেলেন ?'
'বন্ধু মানে, এখানেই পরিচয় সেই দুর্ঘটনা উপলক্ষে।' লোকনাথ বললো, 'মিঃ আর মিসেস গুপ্তে আজই দিল্লী চলে যাচ্ছেন। আর মিসেস গুপ্তের বোন আর ভগ্নীপতি এখানেই আছেন। তাঁদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হবে কিনা জানি না।'
রত্না হঠাৎ বলে উঠলো, 'না হওয়াই ভালো। এখন তো আমারাই আছি, কী বলো অনল ?' ও অনলের দিকে তাকিয়ে হাসলো।
অনল তখন শিকারা থেকে রত্নার উদ্দেশে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো, 'নিশ্চয় ! লোকনাথবাবু এখন আমাদের।'
লোকনাথ হাসলো। রত্না অনলের হাতের ওপর ভর করে শিকারায় নেমে গেল। দু'জনেই হাত তুলে বিদায় জানালো। লোকনাথও হাত তুললো।

পরের দিন প্রায় দুপুরে লোকনাথ পহেলগাঁওয়ে ট্যুরিস্ট অফিসের কাছে বাস থেকে নামলো। নেমেই দেখলো, অনল আর রত্না অফিসের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওর দিকে হাত তুলে নাড়াচ্ছে। দু'জনেই তাড়াতাড়ি নেমে এলো। রত্না বললো, 'আপনার তাঁবু আমরা ঠিক করে রেখেছি। এই অফিসের পেছনেই, ওপর দিকে।'

রত্না লাল শাড়ি আর জামার ওপরে বাসন্তী রঙের ওপরে কাজ করা একটি উলের স্কার্ফ জড়িয়েছিল। ওর মাথায়ও জড়ানো ছিল একটি ছাপা সিল্কের বড় রুমাল, যার দু' পাশ দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে চুলের গুচ্ছ। লোকনাথের চরিত্রের যা বিপরীত, তাই ঘটে গেল। রত্নার দিক থেকে ও সহসা চোখ ফেরাতে ভুলে গেল।

রত্না মুখ ফিরিয়ে নিতে গিয়েও আবার লোকনাথের দিকে তাকালো এবং সহসাই ওর মুখে রঙের ছটা লেগে গেল। অনল এগিয়ে এসে বললো, 'মালপত্রগুলো নামানো হয়েছে। আপনারগুলো দেখিয়ে দিন, আমি কুলিকে দিয়ে তাঁবুতে নিয়ে যাচ্ছি।'

'না, না। আপনি কেন? আমিই কুলিকে দিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।' লোকনাথ ব্যস্ত হয়ে বললো।

অনল হাত তুলে হেসে বললো, 'আপনি ধীরে সুস্থে আসুন না। আমাকে আপনার জিনিসগুলো দেখিয়ে দিন।'

লোকনাথ রত্নার দিকে তাকালো। রত্না বললো, 'সঙ্কোচ করবেন না।'

লোকনাথ অগত্যা অন্যান্য যাত্রীদের মালপত্র থেকে নিজের স্যুটকেস দুটো দেখিয়ে দিল। অনল একজন কুলিকে দিয়ে সেগুলো তুলিয়ে নিয়ে এগিয়ে গেল। লোকনাথ চললো রত্নার পাশে। রত্না মাঝে মাঝেই লোকনাথের দিকে তাকাচ্ছে ঠোঁট টিপে হাসছে. কিন্তু বলছে না কিছুই। লোকনাথ না জিজ্ঞেস করে পারলো না, 'কিছু বলবেন?'

'হ্যাঁ।' রত্না হাসলো, বললো, 'জানেন, মেয়েরা বোধহয় একটু হিংসুটে হয়? তা নইলে আমার কেন মনে হবে, মিসেস গুপ্তের সঙ্গে ঘোড়ার ধাক্কা না লেগে আমার সঙ্গে লাগলে আগেই আমাদের পরিচয়টা হয়ে যেতে পারতো।'

লোকনাথ হা-হা করে হেসে উঠলো। রত্নাও হাসলো। তার পরেই ঠোঁট ফুলিয়ে বললো, 'হাসছেন যে?'

'এটা তো হাসির কথাই।'

'মোটেই না।'

'তা হলে আর একবার ঘোড়ায় চেপে আপনার সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করতে হয়।'

রত্না হেসে উঠলো। হাসতে হাসতেই ওরা লোকনাথের জন্য ব্যবস্থা করে রাখা সিঙ্গল তাঁবুতে ঢুকলো। অনল তখন কুলিকে বিদায় করে একটা সিগারেট ধরিয়েছে। লোকনাথ তাঁবু, বিছানা, পিছনে কমোড আর গোসলখানা দেখে খুশী হলো। জিজ্ঞেস করলো 'আপনাদের তাঁবু কোথায়?'

'আপনার বাঁ পাশেরটাই আমাদের।' অনল বললো, 'আপনি হাতমুখ ধুয়ে আমাদের তাঁবুতে আসুন। আমাদের সঙ্গে ওখানেই খাবেন।'

লোকনাথ আপত্তি করে কিছু বলতে উদ্যত হতেই রত্না বললো, 'কিছু মনে করবেন না। আমি ছেলেদের শাসন না করে পারি না। অবিশ্যি যদিও ইস্কুলে পড়াই না। যান, বাথরুমে গরম জল তোয়ালে সাবান সব দেওয়া আছে। তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে আসুন। আমার ভাষণ খিদে পেয়েছে।'

লোকনাথ আর অনল চোখাচোখি করে হাসলো। লোকনাথ বললো, 'বেশ। তাহলে শাসিতই হই। আপনারা যান, আমি আসছি। তাঁবু কি খোলাই থাকবে?'

'হ্যাঁ। কোনো ভয় নেই।' অনল বললো এবং সে আর রত্না বেরিয়ে গেল।

লোকনাথ পিছনের পরদা সরিয়ে গোসলখানায় গেল। গরম জলে সাবান দিয়ে হাতমুখ ধুতে ধুতে রত্নার মুখটা বারে বারেই ওর চোখের সামনে ভেসে উঠলো। ওর জীবনে ব্যাপারটা সত্যি আনইউজুয়াল। কেন না, কেবল ব্যবহার না, এই অল্প সময়ের মধ্যেই ওর মনে কোথায় একটা মুগ্ধতাবোধ জেগে উঠছে। অথচ নয়না বা ময়নার থেকে রত্নাকে রূপসী বলা যায় না। এ কী তবে কেবল চোখের মায়া? মনের বিভ্রম?

অনলদের তাঁবুতে খেতে এসে খাবার দেখে সত্যি লোকনাথের গন্ধে ও দর্শনেই খিদে পেয়ে গেল। বড় তাঁবুর মাঝখানেই খাবার টেবিলে খাবার সাজানো রয়েছে। মটন বিরিয়ানি আর দুম্বার রেজালা। তাঁবুওয়ালারাই

কিচেন চালায় এবং খাবার ব্যবস্থা করে। অনল বললো, 'আমি চিকেন চেয়েছিলাম।'

'কিন্তু আমি চাই নি।' রত্না বললো, 'আমার মনে হয়, এখানকার এ খাবারটাই ভালো।'

লোকনাথ বললো, 'চমৎকার! এ সবের কাছে তু'পেয়ে চিকেন কিছুই না।'

রত্না ঘাড় বাঁকিয়ে অনলের দিকে তাকিয়ে চোখ ঘুরিয়ে বললো, 'দেখলে? আমাকে একটু ক্রেডিট দাও।'

অনল সে-কথার কোনো জবাব না দিয়ে খাটিয়ার পাশে টেবিলের নিচে থেকে বের করলো একটি হুইস্কির বোতল। লোকনাথকে বললো, 'চলবে তো?'

লোকনাথ হেসে বললো, 'আসক্তি নেই! নিয়মরক্ষা করতে পারি।'

'আমার গেলাসে কিন্তু একটুও ঢেলো না।' রত্না বললো।

'তুমি তাহলে একটু বীয়ার নাও।' অনল বললো।

রত্না বললো, 'মাফ করো। জানোই তো আমার ওসব একটুও ভালো লাগে না।'

অগত্যা অনল নিজের গেলাসে ডাবল লার্জ পেগ ঢেলে লোকনাথের গেলাসেও বড করে ঢালতে গেল। লোকনাথ তাড়াতাড়ি বললো, 'জাস্ট অ্যান অ্যাপিটাইজার। হাফ পেগ।'

অনল অবিশ্যি হাফ পেগের একটু বেশীই ঢাললো। তারপর নিজে অনেকটা নীট পান করলো, যা লোকনাথের পক্ষে অসম্ভব। ও তাড়াতাড়ি গেলাসে জল ঢেলে নিল। খাওয়া পর্ব শুরু হতে দেখা গেল অনল পানের মাত্রা বাড়িয়ে যাচ্ছে, খাওয়ার মাত্রা কমে যাচ্ছে। তার চোখ ক্রমেই লাল হয়ে উঠছে, প্রগল্‌ভতার মাত্রা বাড়ছে এবং লোকনাথের সামনেই রত্নাকে কয়েকবার আদর করবার চেষ্টা করলো। রত্না কেবল বাধা দিল না, ওর মুখ আস্তে-আস্তে শক্ত হয়ে উঠেছিলো। একবার হেসে বলেই উঠলো, 'জানেন লোকনাথবাবু, রত্না আপনাকে দেখে একেবারে লজ্জাবতী কলা-

বউটি হয়ে উঠছে ? ও কিন্তু তা বলে এতোটা 'শাই' নয়।'
লোকনাথ অস্বস্তিতে হাসলো। কিন্তু কী বলবে ভেবে পেলো না। ইতি-মধ্যেই ও লক্ষ্য করলো, রত্নার ম্লান মুখে বিষণ্ণতা ফুটে উঠেছে। খাওয়ার পাট মিটলো কিন্তু অনলের মাত্রাতিরিক্ত পানের মত্ততা কমলো না। সে চিৎকার করে গান করলো, প্রলাপ বকলো এবং শেষ পর্যন্ত এমন একটা ইঙ্গিতমূলক কথা বললো, যার মানে সে এখন রত্নাকে নিয়ে তাঁবুর ঝাঁপ বন্ধ করতে চায়।
লোকনাথের মনটা কেমন গ্লানিতে ভরে উঠলো। অথচ যতোবারই রত্নার সঙ্গে চোখাচোখি হলো ওর মনটা যেন বিজলি হানায় চমকিয়ে উঠলো। ওর মুগ্ধতাবোধের মধ্যে যেন একটা করুণ ব্যথাও জেগে উঠলো। ও রত্নাকে বলে বিদায় নিয়ে নিজের তাঁবুতে ফিরে হাতমুখ ধুয়ে জুতো পায়ে সুদ্ধই, জামা গায়ে খাটিয়ার নরম বিছানায় শুয়ে পড়লো। বাইরের সৌডার নদীর ওপারে পাহাড়ের মাথায় অল্প বরফের ওপর রোদের ঝলক লেগেছে।

লোকনাথ ঘুমিয়ে পড়ে নি, একটা তন্দ্রার মতো এসেছিল। হঠাৎ যেন ওর চোখের ওপর একটা ছায়া পড়লো, আর খুট করে একটা শব্দ হলো। ও চোখ মেলে তাকালো। দেখলো, তাঁবুর খোলা মুখের কাছে রত্না দাঁড়িয়ে রয়েছে। আড়ষ্ট হেসে বললো 'সরি লোকনাথবাবু, ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলাম তো ?'
লোকনাথ তাড়াতাড়ি খাটিয়ায় উঠে বসে বললো, 'না, না। ঠিক ঘুমোই নি। চোখ বুজেছিলাম। আসুন। অনলবাবু কোথায় ?'
'অনলবাবু এখন একেবারে শান্ত গভীর অনিল হয়ে গেছেন।' রত্না বললো, 'যাকে বলে তলিয়ে গেছেন। রাত্রের আগে আর উঠবেন না।'
লোকনাথ রত্নার দিকে তাকিয়ে দেখলো। ও শাড়ি জামা শাল, সবই বদলিয়ে এসেছে। মুখ একেবারে প্রসাধন বর্জিত না। বললো, 'যাবেন নাকি কোথাও ?' বেড়াতে এসে শুয়ে থাকতে আমার একটুও ভালো লাগে না।'

লোকনাথেরও তা ভালো লাগে না, জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায় যাবেন?'
'চলুন, সীডার নদীর ওপারে পাইন বনে বেড়িয়ে আসি।'
'অনলবাবুকে ডাকবেন না?'
'অসম্ভব! মিনিমাম সন্ধ্যের আগে ও আর উঠছে না। ওঠানোও যাবে না।'
লোকনাথের মনে যথেষ্ট ইচ্ছা থাকলেও একটু সঙ্কোচ হলো। রত্নার সঙ্গে একলা যাওয়াটা কি ঠিক হবে? রত্না যেন ওর মনের কথাটাই হেসে বললো, 'ভাবছেন আমার সঙ্গে যাবেন কিনা? না যাবার কোনো কারণ নেই। বরং আপনি সঙ্গে থাকলে আমি একটু নিশ্চিন্তে বেড়াতে পারি।
এ কথা বলার পরে আর না বলা চলে না। লোকনাথ মাথায় চিরুনি চালিয়ে গায়ে কোট চাপিয়ে রত্নার সঙ্গে বেরিয়ে পড়লো। ওরা একলা না, পহেলগাঁওয়ের পথে পথেই ভ্রমণকারী মহিলা পুরুষরা বেড়াচ্ছেন। ছোট ছেলেরা পিছনের মাঠে ও পাইন বনে ঘোড়ায় চেপে বেড়াচ্ছে। বড়রাও বাদ নেই।
লোকনাথ রত্নার পাশে পাশে সীডার নদীর ওপারে পাইন বনের রোদ-ছায়ার ঝিলিমিলির মধ্যে ক্রমেই ওপরে উঠতে লাগলো। রত্নার গা থেকে একটি হালকা মিষ্টি গন্ধ বাতাসে ভাসছে। চলতে চলতে রত্না এক সময়ে বললো, 'দুপুরে আপনার খাওয়াটা বোধহয় ভালো হয় নি?'
'কেন? ভালোই তো হয়েছে।'
'অনল যা মাতলামি করছিল।'
'ওটা তো দ্রব্যগুণ!'
'কিন্তু অপরের পক্ষে যেমন বিরক্তিকর, তেমনি অনেক সময় অপমানকরও। আপনার কাছে আমিই ক্ষমা চাইছি।'
'না, না। এর জন্য আবার ক্ষমা চাওয়ার কী আছে?'
'আছে, আমি জানি।' বলতে বলতেই রত্নার মুখে গভীর বিষণ্নতা নেমে এলো।
লোকনাথ হাসবার চেষ্টা করে বললো, 'কী হলো? বেড়াতে বেরিয়ে মুখ ভার করছেন কেন?'

'মুখ ভার করছি না। আসলে মনটাই ভার হয়ে আছে।' রত্না বললো, 'স্বামীনিন্দা করতে চাই না, কিন্তু আপনি হয় তো বুঝেছেন, আমাদের জীবনটা কোন্ ধারায় চলে?'

লোকনাথ বললো, 'বাইরে বেড়াতে বেরিয়ে অনলবাবু হয় তো একটু বেশী আনন্দ করতে চাইছেন।'

রত্না ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসলো, কিছু বললো না। কেবল একবার লোকনাথের চোখের দিকে তাকালো। সেই চোখের দিকে তাকিয়ে লোকনাথের বুক সহসাই যেন একটা দীর্ঘশ্বাসে ভারী হয়ে উঠলো।

এই সময় হঠাৎ মেঘের গর্জনে ও বিদ্যুৎচমকে পাইনবন যেন থমকিয়ে উঠলো। লোকনাথ আর রত্না লক্ষ্য করলো, ওদের আশেপাশে কেউ নেই। দেখতে দেখতে ঘন ঘন বজ্রপাত আর বৃষ্টিপাত শুরু হলো। অন্ধকার ঘনিয়ে এলো পাইনবনে।

'আশ্চর্য তো! কিছুই খেয়াল করি নি।' লোকনাথ বললো, 'কিন্তু এ রকম বাজ পড়লে তো গাছতলায় থাকা উচিত নয়।'

রত্না ডান দিকে হাত তুলে দেখিয়ে বললো, 'দেখুন তো, ওখানে একটা চালাঘর রয়েছে যেন?'

লোকনাথ দেখে বললো, 'হ্যাঁ। তাড়াতাড়ি আসুন।'

'দয়া করে আমার হাতটা একটু ধরুন।' রত্না হাত বাড়িয়ে দিল, 'মনে হচ্ছে পায়ের তলায় মাটি জলে পিছল হয়ে যাচ্ছে।

লোকনাথ রত্নার একটি হাত ধরে তাড়াতাড়ি সেই ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। একটি বৃদ্ধ লোক একলা বসেছিল। পাইন পাতার গদি করা রয়েছে মেঝেতে। লোকনাথ রত্নাকে নিয়ে ভিতরে ঢুকলো। বৃদ্ধ বললো, 'আ যাও, বৈঠ যাও।'

বৃষ্টি আর বজ্রপাত তখন অবিরাম চলেছে। সেই সঙ্গে পাইন বনে বাতাসের সাঁই সাঁই ধ্বনি। রত্না পাইন পাতার গদিতে পা দিয়ে বললো, 'বাহ্, সুন্দর। বসে পড়ি।' বলেই ও বসে পড়লো।

লোকনাথও একটা ফারাক রেখে বসলো। বললো, 'এমন জায়গায় এ

রকম বৃষ্টি আর কখনো দেখি নি।'

'আর আমার ইচ্ছে করছে, যাযাবরের মতো চিরদিন এখানেই থেকে যাই।' রত্না বললো লোকনাথের চোখের দিকে তাকিয়ে।

লোকনাথ হেসে বললো, 'দু'দিন ভালো লাগবে। তার পরে আর লাগবে না।'

'পরীক্ষা করবেন? তা হলে অবিশ্যি সারাটা জীবন আপনাকেও যাযাবর হয়ে আমার সঙ্গে থাকতে হবে।'

লোকনাথ তাকালো রত্নার দিকে। রত্নাও তাকিয়েছিল। মনে হলো ওর অতল কালো চোখের ঘূর্ণীতে লোকনাথ যেন ডুবে যাচ্ছে তবু ও হেসে বললো, 'এমন পরীক্ষা নেবার সাহস আমার নেই।'

'জানতাম, এ কথাই বলবেন।' রত্না ম্লান হাসলো।

ইতিমধ্যে মেঘের গর্জন থাকলেও বৃষ্টি একেবারে থেমে গেল। কিন্তু ঠাণ্ডা বেড়ে গিয়েছে। পাইনবনে টুপটাপ জল ঝরার শব্দ। বৃদ্ধ লোকটি বললো, 'আপ লোক ভাগ যাইয়ে। ফির বরখা আয়েগা তো রাত তক নহি ছোড়েগী।'

লোকনাথ আর রত্না দু'জনেই চালাঘরটি থেকে বেরিয়ে এলো। ঘরটি নিতান্তই কাঠুরেদের বিশ্রামের একটা আস্তানা। কিন্তু নিচের দিকে নামতে দু'জনকে সাবধানেই নামতে হচ্ছিল। বনের ঘাস মাটি রীতিমতো ভিজে আর পিছল। তবুও সামলানো গেল না। রত্না সহসা পা পিছলে গড়িয়ে পড়লো, আর আর্তনাদ করলো, 'লোকনাথবাবু!'

লোকনাথও মুহূর্তে রত্নাকে ধরতে গিয়ে পিছলে পড়ে দুজনেই একটা পাইন গাছের গোড়ায় আটকে গেল। কিন্তু ইতিমধ্যে রত্নার পোশাক অনেকটাই অবিন্যস্ত, বিপর্যস্তকর অবস্থা। লোকনাথের ততোটা না। ও দু' হাতে রত্নাকে টেনে কাছে নিয়ে বললো, 'কোথাও ভেঙেচুরে বা কেটে যায় নি তো?'

রত্নার চোখে-মুখে যন্ত্রণার ছাপ, আড়ষ্ট রুদ্ধস্বরে বললো, 'কোমরের বাঁ দিকে লেগেছে।'

লোকনাথ হাত দিতে গিয়েও থমকে গেল। রত্না যন্ত্রণাকাতর চোখে লোকনাথের দিকে তাকিয়ে বললো, 'এ সময়েও লজ্জা পাচ্ছেন ? একটু দেখুন না।'

লোকনাথ বাধ্য হয়েই রত্নার কোমরের বাঁ দিকে হাত দিল। ওর হাতে একটু রক্ত লেগে গেল। কাপড়টা একটু সরিয়ে দেখলো, শাড়ি ছিঁড়ে চামড়া খানিকটা ছড়ে গিয়েছে। রত্না ইতিমধ্যে নিজের শাল টেনে গায়ে জড়িয়ে কিছুটা বিন্যস্ত হবার চেষ্টা করে বললো, 'চলুন, আগে তাঁবুতে ফিরে যাই। তারপরে সব দেখা যাবে। আমাকে একটু তুলে ধরুন।'

লোকনাথ সাবধানে রত্নাকে তুলে ধরলো এবং সন্তর্পণে এগিয়ে চললো। জীবনে যে ও কখনো মেয়েদের ঘন সান্নিধ্যে যায় নি, তা নয়। তবু আজ মনে হলো, ঠিক এমন করে কোনো মেয়েকে ও গায়ে টেনে নেয় নি। এমন একটি স্পর্শ, কখনো যেন ওর মর্মে গিয়ে তোলপাড় করে নি। কোনো মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়েই এমন একটা ব্যাকুলতা বোধ করে নি। জীবনটা কি এমনি কতগুলো সহসা মুহূর্তের মধ্যে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপে প্রতিবিম্বিত হয়ে ওঠে ? লোকনাথ জানে না।

ওরা তাঁবুতে ফিরে এসে দেখলো, তখনো অনল নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে।

পহেলগাঁওয়ে দু'দিন থাকতে থাকতেই লোকনাথ ওর জীবনে প্রথম পরিবর্তনটা টের পেলো। জীবনে ও যা কখনো অনুভব করে নি, এই দূর প্রবাসে হিমালয়ের কোলে এক বিবাহিতা বাঙালী নন্দিনীর সান্নিধ্যে এসে সেটাই অনুভব করলো। এই অনুভূতির নামই ভালবাসা কিনা, ও জানে না। যদি তাই হয়, তা হলে বুঝতে হবে এই একটি বিষয়ে ওর জন্মলগ্নেই একটা কাঁটা বিঁধেছিল। ও বুঝতে পারলো, যে রমণীর সঙ্গে ওর জীবনের যোগাযোগ কোনো দিক থেকেই সম্ভব নয়, সহসা সেই রমণীর মুখোমুখি ওকে দাঁড়াতে হয়েছে। আর জীবনের চিররুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা মাথা কুটছে।

এই কথাটা যে মুহূর্তে ও বুঝতে পারলো তৎক্ষণাৎ ও ওর মনস্থির করে

ফেললো। পরের দিন সকালেই ওদের চন্দনওয়ারি যাওয়ার কথা। তাঁবুর সামনে জীপ এসে দাঁড়িয়েছে। অনল আর রত্না এসে দাঁড়ালো। এক রাত্রি-বাসের জন্য ওদের সব মালপত্রই তখন জীপে তোলা হয়েছে। লোক-নাথের নিজের দুটো স্যুটকেসও প্রস্তুত। এবং ও নিজেও বেরোবার জন্য প্রস্তুত। ও তাঁবুর বাইরে এসে হেসে বললো, 'এবারের মতো বিদায়। আমি আজই এখনই সকালের বাসে শ্রীনগর ফিরে যাচ্ছি। আগামীকালই কলকাতা যাবো।'

অনল অবাক্। রত্না যেন বজ্রাহতা, ওর মুখ রক্তশূন্য। কোনো কথাই বলতে পারলো না। লোকনাথ কুলিকে বললো, 'শ্রীনগর যানেকা বাসমে মেরা মাল উঠাও।'

কুলি স্যুটকেস দুটো নিয়ে নিচের রাস্তার দিকে নেমে গেল। অনল বললো, 'সত্যি চলে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।' লোকনাথ চকিতে একবার রত্নার অপলক বিস্ময়াহত চোখ ও রক্তশূন্য করুণ মুখের দিকে তাকালো। তার পরে দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে বললো, 'চলি।'

বলেই আর এক মুহূর্তও না দাঁড়িয়ে প্রায় ছুটে চলে গেল। মনে মনে বললো, 'হ্যাঁ, কখনো কখনো চলেই যেতে হয়, দাঁড়াবার সময় থাকে না। ও শেষ যাত্রী, বাসে এসে উঠতেই বাস ছাড়লো। ওর চোখের সামনে রত্নার সেই মুখ ভাসছে। আর ওর বুকের মধ্যে একটা তীক্ষ্ণ ব্যথা যেন ছুরির মতো বিঁধে যাচ্ছে। না, লোকনাথ পুরুষ, ওর চোখের কূল ভাসতে পারে না। কিন্তু বুকের ভিতরে কোথায় যেন একটা কলকল ধারা হু-হু করে বহে চলেছে। ও শুধু মনে মনে বললো, 'ক্ষমা করো, ক্ষমা করো।'

পাপবোধ

রিকসা ভ্যানটা এসে দেউড়ির সামনে দাঁড়ালো।

জ্যৈষ্ঠের রৌদ্রদগ্ধ ঘোর দুপুর। এ রকম দুপুরের গভীরে কেমন একটা অশরীরী অলৌকিকতা খা খা করে। বাতাস নেই। গাছপালা অনড়। রোদের এ তেজ যেন ভয়ংকর রাগী। গাছের ঘন ঝোপের পাতাগুলোও নিস্তেজ। সবলে আঁকড়ে থাকা নানা লতার ঝাড় কেমন মার্জিত। চারদিকে যতো আগাছা আর জংলাগাছগুলো ঝিমোচ্ছে। বাতাস নেই। অথচ গাছপালা লতাপাতার রোদ শোষা একটা বনজ গন্ধ ঘ্রাণে লাগে।

সাবেক কালের দেউড়ি। ভালো কথায় বহির্দরজা। দরজার পাল্লা বলে কিছু নেই। পলেস্তারা খসা দুটো জীর্ণ থাম দাঁড়িয়ে আছে। দেউড়ির কাছ থেকেই দেখা যায়। বিশাল এলাকা ঘিরে যেন কোনো এক দৈত্যপুরীর ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে আছে। কিন্তু সত্যি একেবারে ধ্বংসাবশেষ না। গোটা এলাকা ঘিরে অতীতে কতগুলো মহল ছিল, এখন বোঝার উপায় নেই। তবে এখনও দু একটা পুরনো বাড়ি কোনো রকমে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। পলেস্তারা খসা। শ্যাওলা ধরা দেওয়ালে ফাটল ধরেছে। অথচ দেউড়ির ধার ঘেঁষেই পশ্চিমে দোতলা পুরনো ভাঙা বাড়িটা যেন নতুন চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পনেরো বছর আগে বাড়িটা আস্ত ছিল বটে, কিন্তু পুরনো পোড়ো ভুতুড়ে বাড়ির মতো ছিল। এখন কেমন ঝকঝক করছে।

কোনো বাড়ি ঘরের একটা দরজা জানালাও খোলা নেই। একটিও জনপ্রাণীর দেখা নেই। মানুষের সাড়া শব্দ নেই। কেবল পায়রার বকবকম ভেসে আসছে। তার সঙ্গে গুচ্ছ গুচ্ছ চড়ুইয়ের চিৎকারের অদ্ভুত ধাতব ঝংকার।

শিবতোষ ভ্যানের ওপরে বসেই মাথার ওপরে খোলা ছাতাটা বন্ধ করলো।

পিছন ফিরে একবার আরতির দিকে তাকিয়ে হাসলো। আরতির চোখে তখন রাজ্যের অবাক জিজ্ঞাসা। শিবতোষ দেউড়ির ভাঙা থাম দুটো দেখিয়ে বললো, এই হলো সেই রাধাকান্ত জীউর তোরণ। তারপর যোয়ান ঘর্মাক্ত ভ্যান চালককে নির্দেশ দিল 'এখানে দাঁড়িও না। একেবারে রাধা-কান্ত মন্দির আর পুজো দালানের সামনে চালিয়ে নিয়ে চল।'

ভ্যানচালক ওর আসন থেকে নামেনি। মাথার গামছাও খোলেনি। খালি গা দরদর ঘামছে। ভ্যান চালিয়ে নিয়ে ভিতরে ঢুকলো। বিরাট চত্বর। দুর্বা ঘাসের চিহ্ন নেই। বড় বড় মুথো ঘাসে ছাওয়া চত্বর। আর লম্বা লম্বা চোর কাঁটা পায়ে চলা পথের রেখা পুজো দালান আর রাধাকান্ত জীউর মন্দিরের সিঁড়ির নিচে ঠেকেছে। পুজো দালান যেমন লম্বা, তেমনি প্রশস্ত। খাঁজকাটা গোল বিরাট থামের সারি। লাল টকটকে মেঝে। দেখলেই বোঝা যায়, পুজো দালান আর মন্দির রক্ষা করার আপ্রাণ চেষ্টার বিস্তর জোড়াতালি. সবখানে থামগুলোর গায়ে অনেক জায়গায় সিমেন্টের মেরামতির দাগ। সিমেন্টের দাগ লাল মেঝেতেও। পুজো দালানের ভিতরের ঘরের খোলা দরজায় অনেক তক্তার তাপ্পি। দালানের পুব দেওয়াল ঘেঁষে উঠেছে রাধাকান্ত জীউর মন্দির। সংস্কারের অনেক দাগ মন্দিরের গায়ে। কেবল উঁচু মাথাটাই রাধাকান্ত ধরে রাখতে পারেন-নি। অশত্থের শিকড়ে জড়িয়েও ভেঙে পড়েছে। মন্দিরের দরজা বন্ধ। নেংটি পরা খালি গা একটা আধবুড়ো দালানে হাত পা ছড়িয়ে ঘুমোচ্ছে।

ভ্যান গিয়ে দাঁড়ালো একেবারে দালানের সিঁড়ির কাছে। শিবতোষ আশেপাশে তাকিয়ে দেখলো। উত্তরের বাড়িটা আস্তই আছে। তবে জীর্ণ। পুবেও বিশাল ভাঙা স্তূপের ওপারে একটা পুরনো বাড়ি মাথা তুলে আছে। তার পাশে একটি মাটির দোতলা ঘর। মাথায় খড়ের চাল। কিন্তু কারোর কোনো সাড়া শব্দ নেই। সব বাড়ির দরজা জানালা বন্ধ। পায়রা আর চড়ুইয়ের ভিড় এই দালানের থামের খিলানে।

শিবতোষের পুরনো স্যাণ্ডেল জোড়া ভ্যানের এক পাশে, চটের ওপর রাখা ছিল। কিন্তু সে খালি পায়ে ভ্যান থেকে নামলো। আরতির দিকে ফিরে

বললো, 'এস। পা দুটো ঝুলিয়ে দাও। তারপরে আমার হাত ধরে নামো। বলেছি না, রাধাকান্ত জীউ আমাদের গৃহদেবতা! দরজা বন্ধ বটে। তবু আগে ওখানে মাথা ঠেকিয়ে নিই!'

আরতি পিছন ফিরে দেখলো। এখানে ওখানে টোল খাওয়া রঙ-চটা ট্রাংকের পাশে তার প্লাস্টিকের এক জোড়া স্যাণ্ডেল রয়েছে। সে স্যাণ্ডেলের দিকে হাত বাড়াতে উদ্যত হলো। শিবতোষ ব্যস্ত সম্স্ত হয়ে বলে উঠলো, 'আহা, কর কী, কর কী? এখন স্যাণ্ডেল পরতে যেও না। ঠাকুর দালানে কি কেউ স্যাণ্ডেল পরে ওঠে?'

'তাও তো বটে।' আরতি হাসলো। শুকনো ঠোঁটে পান চিবোনোর হালকা লাল ছোপ। সেই শিবতোষ দীর্ঘ পথ মাথায় ছাতা ধরেছিল। তবু ঘোর দুপুরের জৈষ্ঠ্যের গরম হলকায় আরতির ফরসা মুখ শিমূলের মতো লাল। শুকনো বাতাসে এতক্ষণ ঘামেনি। এখন ঘামতে শুরু করেছে। কপালের সিঁদুরের ফোঁটা আগেই ঘামে গলেছে। রক্তের দরানির মতো নাকের ওপর সিঁদুরের রেখা নেমে এসেছে। মিলের সামান্য লাল পাড় শাড়ির ঘোমটা মাথায়। শাঁখা আর লাল ঝুটা পলার বালা পরা হাত শিবতোষের দিকে বাড়িয়ে দিল।

শিবতোষের গায়ে কোরা রঙের পাতলা পাঞ্জাবি। সে হাত বাড়িয়েই ছিল। আরতির হাতটা কষে ধরলো। আরতি আগে বাসি-আলতা পা দুটো ভ্যানের নিচে ঝুলিয়ে দিল। তারপর অনায়াসেই হালকা লাফে ঘাসের ওপর নামলো। শিবতোষ আরতির হাত ছেড়ে দিয়ে ডাকলো 'এস।'

'আমাকে ছেড়ে দেন বাবু।' ভ্যান চালক মাথার গামছা খুলে গা মুছতে মুছতে বললো।

শিবতোষ আরতিকে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ঠাকুর দালানে উঠছিল। মোলায়েম স্বরে বললো, 'ভিটের দেবতাকে গড় করে নিই। তারপরেই তোমাকে ছেড়ে দেব। ততক্ষণে তুমি ভাই ট্রাংক আর বিছানাটা নামিয়ে দাও।'

ভ্যান চালক তাই করলো। টোল খাওয়া রঙ চটা ট্রাংকের ওপরেই ছিল,

শতরঞ্জিতে দড়ি বেঁধে জড়ানো বিছানা। তুটোই নামিয়ে দিল দালানের ওপর। পড়ে থাকলো তুটো ছোট পুঁটলি। তু জোড়া পুরনো স্যাণ্ডেল। শিবতোষ আর আরতি রাধাকান্তজীউর বন্ধ দরজার সামনে গেল। উপুড় হয়ে বসে, তু হাত জোড় করে, মেঝেতে মাথা ঠেকালো। আরতি আগে মাথা তুললো। শিবতোষের একটু দেরি হলো। সে মাথা তুলে ভক্তি ভরে বললো, 'রাধাকান্ত বড় জাগ্রত দেবতা। অষ্টধাতুর মূর্তি। রুপোর রাধা। সন্ধেবেলা পুজোর সময় দর্শন পাবে।'

আরতি তখন ছায়া পেয়ে আরাম বোধ করছে। বিরাট ঠাকুরদালানের এদিকে ওদিকে দেখছে। শিবতোষ পাঞ্জাবি তুলে কোমরের কষিতে হাত দিল। এগিয়ে গেল সিঁড়ির দিকে। কোমরের কষি থেকে যেটা বের করলো সেটা রুমাল না ময়লা ন্যাকড়া, বোঝার উপায় নেই। ভ্যান চালকের সামনে গিয়ে, ময়লা রুমালের বন্ধনী খুললো। কিছু টাকা পয়সা দোমড়ানো। তার থেকে একটি দশ টাকার নোট বের করে ভ্যান চালকের দিকে এগিয়ে দিল। দিয়ে অমায়িক হাসলো। চালক নোটটা নিয়ে কোমরের কষিতে গুঁজতে গুঁজতে বললো, 'পুঁটলি তুটো আর স্যাণ্ডেল নামিয়ে নেন।'

'একেবারে এক কথা?' শিবতোষের গোঁফ জোড়া ছড়িয়ে পড়লো। ভুরু-জোড়া কপালে উঠলো। কিন্তু মুখের হাসিটা একরকম আছে, 'একটা টাকাও ফেরত নেবে না?'

ভ্যান চালক যোয়ান স্পষ্ট বললো, 'আগেই বলেছি বাবু, দশ টাকার কমে পারব না দেখলেন তো কতটা রাস্তা? ইস্টিশন থেকে পাক্কা দশ মাইল। আর এই পোড়া রোদ। একটাও ভ্যান আসতে চায় নাই। আমি বলেই এইচি।'

'সেটা ঠিক কথা।' শিবতোষ হেসে ঘাড় ঝাঁকালো, 'চার পাঁচটা ভ্যান ছিল। এই ঠা ঠা রোদে কেউ আনতে চায়নি। সবাইয়ের এক রা, বেলা পড়লে আসবে। বেলা পড়ে গেলে, আমার পৌছতে অন্ধকার হয়ে যেত। বিপদে পড়ে যেতাম। না, তোমাকে টাকা ফেরত দিতে হবে না।' সে

ভ্যান থেকে পুঁটলি দুটো নামিয়ে সিঁড়িতে রাখলো। দু হাতে দুই স্যাণ্ডেল জোড়া তুলে নিল।
'আ হা হা, কর কী, ?' আরতি ঝটিতি উঠে দাঁড়ালো, 'আমার স্যাণ্ডেলে তুমি হাত দিচ্ছো কেন ?'
শিবতোষ ততোক্ষণে দু-জোড়া স্যাণ্ডেল সিঁড়ির নিচে রেখে দিয়েছে। আরতির দিকে তাকিয়ে হেসে বললো, 'বস বস। ব্যস্ত হচ্ছ কেন ? পরে না হয় আমাকে পেন্নাম ঠুকে নিও। এখন ঠাণ্ডা হয়ে বস'।
আরতির আর এগিয়ে আসা হলো না। বিব্রত মুখে অস্বস্তি নিয়ে আবার বসে পড়লো। মাথার ঘোমটা খসে গিয়েছে। কিন্তু তুলে দিল না। কে-ই বা দেখছে। শিবতোষের সামনে ঘোমটা টানার দরকার নেই। এই অসহ্য গরমে তবু একটু আরাম লাগছে। মেঝেটা বেশ ঠাণ্ডা।
নেংটি পরা খালি গা আধ বুড়ো লোকটা তেমনি ঘুমোচ্ছে। মুখটা হাঁ করা। গোটা কয়েক মাছি কালো মোটা ঠোঁটের ওপর ভ্যান ভ্যান করছে। শিবতোষ সিঁড়ির ওপর ছায়ায় দাঁড়িয়ে চারদিকে দেখছে। মস্ত বড় উঠোনের চোর কাঁটা আর মুথো ঘাস দেখলেই বোঝা যায়, লোকজনের চলাফেরা তেমন নেই। তোরণের কাছ থেকে একটা পায়ে চলা পথের রেখা দালানের সিঁড়ি অবধি এসে ঠেকেছে। আর একটা চলে গিয়েছে পুব দিকে, ভেঙে পড়া দেওয়াল আর ইঁটের স্তূপের দিকে। ওদিকেই একটা পুরনো দোতলা বাড়ি এখনও কোনো রকমে দাঁড়িয়ে আছে। উত্তরের বাড়িটাও আস্ত আছে। আর আছে সেই মস্ত কৃষ্ণচূড়া গাছটা। যার ডালপালায় এখনও টুকরো টুকরো আগুনের ফুলকির মতো কয়েক গুচ্ছ ফুল ফুটে আছে। কিন্তু পশ্চিমের এই বাড়িটা এখন কার দখলে ? এ বাড়িরই দুটো ফাটা চটা ভাঙা ঘরে শিবতোষ দাদাদের সঙ্গে থাকতো। বাবা মা আগেই মারা গিয়েছিল। পনরো বছর আগের কথা। দুই দাদাই বিয়ে করেছিল। দুই বউদি ছিল। তাদের ছেলেমেয়েরা ছিল। দিদি ছিল একটা। তখনও বিয়ে হয়নি। জমিও ছিল কিছু। ভাগে চাষ হতো। তিন চার মাসের খোরাক জুটতো। গাঁয়ের একমাত্র পাঠশালায় বড়দা মাস্টারি

করতো। জোতদার পীতাম্বর ঘোষের হিসাবপত্র দেখতো ছোড়দা। উত্তরের ঐ বাড়িটার জ্ঞাতিদের অবস্থা ভালো ছিল। দিদি ঐ বাড়িতে রান্না করতো। পশ্চিমের এই বাড়ির একতলায় আর এক অংশে শিবতোষের জ্যাঠা ভবতোষ মুখুজ্জে থাকতেন। তাঁর অবস্থা শিবতোষদের থেকে ভালো ছিল। জ্যাঠার মেয়েরাই বড় ছিল। তাদের বিয়ে দিয়েছিল জ্যাঠার শ্বশুর বাড়ি থেকে। জ্যাঠার শ্বশুরবাড়ি ছিল চুঁচুড়ায়। বেশ বড় লোক। তাঁর দুই ছেলে সেখানে থেকে পড়াশোনা করতো। তারপরে গত পনরো বছরে কী ঘটেছে কে জানে। পুরনো ধ্বসে পড়া বাড়িটাকে এমন নতুন করে তৈরি করছে কারা? দেখে মনে হয় যেন একেবারে হালফিলের নতুন বাড়ি।

শিবতোষ দেখছে, আর নানা রকম ভাবছে। গায়ের রঙটা পুড়ে গেলেও বোঝা যায়, সে বেশ ফর্সাই ছিল। রোগা মাঝারি লম্বা শিবতোষের বয়স এখন তিরিশ। এক জোড়া গোঁফ থাকলেও চোখ মুখ কেমন কিশোর কোমল। বড় বড় চোখ, চোখা নাক, একটু লম্বাটে মুখের গড়ন। মাথার চুল পাতলা। কোঁচা দিয়ে পরা ধুতিটি হাতে কাচা মনে হয়।

আরতি একুশ বাইশ বছরের বেশ সুন্দরী বউ। অনতিদীর্ঘ শরীরের গঠন সুন্দর। মেদহীন স্বাস্থ্য অটুট। যেমন ফর্সা, তেমনি প্রতিমার মতো মুখ। বড় টানা চোখ। টিকলো নাক। ঘোমটার বাইরে, খোঁপার আয়তন দেখলে বোঝা যায়, মাথার চুল বেশ বড়। সারা গায়ে অলঙ্কার বলতে কিছু নেই। দু হাতে শাঁখা আর ঝুটা লাল পলার বালা। বাঁ হাতে একটি বাড়তি লোহা। তার লাল পাড় মিলের শাড়িটি আপাতদৃষ্টিতে ধোপদুরস্ত মনে হলেও এখন দীর্ঘ পথের ধুলোয় মলিন। গায়ে লাল রঙের ব্লাউজ। অর্ধেক ডানা ঢাকা ব্লাউজের হাতা।

আরতির দুই চোখে অবাক কৌতূহল। রাধাকান্তর বন্ধ দরজার কাছাকাছি বসে চারদিকে দেখছে। দালানের পুবে, শেষ প্রান্তে একটি বন্ধ দরজা। পাকা পোক্ত, সবুজ রঙ করা দরজা। চুনকাম করা দেওয়াল বেশ পরিষ্কার। আরও একটা খিল আঁটা দরজা রয়েছে, রাধাকান্তর মন্দিরের লাগোয়া

পশ্চিমে। এ দরজা পুরনো, দক্ষিণ মুখো। কোনো রঙের বালাই নেই, শুধু ফাটা চটা জীর্ণ কাঠ দু তিনটে বড় ছিদ্রও আছে। ছিদ্রে উঁকি দিলেই দেখা যাবে দরজার ওপাশে কী আছে। পশ্চিমের শেষ প্রান্তেও একটা বন্ধ দরজা রয়েছে। সেটিও সবুজ রঙ করা, পাকা পোক্ত।

শিবতোষ সিঁড়ি থেকে পুঁটলি দুটো তুলে নিল। আরতির কাছে গিয়ে বসলো। পায়রাগুলো থামের খিলানে তেমনি বকবকম করছে। মাঝে মধ্যে পাখার ঝাপটায় শব্দ তুলে নেমে আসছে দালানের মেঝেয়। খিলানের মাথা বরাবর তিন ইঞ্চি চওড়া রেখা গোটা দালানের চার দিকে। চড়ুই-গুলো আস্তানা নিয়েছে সেখানে। ওদের কিচির মিচির ঝংকারে কেমন বাঈজীর পায়ের ঘুংগুরের ঝমঝমানি।

'এ কোথায় নিয়ে এলে গো?' আরতি প্রায় চুপি চুপি স্বরে জিজ্ঞেস করলো। স্বরে যেন উদ্বেগ আর বিস্ময়।

শিবতোষ হেসে বললো, 'কোথায় আবার নিয়ে আসব। এই তো আমাদের বাড়ি।'

'বাড়ি বটে, কিন্তু এটা তো ঠাকুরদালান।' আরতি ভুরু কুঁচকে অবাক চোখে তাকালো, 'তোমাদের থাকবার ঘর-দোর কোথায়?'

শিবতোষের হাসি মুখে উদ্বেগের ছায়া নেই বটে। কেমন একটা অপ্রস্তুত বিব্রত ভাব। বললো 'পাওয়া যাবে, সব পাওয়া যাবে। এই যে দেখছ, পশ্চিমে নতুন বাড়িটা— এটা তো ঝরঝরে পুরনো ছিল। এটারই এক-তলায় আমরা থাকতাম। এটাই আমাদের বাড়ি। কিন্তু পনরো বছরে কী যে ঘটেছে, কিছুই বুঝতে পারছি না। কারুর কোনো সাড়া শব্দও পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে সবাই ঘুমোচ্ছে। উঠুক দেখা যাক।'

'তোমার দাদাদের কথা বলেছিলে। তারাও কি সবাই এ বাড়িতেই ছিল?' আরতি দোতলা বাড়িটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো। তার চোখের দৃষ্টিতে গলার স্বরে কেমন যেন সন্দেহের সুর।

শিবতোষ ঘাড় ঝাঁকিয়ে অকপটে বললো, 'আর কোথায় থাকবে? আমিও তো ছিলাম। কিন্তু দাদারা কী করে সেই পুরনো ঝরঝরে বাড়িটাকে

এমন নতুন করে তুলেছে, আমার কিছুই মাথায় আসছে না। তোরণের দক্ষিণে বাগানটা দেখলে না? ওটাও আমাদের। কিন্তু পনরো বছর আগে বাগানটা অন্যরকম ছিল। কিছু আম গাছ ছাড়া বাকি পোড়ো জমি। এখন তো দেখলাম আরো গাছ লাগানো হয়েছে। এক দিকে কলা পেঁপে, আর একদিকে কলমের আম গাছ—বেশ পোষ্কার পরিচ্ছন্ন।'

আরতির দু চোখে কৌতুকের ছটা। শিবতোষের দিকে তাকিয়ে হাসলো 'একবার বলছ, সব পাওয়া যাবে। আবার বলছ মাথায় কিছুই আসছে না।'

'কী করে আসবে বল?' শিবতোষ প্রায় অসহায়ভাবে হেসে বললো, 'আমার জ্যাঠা দাদারা টাকা খরচ করে এমন বাড়ি তুলতে পারে, ভাবতেই পারি না।'

আরতি হাঁটু মুড়ে বসেছিল। শিবতোষের দিকে ঝুঁকে বললো, 'কোনো টাকা পয়সাওয়ালা লোককে বেচে টেচে দেয় নি তো?'

'অাঁ!' শিবতোষ চমকে উঠে মস্ত বড় একটা হাঁ করলো। উদ্বেগ আর সংশয় তার চোখে মুখে। পরমুহূর্তেই নিশ্চিন্ত হেসে মাথা নাড়লো, 'না না, তাই কখনো হয়? বাস্তু বিক্রি করে যাবে কোথায়?'

শিবতোষ যতোটা নিশ্চিন্ত হেসে মাথা নাড়লো, চোখের সংশয় ততোটা কাটলো না। আরতির সন্দিগ্ধ দৃষ্টি তার মুখের ওপর। সে পশ্চিমের বাড়ি থেকে মুখ ফিরিয়ে দালানের চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে দেখলো। এবার তার নজরে পড়লো। মেঝের ওপর চিৎপাত শুয়ে থাকা লোকটার ওপর। মুখটা ভালো করে দেখে হেসে মাথা ঝাঁকালো। নাকের পাটা মোটা হলো। নিঃশ্বাস টেনে বললো, 'হুঁ এতক্ষণে চিনতে পেরেছি। লোটন বাগ্‌দি। তাড়ি গিলে পড়ে আছে। পনেরো বছরেও চেহারা তেমন বদলায়নি। মাথার চুল অনেক পেকেছে। দু চারটে দাঁতও গেছে। জ্যাঠার তরফের মুনিষ।'

আরতি খালি গা লেংটি পরা লোকটাকে ফিরে দেখলো। শিবতোষ হেসে বললো, 'তালেই বুঝতে পারছ, জ্যাঠারাই এখনো আছে। তা নইলে

লোটন ঠাকুরদালানে পড়ে থাকবে কেন ?'

'চিনতে পারলে ?' আরতি ঘাড় বাঁকিয়ে শিবতোষের দিকে তাকালো। তার ফরসা প্রায় লালচে মুখে এখনও সংশয় ও সন্দেহ, 'তোমার জ্যাঠার তরফের না হয়ে নতুন মালিকের তরফেরও হতে পারে। কাজের লোক। যার কাছে কাজ পাবে, তার কাছেই থাকবে।'

শিবতোষ তবু নিশ্চিন্ত হেসে মাথা নাড়লো, 'না গো না। ওর বাবা ঠাকুর্দারা এই মুখুজ্জে বাড়িতে চিরকাল কাজ করে আসছে। নতুন মনিবের কাজ ওরা করবে না।'

শিবতোষের কথা শেষ হবার আগেই ঠাকুরদালানের পুবের দরজাটা শব্দ করে খুলে গেল। দেখা গেল থানপরা এক বিধবা প্রৌঢ়া মহিলা দরজায় দাঁড়িয়ে। মাথায় থানের ঘোমটা। দু চোখে রাজ্যের বিস্ময়। শিবতোষ আর আরতিকে দেখছেন। শিবতোষ আরতিও ফিরে তাকালো। আরতি মাথার ঘোমটা টেনে দিল। কয়েক মুহূর্ত উভয় পক্ষই চুপচাপ। তারপরেই শিবতোষ হঠাৎ লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো। দরজার দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেল। মুখে তার হাসি নেই। বরং বিস্ময় আর ব্যথা, 'এ কি গো সুন্দর খুড়ি ? সুন্দর খুড়ো গত হলো কবে ?'

বিধবা মহিলা কোনো জবাব দিলেন না। তাঁর দু চোখ তখনও রাজ্যের বিস্ময় ও কৌতূহল। বেশ বোঝা যাচ্ছে, তিনি শিবতোষকে চিনতে পারছেন না। শিবতোষ এবার একটু হেসে আরও কয়েক পা এগিয়ে গেল, 'আমাকে চিনতে পারছো না ? আমি বড় তরফের শিবু, শিবতোষ—।'

শিবতোষের কথা শেষ হবার আগেই ঝপাং শব্দে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। শিবতোষের মুখে ছায়া ঘনিয়ে এলো। করুণ চোখে আরতির দিকে তাকালো, 'আমাকে চিনতে পারে নি। কী করেই বা পারবে? পনরো বছর কেটে গেছে। সেই ছেলেমানুষটি তো নেই। সুন্দর খুড়ো তা হলে মারা গেছে ?'

'তুমি ঠিক চিনতে পেরেছ ?' আরতির স্বরে সংশয়, 'উনিই তোমার সুন্দর খুড়ি ?'

শিবতোষ আগের থেকেও নিশ্চিন্ত, 'সুন্দর খুড়িকে চিনতে পারবো না ? বয়স বেড়েছে ঠিকই। তায় আবার থান গায়ে বিধবা। একটু ধন্দ লেগেছিল। কিন্তু চিনতে ঠিক পেরেছি।'

'তবে তোমাকে দেখে দরজা বন্ধ করে দিল কেন ?' আরতির ভ্রূকুটি অবাক জিজ্ঞাসা।

শিবতোষের তেমনি নিশ্চিন্ত হাসি, 'আমাকে চিনতে পারে নি, পনরো বছরের ছেলে এখন আমি তিরিশ বছরের পুরুষ। কী করে চিনবে ?'

এই সময় লোটন পাশ ফিরলো। নিজের মুখের ওপর চট চট দুটো থাপড় মেরে, মাছির উদ্দেশে একটা খারাপ গালাগাল দিল। চোখ মেলে একবার মাথাটা তুলে উঠোনের দিকে দেখলো। লাল চোখ। আবার মাথা পেতে চোখ বুজতে গিয়ে, শিবতোষের দিকে চোখ পড়লো। শিবতোষ তখন পুব দরজার কাছ থেকে ফিরে আসছে। সেও লোটনের দিকে তাকালো। হাসলো, 'কী লোটনদা, চিনতে পারছ ?'

লোটন উঠে বসলো। তার লাল চোখে জিজ্ঞাসু কৌতূহল। উঠে বসে আরতিকে দেখলো। পুরনো ট্রাংক, দড়ি বাঁধা বিছানা, পুঁটলি দুটো দেখলো। তারপরে আবার শিবতোষের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে মাথা নাড়লো। মোটা স্বরে শ্লেষার আভাস, 'আজ্ঞে না, চিনতে পারলুম না তো ? কোত্থেকে আসছেন আপনারা ?'

'আসছি অনেক দূর থেকে।' শিবতোষ চোখ ফিরিয়ে একবার আরতিকে দেখলো। হেসে লোটনকে বললো, 'চিনবে আর কী করে ? পনেরো বছর পরে দেখছ। আমি বড় তরফের শিবু।' লোটন উঠে দাঁড়ালো। শিবতোষ আরতি ট্রাংক বিছানা পুঁটুলি সব দিকে একবার উদাস চোখে দেখে দালান থেকে উঠোনে নেমে গেল। একটিও কথা বললো না। তোরণ পেরিয়ে বেরিয়ে গেল।

'তোমাকে চিনতে পারল না।' আরতি সন্দিগ্ধ চোখে তাকালো, 'একটাও কথা না বলে চলে গেল।'

শিবতোষ নিশ্চিন্ত হেসে বললো, 'তাড়ির নেশায় বুঁদ হয়ে আছে। কী

করে চিনতে পারবে ? কিন্তু ভেবে দেখ, ওর নাম যদি লোটন না হতো, তা হলে বলেই দিত ও লোটন নয়।'

আরতির আয়ত চোখের সংশয় তথাপি কাটলো না। কোনো কথা না বলে উঠোনের দিকে তাকালো। চড়ুয়ের ঝাঁক একটু কমতে শুরু করেছে। পায়রাগুলো তেমনিই বকবকম করছে। নিজেদের মধ্যে পাখা ঝাপটা দিয়ে। মারামারিও করছে। পায়রারাও কম ঝগড়ুটে হয় না। শিবতোষ আরতিকে জিজ্ঞেস করলো, 'কুয়োতলায় যাবে ? হাতে মুখে একটু জল দেবে ?'

'কুয়োতলা কোথায় ?' আরতি জিজ্ঞেস করলো।

শিবতোষ রাধাকান্তর মন্দিরের, পশ্চিমের পুরনো দরজাটা দেখিয়ে বললো, 'এ দরজার বাইরেই কুয়োতলা। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। ওদিক দিয়েও আমাদের মহলে যাবার খিড়কি দরজা আছে। ওদিকে মস্ত বড় উঠোনও আছে। যখন ধান ওঠে, ওখানে ঝাড়াই হয়।'

'হাত মুখ ধোব না।' আরতি বললো, 'একেবারে চান করে নেব। তার আগে মাথা গোঁজবার একটা ঘর জুটুক।'

শিবতোষ আরতির কথায় সায় দিয়ে মাথা ঝাঁকালো। এ সময়ে পশ্চিমের দোতলা থেকে পুরুষের রাশভারী গম্ভীর স্বর ভেসে এলো, 'ঠাকুরদালানে কে ?'

শিবতোষ তাড়াতাড়ি সিঁড়ির কাছে গিয়ে ওপর দিকে তাকালো। খোলা জানালায় দাঁড়িয়ে আছেন এক খালি গা পুরুষ। বয়স যথেষ্ট হলেও বেশ শক্তপোক্ত চেহারা। মাথার পাতলা চুল সব সাদা। গোঁফ দাড়ি কামানো চওড়া মুখ। চশমা ছাড়া খালি চোখে নজর বেশ পরিষ্কার মনে হয়। চোখে ভ্রূকুটি, কিছুটা বিরক্ত জিজ্ঞাসু দৃষ্টি। গলায় পৈতা ঝুলছে। শিবতোষ কয়েক মুহূর্ত নজর করে দেখেই জ্যাঠামশায়কে চিনতে পারলো। চিনতে পেরেই এক গাল হেসে বললো, 'জ্যাঠা, আমি শিবু। চিনতে পারছেন তো ?'

ওপর থেকে কোনো জবাব এলো না। শিবতোষের মুখের দিকে একই রকম ভাবে কয়েক মুহূর্ত দেখলেন। তারপর জানালা বন্ধ হয়ে গেল।

শিবতোষের মুখের হাসিতে ছায়া ঘনিয়ে এলো।

'কে?' আরতি জিজ্ঞেস করলো।

শিবতোষ আরতির কাছে ফিরে এলো। তেমন নিশ্চিন্ত না হলেও মুখে আবার হাসি ফুটলো, 'জ্যাঠা। দেখেই ঠিক চিনতে পেরেছি। পনেরো বছরেও জ্যাঠার চেহারা তেমন বদলায় নি। আগে গোঁফ ছিল, এখন নেই। কিন্তু আমাকে বোধহয় চিনতে পারে নি। জানালা বন্ধ করে দিল।'

'জানালা বন্ধ করে দিল?' আরতির চোখে অবাক জিজ্ঞাসা ও সংশয়, কিছু জিজ্ঞেস টিজ্ঞেসও করল না? কোথা থেকে এলে, কোথায় ছিলে এতদিন।'

শিবতোষ হাসলো, 'বললাম না, আমাকে বোধহয় চিনতে পারে নি। চিনতে না পারলে কী জিজ্ঞেস করবে?'

'কেউই যদি তোমাকে চিনতে না পারে, আর দরজা জানলা ওরকম বন্ধ করে দেয়, তা হলে কী হবে?' আরতির চোখে কথার স্বরে উদ্বেগ ও সংশয়।

শিবতোষ আবার নিশ্চিন্ত হাসলো 'দরজা জানালা বন্ধ করে আর কতক্ষণ থাকবে? কিছু ভেব না। ব্যবস্থা একটা হবেই। পরের ভিটেয় তো ফিরে আসিনি। আমি সবাইকেই চিনতে পারছি। আমাকেও সবাই চিনবে। পনেরো বছর পরে আচমকা এসেছি, তাই সবাই—।'

শিবতোষ কথাটা শেষ করলো না। আরতি বললো, 'জ্যাঠাকে জিজ্ঞেস করলে না কেন, তোমার দাদাদের খবর দিতে। দাদারা তো বোধহয় নিচের তলাতেই আছে।'

'জিজ্ঞেস করবার সময় পেলাম কোথায়?'

শিবতোষ সান্ত্বনার হাসি হাসলো, 'তার আগেই জ্যাঠা জানালা বন্ধ করে দিল।'

শিবতোষের কথার মাঝেই ঠাকুরদালানের পুব পশ্চিমের দুই প্রান্তের দরজা খুলে গেল। পশ্চিমের দরজা দিয়ে জ্যাঠামশায় বেরিয়ে এলেন। তেমনি খালি গা। সামান্য একটা ধুতি পরা। পুবদিকের দরজা থেকে

বেরিয়ে এলো, প্রায় শিবতোষের বয়সী একজন পুরুষ। গেঞ্জি আর ধুতি পরা। শিবতোষ একে চিনতে পারলো না। দরজার পাল্লার আড়ালে সুন্দর খুড়িকেও দেখা যাচ্ছে। তারপর দেখা গেল, উত্তরের বাড়ি থেকে দুজন বেরিয়ে এলো। একজন বয়স্ক, খালি গা। গলায় পৈতা। আর একজনের বয়স একটু কম। ধুতির এক প্রান্ত দিয়ে গা জড়ানো। পুবের ভাঙা ঘর দরজার স্তূপের ওপর দিয়ে আর একজন বয়স্ক লাঠি হাতে এগিয়ে এলো, গায়ে জামা নেই। গলায় নেই পৈতা। সকলেই ঠাকুর-দালানে এসে উঠলো। সকলের চোখে মুখেই সন্দিগ্ধ জিজ্ঞাসা। শিবতোষ এখন সবাইকে চিনতে পারছে না। কিন্তু মুখে তার হাসি! আরতি মাথায় ঘোমটা টেনে দিল।

দেখতে দেখতে দুই বিধবা বুড়ি এলো। কিছু ছোট ছেলে মেয়েও ঠাকুর দালানে এসে জড়ো হলো। ওদের চোখে মুখে অবাক কৌতূহল। শিবতোষ কেবল তার দাদাদেরই দেখতে পাচ্ছে না। সকলের দৃষ্টি আরতির দিকে। কেউ কেউ ট্রাংক বিছানা পুঁটলি দুটো দেখছে। বেশ বোঝা গেল, ঘরে খবর পৌঁছেছে। সবাই শিবতোষকে দেখতে আসছে।

শিবতোষ আগেই জ্যাঠামশায়কে নিচু হয়ে প্রণাম করলো, 'আমাকে চিনতে পারছেন না জ্যাঠা? আমি শিবু—বড় তরফের। পনেরো বছর আগে চলে গেছলাম।'

জ্যাঠামশায় সকলের দিকে তাকালেন। যেন মুখ খোলবার আগে অনেক কিছু ভেবে নিতে হচ্ছে। শিবতোষ ব্যস্ত হয়ে আরতিকে বললো, 'জ্যাঠাকে পেন্নাম কর।'

আরতি উঠে ভবতোষ মুখুজ্জেকে প্রণাম করতে গেলে তিনি দু পা পেছিয়ে গেলেন, 'থাক থাক, ওসব পরে হবে।'

আরতি তবু মেঝেতে মাথা ছুঁইয়ে প্রণাম করলো। উঠে বসতে গিয়ে ঘোমটা খসে গেল। তাড়াতাড়ি টেনে দিল। ভবতোষ আবার সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। তাদের মুখের দিকে তাকিয়েই বললেন, 'আমাদের শিবু পনরো বছর বয়সে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছল, সে-কথা

সবারই মনে আছে। খোঁজ-খবরও করা হয়েছিল। তারপর আবার পনরো বছর বাদে—।'কথাটা শেষ না করে তিনি শিবতোষের দিকে দেখলেন। আবার সকলের দিকে চোখ ফিরিয়ে বললেন, 'কী করে চিনব। তোমরা কেউ চিনতে পারছ ?'

শিবতোষ সকলের দিকে তাকালো। সকলেই মাথা নাড়লো। চিনতে পারছে না। এক বৃদ্ধা বিধবা বললো 'বড় তরফের কার কথা বলছে ? এ কি সেই আশুর ছেলে শিবু ? যে হারিয়ে গেছল ?'

শিবতোষ বৃদ্ধার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ্য করছিল, হঠাৎ তার চোখে আলোর ঝলক ফুটলো, 'অ্যাই, এবার চিনতে পেরেছি, তুমি তো জগো-পিসি ! নেতুদা কোথায় ? এখনো কলকাতায় চাকরি করে ?'

শিবতোষ জিজ্ঞেস করতে করতেই হঠাৎ বৃদ্ধাকে প্রণাম করলো। বৃদ্ধা শিবতোষের মুখের দিকে তাকিয়ে অস্ফুটে উচ্চারণ করলো, 'নেতু ? আমার নেতু—।' স্বর রুদ্ধ হয়ে গেল চোখের কোণে জল চিকচিক করে উঠলো।

ভবতোষ একটু বিরক্ত হয়ে ধমকের সুরে বললেন, 'তুমি চুপ কর জগো। ব্যাপারটা আগে সব বুঝতে দাও। এ আমাদের আশুরই ছোট ছেলে কি না, সেটা আগে সাব্যস্ত হোক।'

শিবতোষ বুঝলো, জগো পিসির ছেলে নেতুদা মারা গিয়েছে। নেতুদার ভালো নাম ছিল নরনারায়ণ চাটুজ্জে। শিবতোষদের থেকে বছর চার পাঁচকের বড়। জগোপিসি অল্প বয়সে বিধবা হয়ে, নেতুদাকে নিয়ে বাপের বাড়ি এসেছিল। নেতুদা লেখাপড়ায় ভালো ছিল।

সন্ধিপুরের হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেছিল। চাকরি পেয়েছিল কলকাতায়। কলকাতার মেসে থাকতো। শনিবার বিকেলে ফিরতো। আবার সোমবার ভোরবেলা মাঠের পথ দিয়ে হেঁটে, ইস্টিশনে গিয়ে ট্রেনে চেপে কলকাতায় যেতো। জগোপিসির একমাত্র ছেলে। অনেক বয়সে চাকরি পেয়েছিল। জগোপিসি আর তখন বাপ ভাইয়ের গলগ্রহ ছিল না। নেতুদাকে সবাই ভালবাসতো, খাতির করতো। মুখুজ্যেদের সব শরিক মিলিয়ে তখন জনা তিনেক কলকাতায় চাকরি করতো। কিন্তু

গ্রামের বাড়ি ছেড়ে যায় নি। যেমন অনেকেই গ্রামের ভিটেমাটি ছেড়ে, চিরদিনের জন্য চলে গিয়েছিল।

কিন্তু আপাততঃ জ্যাঠার কথাটাই শিবতোষের মনে গেঁথে আছে। সে জিজ্ঞেস করলো, 'দাদারা কোথায়? তাদের দেখতে পাচ্ছি নে?'

'দাদারা মানে?' ভবতোষ পাল্টা জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি কালীতোষ আর হরিতোষের কথা জিজ্ঞেস করছ?'

শিবতোষ মাথা ঝাঁকিয়ে হাসলো, 'হ্যাঁ, মেজদা আর ন'দার কথা জিজ্ঞেস করছি। মেজদির তো নিশ্চয় বে' থা হয়ে গেছে। আমি যখন চলে যাই মেজদি তখন সেন তরফের হৃষি কাকাদের বাড়িতে রান্না করতো। সব আমার মনে আছে।'

'সে তো অনেক কথা।' ভবতোষ বললেন, 'কালী আর হরি গ্রাম ছেড়ে পাঁচ বছর আগে চলে গেছে। আশুর অংশটা—মানে কালী আর হরি তাদের বাড়ির অংশ আমাকে বিক্রি করে দিয়েছে।'

শিবতোষ পশ্চিমের দোতলা বড় বাড়ির দিকে একবার দেখে বললো, 'এ বাড়ি তা হলে এখন আপনার একলার? একেবারে নতুন বাড়ির মতন দেখাচ্ছে। তা দাদারা কোথায় চলে গেলেন?'

'কাটোয়ায়। সেখানে নাকি কী ব্যবসাপত্তর করে।' ভবতোষ বললেন, 'বছরে একবার আসে, যখন ধান ওঠে। তা যদি ধরেই নিই তুমি আশুর ছেলে শিবু, চলে গেছলে, গেছলে। আবার ফিরে এলে কেন?'

শিবতোষ হাসলো, 'চিরকাল কি আর বাইরে থাকা যায়? তখন ছেলে-মানুষ ছিলাম, একটা ঝোঁকের মাথায় চলে গেছলাম। তারপরে ভাবলাম, নিজেদের যাই হোক, ভাঙাচোরা ভিটেমাটি তো আছে। অবিশ্যি এখন তো শুনছি, আমাদের কোনো মাথা গোঁজবার অংশই নেই।'

'কী ঋষি কী বল?' ভবতোষ একজনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।'

উত্তর দিকের বাড়ি থেকে খালি গা, বয়স্ক যে লোকটি এসেছিল, সে বললো, 'আমি আর কী বলবো? চলে গেলেও, লোকে তো চিঠিপত্তর দিয়ে খোঁজখবর করে। পনরো বছর পরে হঠাৎ এসে—।' কথা থামিয়ে

সে কয়েকবার মাথা নাড়লো। ঠোঁট উল্‌টে বললো, 'কিছু বুঝতে পারছিনে।'

'অ! আপনি সেই হৃষিকাকা?' শিবতোষ এগিয়ে গিয়ে লোকটি বাধা দেবার আগেই প্রণাম করলো, 'আপনি এত রোগা হয়ে গেছেন? পনরো বছর আগে বেশ মোটাসোটা ছিলেন, তাই চিনতে পারিনি। মনে আছে, আমার পৈতের সময় আপনি আমাকে চকচকে আলপাকার একটা জামা দিয়েছিলেন।'

ঋষিকাকা ভবতোষের দিকে ফিরে তাকালো। প্রতিবাদ করলো না।

'আচ্ছা, তুমি আমাকে চিনতে পারছ?' শিবতোষেরই বয়সী প্রায় একজন জিজ্ঞেস করলো।

শিবতোষের খেয়াল আছে, দালানের পুব দরজা খুলে যে বেরিয়ে এসেছিল এ সে। সুন্দর খুড়ি এখনও দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে এদিকে দেখছে। শিবতোষ বিব্রত অথচ সন্দিগ্ধ হেসে বললো, 'দেখে মনে হচ্ছে সুন্দরখুড়োর ছেলে ধীরু। খুড়িকে আমি ঠিক চিনতে পেরেছি। তুমি যদি ধীরু হও, তাহলে তুমি এত গাঁটটা-গোট্টা পালোয়ানের মতন ছিলে না। তুমি আমার থেকে বছর খানেকের বড়। ছেলেবেলায় ছিপছিপে রোগা ছিলে। আমি যেমন ছিলাম।'

'হুঁ, ঠিকই চিনেছ দেখছি।' ধীরু সকলের দিকে তাকিয়ে হাসলো। আবার তাকালো শিবতোষের দিকে, 'আচ্ছা, তোমার পিঠের বাঁ দিকে, কোমরের কাছাকাছি শিরদাঁড়া ঘেঁষে একটা জন্ম দাগ ছিল না?'

শিবতোষ তৎক্ষণাৎ জামা তুলে, কষির কাপড় একটু নামিয়ে ধীরুর দিকে পিছন ফিরে দেখালো। 'এখনো আছে। জন্ম দাগ আর কোথায় যাবে? জড়ুলের দাগ কোনোকালে ঘোচে না।'

ইতিমধ্যে ঠাকুরদালানের পুব পশ্চিমের প্রান্তের দরজায় বউ-ঝিরা জড়ো হয়ে উঁকি ঝুঁকি দিতে আরম্ভ করেছে। ধীরু বললো, 'হ্যাঁ, ঠিক সেই দাগ। আমিও তোকে গোড়াতেই চিনেছি। তুই সেই পনরো বছর বয়সের মতন রোগাই আছিস। তবে মাথায় একটু লম্বা হয়েছিস, গোঁফ রেখেছিস এক

জোড়া। কিন্তু মুখটা তো তোর যেন সেই রকম কাঁচা-কাঁচাই আছে। হঠাৎ চলে গেছলি কেন বল্ তো? কোথায়, গেছলি?'

'মাথায় ভূত চেপেছিল, তাই চলে গেছলাম।' শিবতোষ হাসলো, 'আসলে ভালো লাগত না। বাড়িতে থাকতে ভালো লাগত না। দাদা বউদিরাও যেন কেমন করত। যেন সব সময়েই দূর দূর করছে। কেউ কারোকে দেখত না। তা একদিন কী মনে হলো, যে-দিকে দু চোখ যায়, চলে গেলাম। কত জায়গায় ঘুরেছি। কত দেশ কত লোক দেখেছি। কত রকম কাজ করেছি। আবার এমনিতেও বামুনের ছেলে বলে অনেকে ঘরে থাকতে দিয়েছে। খাতির যত্ন করে রেখেছে।'

পুকুর পোড়ো পেরিয়ে লাঠি হাতে যে এসেছিল, সে বেশ ভারিক্কি চালে জিজ্ঞেস করলো, 'যেখানেই যাও জাত জম্মো খুইয়ে আসনি তো?'

'জাত জন্ম খোয়াব কেন?' শিবতোষের মুখে সেই হাসি। কাঁধের জামা সরিয়ে পৈতা দেখিয়ে বললো, 'যার তার ঘরে তো থাকিনি। বামুনের ঘরেই থেকেছি। অনেক সময় পুজো-আচ্চা নিয়ে থাকতাম। এক জায়গায় এক গুরু জুটেছিল। বাঙালী। তার কাছে রামায়ণ মহাভারত পাঠ করা শিখে-ছিলাম। গান-টানও—।'

কথা শেষ হবার আগেই ভবতোষ বললেন, 'ও সব কথা থাক। এখন আসা হচ্ছে কোত্থেকে?'

'আজ্ঞে মালদা।' শিবতোষ হেসে জবাব দিল, 'সেই গতকাল রাত্রে বেরিয়েছি। আমাদের এই হলুদকাটি গাঁয়ে পৌঁছুনো তো সহজ কথা না।'

ভবতোষ ওসব কথায় কান দিলেন না। ট্রাংক বিছানা পুঁটলি দেখিয়ে বললেন, 'দেখে তো মনে হচ্ছে না, বিস্তর রোজগারপাতি করে গাঁয়ে ফেরা হয়েছে। এখানে থাকবে কোথায়, খাবে কী?'

'এটিই বা কে?' আর এক বৃদ্ধা বিধবা আরতিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'দেখে মনে হচ্ছে, গায়ে গতরে বেশ রূপ আছে।'

সকলেরই যেন এতক্ষণে আরতির দিকে চোখ পড়লো। আসলে সবাই

প্রথম থেকেই আড়চোখে আরতিকে দেখছিল। আরতি মাথায় ঘোমটা টেনে মুখ নিচু করে বসেছিল। এবার ঘোমটা আর একটু টেনে দিল। শিবতোষ গালভরা হাসি নিয়ে বললো, 'কে আবার ? এটি আমার বউ।'
কয়েক মুহূর্ত কেউ কোনো কথা বললো না। সবাই পরস্পরের দিকে তাকালো। ধীরু হেসে উঠে বললো, 'ও রকম সবাই বলে রে শিবু। সঙ্গে মেয়েমানুষ থাকলেই বলে দেয় বউ। তা, কেমন বউ ? পথে জুটে গেল, না তুই নিজেই কোথাও থেকে জুটিয়ে নিয়ে এলি ?'
ধীরুর কথা শুনে, বউঝিদের একটু আধটু হাসির শব্দ শোনা গেল। শিবতোষ অবিচলিত মুখে হাসলো, 'কী যে বলিস ধীরুদা। এ খাঁটি সদ্ ব্রাহ্মণের মেয়ে। আমার শ্বশুরের নাম শ্রীকান্ত চক্রবর্তী—আসলে শাণ্ডিল্য গোত্র। গত সাত বছর শ্বশুর বাড়িতেই ছিলাম। শ্বশুরবাড়ি থেকেই এখানে এসেছি। মালদা শহরেরই এক পাশে আমার গরিব শ্বশুর বাড়ি। চকোত্তিমশাই এক মোক্তারের মুহুরী। আমিও এক মোক্তারের মুহুরী ছিলাম। শ্বশুরমশাই-ই শিখিয়ে-পড়িয়ে মুহুরীর কাজ জুটিয়ে দিয়েছিলেন।'
ধীরুর চোখের দৃষ্টি, হাসিতে কেমন একটা ইতরতা। বড়দের সামনে ওর কথাবার্তা উদ্ধত। আরতিকে আঙুল দেখিয়ে আকর্ণ হেসে জিজ্ঞেস করলো, 'এ কি তোর সাত বছরের বিয়ে করা বউ নাকি ?'
'না না।' শিবতোষ সরল হেসে বললো, 'বিয়ে হয়েছে বছর দেড়েক আগে। গত সাত বছর ধরে আমি শ্বশুর বাড়িতে আছি। আছি মানে, চকোত্তিমশাই মানুষটি ভালো। আমাকে নিজে থেকেই বাড়ি নিয়ে গেছেন। ওঁর ছেলে নেই। পাঁচ মেয়ে। এটি সকলের ছোট। মেয়ে সুন্দর হলেও বিয়ে দিতে টাকা লাগে। চার মেয়েকে কোনোরকমে পার করেছেন। আমাকে কাজ-কর্ম শিখিয়ে যখন দেখলেন, মোটামুটি রোজগার হচ্ছে, তখন আমার সঙ্গেই এর বিয়ে দিয়ে দিলেন।
ধীরু সকলের দিকে একবার দেখে হা-হা করে হেসে উঠলো, 'তোর শ্বশুর বেশ ঘাগু মাল। জামাই হাতে তৈরি করে, মেয়ে তুলে দিয়েছে। না কি, তুই-ই এর সঙ্গে লটঘট বাঁধিয়ে—।'

না না ধীরুদা তুই যেরকম বলছিস, সেরকম কিছু নয়।' শিবতোষ হেসে বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করলো, 'এর দিদিদের বিয়ে বেশ ভালো ঘরেই হয়েছে। আমি তো গরিব। বিয়ের টাকা-পয়সা খরচ ছাড়াও, মানুষের মন বলে একটা কথা আছে তো। এর সঙ্গে আমার বিয়ে দেবার সময়ে, শ্বশুরমশাই ভেবেছিলেন, আমাদের ঘরেই রেখে দেবেন। আমাকে ছেলের মতন দ্যাখেন। আমারই কী মনে হলো—অবশ্যি আমার বউয়েরও ইচ্ছে হয়েছিল, আমার পৈতৃক ভিটেয় এসে থাকব। আর ওসব ঐ লটঘট কী বলছিস, ওসব আমার আসে না।'

'হুঁ।' ভবতোষ একটা শব্দ করলেন।

এতক্ষণ সবাই চুপচাপ ধীরুর কথা শুনছিল। জ্যাঠার গলা শুনে, সবাই তাঁর দিকে তাকাল। তিনি বললেন, 'সব শোনা হলো, সব বোঝা গেল। কিন্তু এখন এদের নিয়ে কী করা যায়? দু-চার দিন থাকা খাওয়া ব্যবস্থা করা যায়। চিরকাল তো আর কেউ রেখে খাওয়াবে না।'

'মাথা গোঁজবার একটা ঠাঁই পেলে, খাওয়া পরার ব্যবস্থা একটা করে নেব।' শিবতোষ জ্যাঠার দিকে তাকিয়ে হাসলো, 'রাধাকান্ত জীউর ভোগ তো পাব।'

ধীরু হেসে উঠলো, 'রাধাকান্তর ভোগ খেয়ে বেঁচে থাকবি? তুই কি ভাবছিস, সব আগের মতন আছে? দুপুরে যা ভোগ হয়, তাতে তো একটা মানুষেরই ভালো করে পেট ভরে না। রাত্রে তো গোটা কতক বাতাসা আর নকুলদানা। তার চেয়ে তুই এক কাজ কর। থাকবার জায়গা একটা জুটলে, তোকে আমি পঞ্চায়েতের কাজে লাগিয়ে দেব। আমাদের দলের হয়ে কাজ করবি। তবে ভালো মানুষিতে চলবে না। ডেঁটে থাকতে হবে। আগের গ্রাম তো আর নেই। এখন গায়ের জোরের যুগ! বুদ্ধিও চাই। সে সব আমি তোকে তালিম দিয়ে দেব।'

'কাজের ব্যবস্থা আমি করতে পারি।' ভবতোষ বললেন বিভ্রান্ত শিবতোষের মুখের দিকে তাকিয়ে। 'আমার চাষবাস দেখবার লোক আছে বটে, তবে তোকেও কিছু কাজ দিতে পারি। আমার সারের কারবার আছে। গোটা

কয়েক স্যালো মেশিন আছে। নিজের জলের দরকার। ভাড়াও খাটাই। আজকাল তো আর ওসব ছাড়া চাষ হয় না। মাটির তলা থেকে জল তুলতে হয়। গাঁয়ে বিদ্যুৎ এলে ডীপ টিউবওয়েলও বসাবো।'

ঋষিকাকা বললেন, 'তাই কর ভবদা। তোমার বিশ্বাসী কাজের লোক দরকার।'

সঙ্গে সোমত্থ বউ।' জগোপিসি এতক্ষণে আবার মুখ খুললো, 'দেখতে শুনতেও—বলতে নেই, মেয়েমানুষের রূপই আবার কাল হয়। দেখে শুনে রাখতে হবে। যে ঘরেই থাকুক, একটু যেন থাকার মতন ঘর হয়।'

ধীরু তৎক্ষণাৎ বললো, 'শিবু তুই কিন্তু আমাদের ঘরেই থাকতে পারিস।'

'আমার ওখানেও কোনো অসুবিধে নেই।' ঋষিকাকা ভবতোষের দিকে তাকিয়ে বললো। পুবের পোড়া পেরিয়ে আসা লাঠি হাতে বয়স্ক বললো, 'থাকবার জায়গা আমিও দিতে পারি। পশ্চিমের একতলাটা তো খালিই পড়ে আছে। গুছিয়ে গাছিয়ে নিতে পারলে —।'

ভবতোষ হাত তুলে বললেন, 'থাক চণ্ডী, তোমার পশ্চিম অংশটা থাকবার মতন নেই। কোন্‌দিন হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে। এখন আমার ঘরেই শিবু উঠুক। ওর কোনো স্বত্ব নেই বড় তরফে, কিন্তু হাজার হোক, ও তো আসলে আমদের তরফেরই ছেলে।'

'তোর কপালটা দেখছি খুব ভালো রে শিবু।' ধীরু হা হা করে হাসলেও, তার মুখটা শক্ত দেখাচ্ছিল। চোখের দৃষ্টিও কঠিন, 'তবে সাবধানে থাকিস্। আর আমার কথাটাও মনে রাখিস। বিপদে আপদে পড়লে আমার খোঁজ করবি। আমিও খোঁজ রাখব।' সে ভবতোষের দিকে একবার দেখে, পুব দিকে চলে যেতে যেতে অস্ফুটে উচ্চারণ করলো, 'বুড়ো ভাম্।'...

ধীরুর কথাবার্তার ধরন-ধারণ শিবতোষের ভালো লাগে নি। কথাবার্তা শুনে সব সময় অবশ্যি মানুষ বিচার করা যায় না। খাওয়া-পরার দায়িত্ব না নিলেও, তাকে আশ্রয় দেবার ব্যাপারে সকলের উৎসাহ অপ্রত্যাশিত মনে হলো। শিবতোষ নিতান্ত বুদ্ধিহীন না। তবে মোক্তারের মুহুরী হিসাবে

সংসারকে যে-চোখে দেখতে শেখা উচিত, সে-ভাবে দেখতে শেখে নি। মুহুরীর কাজ করতে গিয়ে ভালোর থেকে মন্দ মানুষই সে বেশি দেখেছে। মিথ্যুক, শঠ, প্রবঞ্চক, লোভী অনেক দেখেছে সে। দেখেছে, আদালতের বিচারে তাদের জয়জয়কার। সে-সব একমাত্র আইনের দ্বারাই সম্ভব। উকিল মোক্তারদের এলেমের ওপর সে-সব নির্ভর করে। সত্যি-কে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্যি প্রমাণ করাই উকিল মোক্তারদের কাজ। সে-সব বুঝতে তার বেশ অনেক দিন লেগেছে। প্রথমে বুঝতে পারতো না বলে, মোক্তারমশাইয়ের কাছে তাকে অনেক ধমক খেতে হয়েছে। বকুনি শুনতে হয়েছে। অবশ্যি, ভালো কথায় বুঝিয়েও বলেছেন। সে সব হচ্ছে সংসার ও মানুষ সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞান। সেই তত্ত্বজ্ঞান বিশ্বাস করলে মানতে হয়, অধিকাংশ মানুষ অসৎ। সৎ মানুষ কোটিকে গোটিক। শিবতোষ আইনের মারপ্যাঁচ বোঝে না। মোক্তারমশাইয়ের মতো আইনের চোখে সে মানুষকে বিচার করতে শেখে নি। ফলে, সংসারে সৎ মানুষের চেয়ে অসৎ মানুষ বেশি, মন থেকে মেনে নিতে পারে নি। তবে আইন-আদালতের জগৎ আলাদা। সেই জগৎ আর মানুষের সংসারে এক না।

শিবতোষ এখন যেখানে উপস্থিত, এটা আইন আদালতের জগত না। নিজের আপন জ্যাঠাসহ গোষ্ঠী মিলিয়ে এখন সে সংসারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। তবু সে বুঝতে পেরেছে, ধীরুর সঙ্গে জ্যাঠার কোথায় একটা বিরোধ বিবাদ আছে। অবশ্যি জ্ঞাতিদের মধ্যে বিরোধ বিবাদ নতুন কিছু না। আগেও ছিল। তবে ধীরুর উদ্ধত আচরণ একটু অন্যরকম। এতক্ষণের কথাবার্তায় বেশ বোঝা গেল, ধীরুর সঙ্গে জ্যাঠার বাক্যালাপ নেই। শিব-তোষকে আশ্রয় দেবার ব্যাপারে, দুজনের মধ্যে একটা জেদাজেদি চাপা থাকে নি বাকিরাও যারা তাকে আশ্রয় দিতে উৎসাহী, তারাও যেন জ্যাঠার ওপর খুশি না। জ্যাঠার কথার প্রতিবাদ করার সাহস তাদের নেই। তার কারণ বোধহয় একটাই। জ্যাঠার অবস্থা সকলের থেকে ভালো। তাঁকে পরোয়া করে না একমাত্র ধীরু। কেন? ধীরু কি জ্যাঠার মতোই অবস্থাপন্ন? কিন্তু সুন্দর খুড়োর অবস্থা কোনোকালেই ভালো ছিল না। ধীরু পঞ্চায়ে-

তের কথা বলছিল। সেটা হচ্ছে আর এক জগৎ। রাজনীতি আর দলের ক্ষমতা। শিবতোষ এই জগতের কথাও জানে। এই জগতেও বিস্তর সরকারি টাকার খেলা। লড়াই মারাপিট, এমন কি খুনোখুনিও লেগেই আছে ধীরু তা হলে এখন রাজনীতি করে?
জানা যাবে। সবই জানা যাবে। জ্যাঠা যে তাকে আশ্রয় দিতে রাজি হয়েছেন। শিবতোষের কাছে এখন সেটাই সব থেকে স্বস্তির বিষয়। হয়তো রাজি হতেন না। ধীরুর প্রস্তাব শুনেই যেন জ্যাঠার মতিগতি হঠাৎ বদলে গেল। সেটা এক দিক থেকে যেন ভালোই হলো। ধীরুর কথাবার্তা আচরণ তার ভালো লাগে নি। বাকিদের ওপর শিবতোষের মনে তেমন আস্থা নেই।
'এ একরকম ভালোই হলো।' আর এক বিধবা বৃদ্ধা মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, 'ভবর ছেলের বউরা কেউ এখানে থাকে না। ছেলের বউদের সেবা কোনো দিন পেল না। এখন ভাইপো বউয়ের সেবা পাবে।'
ভবতোষ হাসলেন। আসল দাঁতের হাসি। কষের দিকে দুএকটা পড়েছে কিনা বোঝা যায় না। কতো বয়স হলো জ্যাঠার? পঁচাত্তর তো বটেই। কিন্তু এখনোও রীতিমত শক্তপোক্ত শরীর। গায়ের পেশি চামড়া তেমন শিথিল হয় নি। গোঁফ দাড়ি কামানো মুখে ভাঁজ রেখার হিজিবিজি নেই। চশমাহীন চোখ জোড়া এখনও উজ্জ্বল। বললেন, 'আমার সেবা চাইনে গো নেত্যদিদি। বিনা সেবাতেই বেশ আছি। জানই তো, আমি হলাম চাষা মানুষ। এখন বারমাসই চাষের কাল। রোদে জলে টইটই ঘুরে বেড়াই। তবে হ্যাঁ, কাজের লোক আমার চাই। শিব আমার কাজ দেখবে। ঘরের বউ ঘরের মতন থাকবে। শত হলেও নিজের ভাইপো। পনেরো বছর বাদে এসেছে। কালী আর হরির হাল তো জানি। কাটোয়ায় নিজেরাই কোনোরকমে বেঁচেবর্তে আছে। শিবু সেখানে গিয়ে কী করবে?'
'দরকার নেই।' শিবতোষ স্বস্তিতে হেসে বললো, 'আমি তোমার কাজ করব, তোমার কাছেই থাকব।' সে বৃদ্ধা বিধবাকে প্রণাম করলো, 'নেত্যপিসি মাথার চুল কেটে ফেলেছো। চেহারাটাও বদলে গেছে। তোমাকে চিনতেই পারিনি।'

নেত্যপিসির মাথা ভরতি ছোট সাদা চুল। সারা মুখে হিজিবিজি রেখা। দাঁত নেই একটিও। সে-ই প্রথম শিবতোষের চিবুকে হাত ঠেকিয়ে নিজের মুখে ছোঁয়ালো। বললো 'জয়তু। কী করে চিনবি বল্? আশির ওপর বয়স হয়ে গেল। যমে নেয় না, তাই বেঁচে আছি। ঘরে শুয়েছিলাম। খবর গেল, কে একটা লোক এসে নাকি বলছে, 'সে বড় তরফের আশুর ছেলে শিবু। তা সত্যি বলছি, আমি তোকে দেখে চিনতে পারিনি। কী করেই বা পারব। পনরো বছরের ছেলে, কোন্ নিশির ডাকে ঘর ছেড়ে চলে গেছিলি। এখন তিরিশ বছরের যোয়ান। ধীরু তোর পিঠ কোমরের জড়ুলের দাগ দেখে চিনতে পেরেছে। মিছে কথা বলবিই বা কেন? তুই তো নাম ভাঁড়িয়ে দাঁও মারতে আসিস নি। বাপ-পিতামর ভিটেয় কোনো-রকমে মাথাগুঁজে বেঁচেবত্তে থাকার আশায় এসেছিস। সঙ্গে সোমত্ত বউ। ভব তোকে রাখতে রাজি হয়েছে, ভালো কথা। হলুদকাটির জমিদার-বাড়ি বলতে আর কিছু নেই। তবু লোক এখনো এ বাড়িকে হলুদকাটির বাবুদের বাড়ি বলে। বাবুই বা আর কে আছে, ভব ছাড়া? সে তোর আপন জ্যাঠা। ন্যায় কাজ করেছে।'

নেত্যপিসির কথা শুনে সবাই মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিচ্ছিল। ইতিমধ্যে উঠোনের কিছু অংশে ছায়া পড়েছে। পায়রার বকম্‌বকমও যেন একটু কমেছে। আরতি সেই এক ভাবেই, ঘোমটা ঢেকে মাথা নিচু করে বসে আছে। ভবতোষ সেদিকে একবার দেখে, হেসে বললেন, 'কথাবার্তা পরে হবে। এদের একটা থাকার ঘরের ব্যবস্থা করি। লোটন কোথায় গেল?'

লোটন পশ্চিমের দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল। তার তাড়ির নেশা অনেকটা কেটেছে। এগিয়ে আসতে আসতে বললো, 'এই যে, আমি এখেনে।'

'বাকসো বিছানা তুলে নিয়ে যা বাড়ির ভেতর।' ভবতোষ বললেন, 'পুঁটলি দুটোতে কী আছে?'

শিবতোষ সলজ্জ হাসলো, 'একটায় কিছু চাল আছে। আর একটায় চিঁড়েগুড় টুড়। ওগুলো আমি হাতে করে নিচ্ছি।'

'তোকে নিতে হবে না।' ভবতোষ এই প্রথম শিবতোষকে 'তুই' বললেন।

পশ্চিমের দরজার দিকে তাকিয়ে গলা চড়িয়ে ডাকলেন, 'তমালী। তমালী কোথায় গেলি?'
বাড়ির ভিতর থেকে চব্বিশ পঁচিশ বছরের একটি মেয়ে ছুটে বেরিয়ে এলো। স্বাস্থ্যবতী, ডাগর চোখ, বোঁচা নাক। রঙ কালো। খয়েরি ডোরা-কাটা শাড়ি, আর লাল জামা গায়ে। কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, সিঁথেয় সিঁদুর। দু হাতে শাঁখা নোয়া। কিন্তু মাথায় ঘোমটা নেই। কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, 'কী বলছেন কত্তাঠাকুর?'
'তুই ঐ পুঁটলিদুটো নে। বউমাকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে যা।' ভবতোষ আর একবার আরতির দিকে দেখলেন। শিবতোষকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আর কিছু নেই তো?'
শিবতোষ বললো, সিঁড়ির নিচে দু'জোড়া স্যাণ্ডেল আছে। আমি নিয়ে যাব।'
'তোকে নিতে হবে না।' ভবতোষ বললেন, 'লোটন নিয়ে যাবে।'
তমালীর মুখে টেপা হাসি। চোখে কৌতুকের ছটা। পুঁটলি দুটো তুলে এক হাতে নিল। আরতির কাছে গিয়ে আর এক হাত বাড়িয়ে দিল 'আসুন'।
আরতি তমালীর হাত ধরলো না। নিজেই উঠে দাঁড়ালো। ভুরুজোড়া পর্যন্ত ঘোমটা ঢাকা। বুকের আঁচল টেনে দিল প্রায় গলা পর্যন্ত। পিছন দিকের আঁচলের অংশ টেনে নামিয়ে দেবার চেষ্টা করলো। কিন্তু বুকের অনম্রতা, সুগঠিত নিতম্ব কিছু মাত্র অপ্রকট থাকলো না। তমালীর পিছনে পিছনে হেঁটে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। সকলের দৃষ্টিই তখন আরতির দিকে।
'বাক্সো বিছানা কোন্ ঘরে রাখব?' লোটন জিজ্ঞেস করলো।
ভবতোষ যেন একটু ঝেঁঝেই বললেন, 'আগে বাড়ির ভেতর নিয়ে যা, তারপরে বলছি, কোন্ ঘরে রাখবি।'
লোটন সিঁড়ির নিচে থেকে স্যাণ্ডেল জোড়া তুলে নিয়ে এলো। সতরঞ্চি জড়ানো বিছানার ওপর স্যাণ্ডেল জোড়া রেখে দু হাতে ট্রাংক তুলে, পশ্চিমের

দরজার দিকে এগিয়ে গেল। এগিয়ে গেলেন ভবতোষও। ডাকলেন, 'শিবু আয়।'

শিবতোষ পা বাড়াবার আগে, একবার পিছন ফিরে দেখলো। কেউ আর তখন দাঁড়িয়ে নেই। যে যার পথে ফিরে চলেছে। কেবল একদল বাচ্চা ছেলেমেয়ে, দালানে উঠোনে দৌড়ঝাঁপ শুরু করে দিল। যেন নাটকের একটি সংকটময় রুদ্ধশ্বাস অঙ্ক অনায়াসেই শেষ হয়ে গেল।

জীবন তো একরকমের নাটকই। এ নাটকে কেউ কারোর ভূমিকায় সেজে-গুজে এসে দাঁড়ায় না। যার যেমন জীবন, সেইভাবেই চলে। ঘটনা ছাড়া জীবন নেই। ঘটনার নিজের ওপর কোনো কর্তৃত্ব থাকে না। ঘটনা নিজে থেকে ঘটে না। ঘটনা ঘটায় মানুষ। অবিশ্যি তার পিছনেও থাকে বিস্তর কার্যকারণ। অথচ এই সরল যুক্তিটাই মানুষ মেনে নিতে পারে না। ভাবে ঘটনা যেন এক অশরীরী সত্তা। সে মানুষের জীবন আর সংসারকে নিয়ন্ত্রিত করছে। মানুষ, ঘটনার সেই অশরীরী সত্তার অসহায় ক্রীড়নক মাত্র। ভালো মন্দ যেমনই হোক সেই ঘটনা।

শিবতোষের নিজেরই এই ব্যাখ্যা। সরল যুক্তি আর ঘটনার অশরীরী সত্তা। অথচ এ দুইয়ের মাঝখানটায় সে নিজেই দোদুল্যমান। পনরো বছর পরে তার জন্মভিটায় প্রত্যাবর্তন, জ্যাঠা ভবতোষের দ্বারা আরতিসহ অপ্রত্যাশিত গ্রহণকে যদি নাটকের প্রথম অঙ্ক বলা যায়, তাহলে পরবর্তী ঘটনাসমূহ দ্বিতীয় অঙ্কের অন্তর্ভুক্ত। প্রথম অঙ্কটাকে মনে হয়েছিল, সংকটময় আর রুদ্ধশ্বাস। অথচ যেন কতো অনায়াসে শেষ হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় অঙ্কটার শুরু হয়েছিল একটা নিশ্চিন্ত আশ্বাসের মধ্য দিয়ে। সেই নিশ্চিন্ত আশ্বাসের সঙ্গে ছিল ভবতোষের বিশেষ আগ্রহ, অনুগ্রহ আর বদান্যতা। কিন্তু শিবতোষের মনে হয়েছিল, জীবনে ঘনিয়ে আসছে নতুন সংকট। সমস্ত পরিবেশ হয়ে উঠছে রুদ্ধশ্বাস। সেই সংকটময় রুদ্ধশ্বাস অবস্থার মধ্যে কেমন একটা অশরীরী অলৌকিকতা যেন ছিল। শিবতোষকে একটা অজ্ঞাত ভয় আর বিস্ময় দূরস্থিত অজগরের মতো গ্রাস করছিল।

অথচ সেই সব অশুভ সংকেতগুলোর স্বরূপ কী, সে নিজের চোখে দেখেও স্পষ্ট বুঝতে পারছিল না। কারণ তার মনে যুক্তির সারল্যেও আস্থা ছিল। যে-সারল্যের জন্য কারোর প্রতি তার এমন অবিশ্বাস জন্মাতে পারে নি, কেউ কোনো অশুভ ঘটনা ঘটাতে চলেছে।

শিবতোষের মনে এমন একটা অবস্থার সূচনা কবে থেকে হয়েছিল? বস্তুতপক্ষে, সেই প্রথম দিন থেকেই। শিবতোষ পূজা-দালানের পশ্চিমের দরজা দিয়ে ভবতোষের পিছনে পিছনে ঢুকেছিল। বড় তরফের বাড়ি, অন্দর, যাই বলা হোক। শিবতোষ বড় তরফেরই সব থেকে ছোট ছেলে। তার জন্ম ভিটা। কেবল তার না। যে ভবতোষের পিছনে পিছনে সে ঢুকেছিল, সেই জ্যাঠা, তার বাবা আশুতোষও জন্মেছিলেন এই ভিটায়। জ্যাঠামশাইয়ের সব ছেলেমেয়েরা এই ভিটায় জন্মায় নি। কয়েকজনের জন্ম হয়েছিল জ্যাঠার বড়লোক শ্বশুরবাড়ি চুঁচড়ায়। বাকিদের এখানেই। আর শিবতোষসহ, তাদের সব ভাই বোনের জন্ম হয়েছিল এই ভিটাতেই। যে-ভিটা ছেড়ে, পনরো বছর আগে, শিবতোষ চলে গিয়েছিল। যে-ভিটার ওপর এখন আর তার কোনো পৈতৃক স্বত্ব বা দাবি দাওয়া নেই। এমন কি এক কাঠা চাষ জমিও নেই। দাদারা সব জ্যাঠাকেই বিক্রি করে দিয়ে চলে গিয়েছে। দাদাদের কাছে গিয়ে কিছু উশুল করার কথা ভাবাই যায় নি। জ্যাঠার কথাতেই তা বোঝা গিয়েছিল। ভিটেজমির ওপর কোনো দাবি না থাক, বড় তরফের নিজেদের ছেলে হিসাবে জ্যাঠা তাকে সস্ত্রীক আশ্রয় দিয়ে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন, সেটাই অনেক বড় সৌভাগ্যের মনে হয়েছিল। সে মনে স্বস্তি নিয়ে সেই বড় তরফের ভিতরে ঢুকেছিল। ঢোকবার আগে তার মনে জেগে উঠেছিল একটা খুশির কৌতূহল আর ব্যাকুলতা। পনেরো বছর আগের, সেই বালক পনেরো বছরের সব স্মৃতি যেন হুড়মুড় করে মনের দরজায় ফেটে পড়তে চাইছিল।

শিবতোষ ভিতরে ঢোকার পরে, ভবতোষ নিজেই দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। শিবতোষ থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। মনে হয়েছিল, সে ভুল করে কোনো অচেনা বাড়িতে ঢুকে পড়েছে। তার আজন্মকালের চেনা ও

জানা ঘর বাড়ি দরজার সঙ্গে কোথাও কোনো মিল ছিল না। ঐ রকম বিরাট একটা সিমেন্ট বাঁধানো উঠোন, কোনো কালে বড় তরফের সীমার মধ্যে ছিল না। উঠোনের পশ্চিম দিকে, কয়েক হাত উঁচুতে কাঠের মজবুত মাচার ওপর, বেতের বেড়ার চারটি ঘরের মাথায় খড়ের চাল। চালের ডগায় খড় মুচড়িয়ে যেন শক্ত মুণ্ডু বাঁধা হয়েছে। কাঠের মাচার খুঁটিগুলো যেমন মোটা, তেমনি শক্ত পোক্ত। খুঁটিগুলোতে আলকাতরা মাখানো। প্রথম দেখলে মনে হয়, শালের খুঁটি। আসলে ওগুলো পাথর কুচি আর সিমেন্টের ঢালাই করা। বেতের বেড়ার গায়ে, চার ঘরের চার দরজায় তালা লাগানো। চার দরজার গায়ে গোলা সিঁদুরে আঁকা স্বস্তিক চিহ্ন। বেড়ার গায়ে ঠেকানো ছিল একটা মই। প্রথম নজরে ঘর মনে হলেও, আসলে ওগুলো ধানের মরাই। তারপরেও পর পর তিনটি ছাদ-আঁটা পাকা ঘর। সে-ঘরগুলো যে কিসের শিবতোষ কিছুই বুঝতে পারে নি। বড় তরফের ঐ রকম বড় উঠোন, ঐ রকম বেতের বেড়ার বিশাল চারটে মরাই, আরও পর পর পাকা ঘর কোনো কালে ছিল না। আর ঐরকম উঁচু পাঁচিল!

পূজা দালান থেকে ভিতরে ঢুকে প্রথম যেটা নজরে পড়েছিল, সেটা মস্ত উঁচু আর চওড়া পাড় ঘেরা ইদারা। মাথায় তার কপিকলের সঙ্গে ঝুলছিল মোটা দড়ি বালতি। ইদারার বড় মুখ, কাঠের তক্তা আর লোহার জাল দিয়ে ঢাকা ছিল। কিন্তু ইদারার গায়ে লোহার হাতল লাগানো যন্ত্রটার দিকে তাকিয়ে, শিবতোষ হকচকিয়ে গিয়েছিল। দেখেছিল, ইদারার গা থেকে, উঁচু পাঁচিল বেয়ে লোহার পাইপ উঠে গিয়েছে দোতলায়। বুঝতে অসুবিধা হয় নি, দোতলার ছাদে কোথাও জলের ট্যাঙ্ক আছে। ইদারার গায়ে ওটা ওপরে জল তোলার হাতে চালানো পাম্প মেশিন। ওদিক দিয়েই বাগানে যাবার একটা বড় দরজা পাঁচিলের গায়ে। সেটা বন্ধ ছিল। কিন্তু পুরনো দিনের একটা মাত্র গাছই সেই শান বাঁধানো উঠোনে ঢুকে পড়েছিল। ইদারার কাছাকাছি, সেই বিশাল আর অদ্ভুত দেখতে গুঁড়ি মুচকুন্দ গাছটা কাটা পড়ে নি। একেবারে

পড়ে নি, তা না। ঝাড়ালো অনেক ডালপালা কেটে ফেলা হয়েছিল। কেবল বিশাল চওড়া, কিম্ভূতাকৃতি আর লম্বা গুঁড়িটার শরীরে দু তিনটে মোটা, পেশী পাকানো ডাল দাঁড়িয়েছিল। শিবতোষের মনে হয়েছিল, পনরো বছরের মধ্যে মুচকুন্দ গাছটার বয়স যেন একটুও বাড়ে নি। অনেক ছেলেবেলায়, ঐ গাছটার কিম্ভূতাকার বিশাল গুঁড়িটার বয়স যেন একটুও বাড়ে নি। অনেক ছেলেবেলায়, ঐ গাছটার কিম্ভূতাকার বিশাল গুঁড়িটার দিকে তাকিয়ে, তার চোখে রূপকথার রাক্ষসের চেহারা ভেসে উঠতো। রাত্রে ঘরের বাইরে বেরোতে হলে, কোনো দিন ওদিকে তাকাতো না। তারপরে অবিশ্যি ঐ মুচকুন্দর ঘাড়ে চেপে, উঁচু ডালে উঠে অনেক খেলা করেছে।

'তমালী, তুই বউমাকে নিয়ে ওপরে চলে যা।' ভবতোষের রাশভারি স্বরে হুকুম শোনা গিয়েছিল, 'কি চাই, একটু দেখিস। ব্যবস্থা সবই আছে। আমার ঘরের বাঁ দিকের ঘরে—লোটনকেও বলিস, ট্রাংক যেন ওখানেই তুলে দেয়। আর ধোয়া কাপড়চোপড়ের দরকার হলে, বুঝলি ? নিয়ে যা।' তিনি শিবতোষের দিকে ফিরে তাকিয়েছিলেন।

শিবতোষ কিছুই চিনতে পারছিল না। বিশাল শান বাঁধানো উঠোন। আর দক্ষিণ দিকেই সেই দু দিকেই দুই লম্বা চওড়া দালান। মাঝখানে পর পর ঘর। দোতলাতেও একই ব্যবস্থা। পনরো বছর আগে, দোতলাটা পরিত্যক্ত ছিল। কেউ থাকতো না। তবে দোতলায় যাতায়াত ছিল। এমন কি ছাদেও ওঠা হতো। ছাদের অনেক জায়গাই ছিল ফাটা। দোতলায় জল পড়তো। ব্যবহারের অযোগ্য ছিল। আর বাইরে থেকে, বড় তরফের গোটা দোতলা বাড়িটাই তো দেখাতো যেন পোড়ো বাড়ি। শ্যাওলা ধরা দেওয়াল। পলেস্তারা খসা, শ্যাওলা ধরা দেওয়ালের এখানে সেখানে ফাটল। ভবতোষ বড় ভাইয়ের অধিকার নিয়ে দক্ষিণ খোলা দালান আর ঘর ভোগ করতেন। শিবতোষরা থাকতো পিছনের উত্তরে। কিন্তু সে-বাড়িটাই তো ছিল না। প্রথম ঢুকে, শিবতোষের তাই মনে হয়েছিল। সে দক্ষিণ মুখো হয়ে দাঁড়িয়ে বাড়িটাকে চিনতে পারছিল না। অবিশ্যি

প্রথম থেকেই বাড়িটাকে ওর নতুন মনে হচ্ছিল। ভিতরে ঢুকে, দোতলার দিকে তাকিয়ে দেখেছিল দুই দালানের সামনে দুটো রেলিং ঘেরা বারান্দা। রেলিং-এর ওপরে লোহার গ্রিল দিয়ে ঘেরা। কোনো কালেই ওসব ছিল না। দালানের এক দিকের দরজা বন্ধ ছিল। মাঝখানে বড় ঘরের আর, অন্য দিকের দালানের দরজা ছিল খোলা। ভিতরের দিকে তাকিয়ে দেখেছিল সাদা কালো মোজাইকের মেঝে। ভিতরের দেওয়াল সব ঝকঝক করছে। তমালীর সঙ্গে সেই ঘরের ভিতরে দিয়ে, আরতি কোন্ দিকে চলে গিয়েছিল, সে দেখতেই পায় নি। আর দোতলায় ওঠার সিঁড়ি কোথায়, তা কিছুতেই মনে করতে পারে নি।

'আয় ঘরের ভেতরে গিয়ে বসি।" ভবতোষ শিবতোষকে ডেকেছিলেন, 'উঠোন এখন তেতে আছে। সারাদিন রোদ থাকে। এই জ্যৈষ্ঠ মাসের রোদ। এখন ইঁদারা থেকে জল ঢেলে ঢেলে ঠাণ্ডা করবে।' তিনি ঘরে না ঢুকে দালানে ঢুকেছিলেন।

শিবতোষও জ্যাঠার পিছনে পিছনে দালানে ঢুকেছিল। বিরাট লম্বা আর চওড়া দালান। পশ্চিমের একটি বড় জানলা, ওপরের দিকের পাল্লা খোলা ছিল। বাইরেই ঘন গাছপালা। নইলে, হয়তো পশ্চিমের বিকালের রোদ এসে পড়তো। শিবতোষ দালানের আসবাবপত্র দেখছিল। সুন্দর কয়েকটি চেয়ার। মাঝখানে একটি গোল টেবিল। দেওয়ালে টাঙানো বিলিতি ছাপানো রঙীন মেমসাহেবদের ছবি।

"কীরে শিবু, নিজেদের ঘরে ঢুকে তোর ধন্দ লেগে গেল দেখছি।" ভবতোষ হেসে জিজ্ঞেস করলেও, তার স্বরে আর চোখে মুখে কেমন একটা সন্দেহের ছায়া নেমেছিল।

শিবতোষ ভিতরে ঢোকবার আগে এক মানুষ ছিল। ভিতরে ঢুকে, আর এক মানুষ হয়ে গিয়েছিল। ভবতোষের সরাসরি সম্বোধন শুনে, একটু যেন নিজেকে ফিরে পেয়েছিল। হেসেছিল একটু কিন্তু তার চোখে ও গলার স্বরে ছিল অপরিসীম বিস্ময়, "ধন্দ কী বলছো জ্যাঠা? আমি যে এ কোন্ মহলের অন্দরে ঢুকেছি, তাই যেন চিনতে পারছি নে। বড়

তরফের সেই বাড়ি যে এই বাড়ি, আমার তো যেন বিশ্বাসই হচ্ছে না।”
“তা যা বলেছিস ?’ ভবতোষ একটা চেয়ারে বসে হা হা করে হেসেছিলেন তাঁর হাসির স্বরে ছিল আত্মপ্রসাদের সুর। শিবতোষের প্রতি যেটুকু বা সন্দেহের ছায়া ঘনিয়ে এসেছিল, তা আর ছিল না। বলেছিলেন, ‘ও কথা সবাই বলে। বলে, নতুন জমির ওপরে এরকম একটা নতুন বাড়ি তুললেও এর চেয়ে খরচ কম হতো। আমি পুরনো বাড়িই নতুন করেছি। ভিতটা তো মজবুতই ছিল। আর ভেবে চিন্তেই সব করেছি। আমি কোনো কিছু আধাখ্যাঁচড়া পছন্দ করি নে। যা করবো, তা মনের মতন করে করবো। তবে হ্যাঁ, একটা কথা মনে রাখিস শিবু, তোর তুই জ্যাঠতুতো দাদা ভবেন রমেনের একটা পয়সাও আমি নিইনি। যা করেছি, সব নিজের টাকায়।”
ভবতোষের কথা শুনেই যেন শিবতোষের জ্যাঠতুতো দাদাদের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। বড়দা আর সেজদা। যারা চুঁচুড়ার বড়লোক মামাবাড়িতে লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়েছিল। শিবতোষ তার ছেলেবেলায় বড়দা আর সেজদাকে দেখেছে। মামার বাড়িই যেন ছিল তাদের আসল বাড়ি। চুঁচুড়া থেকে তারা কলকাতায়ও পড়তে যেতো। লেখাপড়ায় তারা খুবই ভালো ছিল। পুজো পার্বণে হলুদকাটির নিজেদের বাড়িতে আসতো। তবু শিবতোষের মনে ছিল, তার পনেরো বছর বয়সের আগেই, বড়দা কলকাতায় মস্ত একটা চাকরি পেয়েছিল। কলকতাতেই বিয়ে করেছিল। চুঁচুড়াতে হয়েছিল বউভাত। শিবতোষরা কেউ যেতে পারে নি। তবে বড়দা দুদিনের জন্য বউদিকে নিয়ে হলুদকাটিতে এসেছিল। বউদি ছিল কলকাতার খুব বড়লোক বাড়ির মেয়ে। লেখাপড়াও শিখেছিল। জ্যাঠাইমা মারা গিয়েছিলেন বড়দার বিয়ের পর। তার পরে আর শিবতোষের কিছু মনে নেই। সে হঠাৎ একদিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। ভবতোষের কথা শুনে, তার মনে নতুন কৌতূহল আর জিজ্ঞাসা জেগেছিল, ‘হ্যাঁ, জিজ্ঞেস করতেই ভুলে গেছি। বড়দা সেজদা কোথায় ? তাদের তো দেখতে পাচ্ছি নে ?”
“না থাকলে আর দেখতে পাবি কোত্থেকে ?”

শিবতোষ চমকে উঠেছিল, "মানে, না থাকলে··?'

"হা হা হা !···ভবতোষ প্রায় অট্টহাস্য করেছিলেন, "না না, ভাবছিস, তা না। ভবেন রমেন বেঁচে আছে। খুব ভালো ভাবে বেঁচে আছে। দুজনেই কলকাতায় মস্ত বাড়ি করেছে। কিন্তু কলকাতায় বিশেষ থাকে না। বছরে একবার করে কলকাতায় আসে। শীতের সময় ভবেন থাকে বিলেতে। রমেন থাকে আমেরিকায়। বে থা করেছে। ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে। বিলেতে আমেরিকায়ও বাড়ি করেছে। তোর সেই আগের বড়দা মেজদা আর নেই, বুঝলি ? তারা হলুদকাটিতে আর আসে না। এ বাড়ি ঘর যা করেছি, তাও তারা দেখতে আসে নি। আসে নি, আসে নি। ডেকে এনে দেখাবার আমারই বা কী দায় পড়েছে, বল ?"

শিবতোষের বিস্ময়ের মাত্রা বাড়ছিল, মনের ভিতরে ততোই জটিলতার জট পাকিয়ে যাচ্ছিল। নিজের ছেলেদের সঙ্গেও জ্যাঠার সম্পর্ক ছিল না ? সে ভবতোষের গোঁফ দাড়ি কামানো নিটোল শক্ত মুখের দিকে তাকিয়েছিল, 'কেন ? বড়দা সেজদা আর এখানে আসে না কেন ? এত সুন্দর বাড়ি করেছো। 'তুমি এখন হলুদকাটির সত্যিকারের বাবুদের বাড়ির বাবু, বড়লোক মানুষ। যা করেছো, সবই তো পাবে বড়দা সেজদা। তবে তারা এখানে আসে না কেন ?'

"কে জানে।" ভবতোষ ঠোঁট বাঁকিয়ে, দু হাত শূন্যে তুলে নাড়িয়েছিলেন, "কে এলো আর না এলো, ওতে আমার আর কিছু যায় আসে না। আমিও কারোকে ডাকি নে। ছেলেদেরও ডাকি নে। মেয়েরাও আসে না। না এলো তো, বয়েই গেল। তা ছাড়া আমি আমার সম্পত্তি কাকে দিয়ে যাবো না যাবো, সেটা আমার ইচ্ছে। অবিশ্যি সব তো আর আমি নিজের বলে দাবি করতে পারি নে। তোদের ঘর জমির সব স্বত্ব কিনে নিয়েছি ; সেটা এক কথা। পৈতৃক সম্পত্তি হিসেবে। ভবেন রমেন দাবি তুলবে। কারণ, এ সম্পত্তি তো তাদের বাপের একার না। বাপ পিতামো'র সম্পত্তি। আমি মরে গেলে, ওরা কি আর বসে থাকবে ? তবে আমার দাবিটাই আগে। ব্যবসা যা করছি, তাতে কেউ হাত দিতে পারবে না। বাদবাকি

ব্যবস্থাও এমন করে যাবো, বাছাধনেরা আমার শ্রাদ্ধের আগে এলেও, কিছুই পাবে না।"

শিবতোষের চোখে, ভবতোষ যেন ক্রমেই কেমন অচেনা এক মানুষ হয়ে উঠছিলেন। ভবতোষের মেদবিহীন শক্ত খালি বুকে পৈতাটা ঝুলছিল। পরনে তাঁর সেই সামান্য ধুতি। শিবতোষের বুঝতে অসুবিধা হয় নি, ভবতোষের সঙ্গে তাঁর ছেলেমেয়েদের কোনো সম্পর্ক নেই। তার থেকেও বড় কথা, ছেলেদের সঙ্গে তাঁর কোথাও বড় রকমের বিরোধ বিবাদও ছিল। কী সেই বিরোধ বিবাদ?

শিবতোষকে চমকে দিয়ে তখনই একটি স্ত্রীলোক দালানের ভিতরে এসেছিল। বয়স তিরিশ বত্রিশের বেশি না। বিবাহিতা। ফরসা, স্বাস্থ্যবতী। নাকের নাকছাবির পাথরটা চমকালেও, তার গায়ে গলায় হাতে সোনার অলঙ্কার কিছু ছিল না। হাতে শাঁখা লোহা আর ঝুটা পলার লাল বালা। সিঁথেয় সিঁদুর। লাল পাড় শাড়ির ঘোমটা ছিল মাথার অর্ধেক পর্যন্ত। একটু লম্বা হলেও, চোখে মুখে একটি চটক ছিল। ঠোঁটে ছিল ঈষৎ হাসি। তাকিয়ে দেখেছিল শিবতোষের মুখের দিকে। তার দু হাতে ছিল দুটি কাঁচের গেলাস। একটিতে ছিল ধূমায়িত চা, বুঝতে অসুবিধা হয় নি। অন্য গেলাসটির জল ছিল কিঞ্চিৎ। ঘোলা। চায়ের গেলাসটা ভবতোষের সামনে টেবিলের ওপর রেখেছিল। অন্যটা শিবতোষের সামনে। বলেছিল, ঠাকুরকত্তা, এ গেলাসে লেবুর শরবত দিয়েছি।"

"শিবুর জন্যে তো?" ভবতোষ জিজ্ঞেস করেই ঘাড় ঝাঁকিয়েছিলেন, "ভালোই করেছো। অনেকটা পথ তেতে পুড়ে এসেছে। এখন একটু শরবতই ভালো লাগবে। পরে হাতে মুখে জল দিয়ে চা খেতে ইচ্ছে করলে, করে দিও।'

স্ত্রীলোকটি ঘাড় কাত করে সম্মতির ভঙ্গী করে চলে গিয়েছিল। যাবার আগে, চোখের কোণ দিয়ে আর একবার শিবতোষের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। ঠোঁটের কোণে ছিল টেপা হাসি। ভবতোষ স্ত্রীলোকটির কোনো পরিচয় দেন নি। তমালীকে দেখে কাজের মেয়ে বলেই কোনো কৌতূহল

আগে জাগে নি। কিন্তু—দ্বিতীয় সেই স্ত্রীলোকটিকে নিতান্তই পরিচারিকা মনে হয়নি। শিবতোষের মনে কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা জেগেছিল। ভেবে-ছিল, স্ত্রীলোকটি কোনো আত্মীয় হবে। ভবতোষ কিছুই বলেন নি।

ঘরের দরজার সামনে আরও দু জন এসে দাঁড়িয়েছিল। একজনের বয়স শিবতোষের মতোই হবে। ধুতির ওপরে ডোরাকাটা শার্ট পরা। গোঁফ জোড়া বেশ লম্বা সরু বাঁকানো। তেল চকচকে চুলে টেরি বাগানো। রোগা আর লম্বা চেহারার যুবকটির মুখও লম্বা। ঘোড়ামুখো কথাটা শিবতোষের মনে হয়েছিল। আর একজনের বয়স প্রায় পঞ্চাশ। ময়লা ধুতি পাঞ্জাবি পরা। চোখে মোটা কাঁচের চশমা। মাথায় ধূসর চুল। লোকটি রোগা বটে, কিন্তু খাটো। তাকে দেখাচ্ছিল ক্লান্ত। ভবতোষ মুখ তুলে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "কী রে মাধব, খবর কী ?"

"আজ্ঞে জ্যাঠামশাই, বাজারের খেলু ঘোষকে পঞ্চান্ন বস্তা পঙ্কজ দিতে বলেছিলেন।" সেই যুবকটি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিল। 'দিয়ে দিয়েছি। কিন্তু রাসু আর সুরেন তো এখনো সারের জন্য মাথা কুটছে। পীতাম্বরও পোকা মারার ওষুধ চাইছে। ওর এবার পাটের ফলনটা ভালোই। কিন্তু নগদ…"

ভবতোষ মাথা ঝাঁকিয়েছিলেন, 'সে তো জানি। রাসু আর সুরেনের সারের টাকা অনেক বাকি পড়েছে। এবার ওদের আউসও দেরিতে হচ্ছে। যা পছন্দ করি নে, তাই এরা করাবে, তারপরে নিজেরাই কপাল চাপড়াবে, আর আমাকে শাপমন্যি করবে। ঠিক আছে, মাল দে। মালের কে জি পিছু, সুদ সমেত ধানের মাপ লিখিয়ে, টিপ ছাপ নিয়ে নিস্ নগদ টাকা কিছু লিখিস নে। একটু দাঁড়িয়ে যা।" তিনি অন্য লোকটির দিকে ঘাড় ঝুঁকিয়ে তাকিয়েছিলেন, "কী খবর পঞ্চু ? যন্তর বিগড়োয় নি তো ?"

"আজ্ঞে না।" চশমা চোখে লোকটি মাধবের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল, "নিয়ামতের জমিতে সন্ধে পর্যন্ত মেশিন চললেই হবে। কিন্তু কালো বলছে, রাত দশটা অব্দি জল না হলে তার হবে না। দশটা অব্দি মেশিন চালাতে হলে, আরো ডিজেল চাই।"

ভবতোষ তাঁর চায়ের গেলাস শেষ করে মাথা ঝাঁকিয়েছিলেন, 'তা চাই।
চলো, দিচ্ছি। তোমরা দুজনেই একে দেখে রাখো। আমার ভাইপো শিবু।
শিবুও এখন থেকে, তোমাদের সঙ্গে কাজকর্ম দেখবে। আমিও আমার
কাজে নিয়ে ঘুরে ফিরে দেখাবো।"

শিবতোষ মাধব আর পঞ্চু, দুজনের দিকে তাকিয়েছিল। তারাও তাকিয়ে-
ছিল। মাধবের গোঁফে ঈষৎ হাসি ফুটেছিল। পঞ্চু একটু গদ্‌গদ হয়ে বলে-
ছিল, "ভাইপো ? বাহ্, খুব ভালো ! তবু একজন নিজের লোক পেয়েছেন।
তা এ ভাইপো…"

"সে সব পরে শুনে নিও। ভবতোষ বাঁ হাত তুলে ঝাড়া দিয়েছিলেন। মুখ
ফিরিয়ে তাকিয়ে ছিলেন শিবতোষের দিকে, 'পঞ্চু হলো আমাদের রাধা-
কান্ত জীউর পূজুরী গজাননের ছোট ভাই।"

শিবতোষের মনে সেই মুহূর্তে একটা পুরনো স্মৃতি আর মুখ ফসকিয়ে
উঠেছিল, "ওহ্, সেই আমাদের গজানন খুড়ো ? এখনো সে-ই রাধাকান্ত-
জীউর পূজুরী আছে ? পঞ্চু খুড়োকেও তখন চিনতাম। তবে পঞ্চু খুড়োর
চেহারাটা একদম বদলে গেছে।"

"আর এই মাধব হলো সদ্‌গোপ পাড়ার ছেলে, মাধব ঘোষ।" ভবতোষ
শিবতোষের কথার মাঝেই বলে উঠেছিলেন, "খুব চৌকস চড়কো ছেলে।
সব দিকেই বেশ কাজের। ঐ যে দেখলি ধীরুকে ? এই মাধবের মতন
ছেলে হচ্ছে, ধীরুদের ওষুধ।"

শিবতোষ দেখেছিল, মাধবের চোখেমুখে একটা ঝলক লেগে গিয়েছিল।
কিন্তু যেন লজ্জা পেয়ে হেসে বলেছিল, 'ওষুধ আর কী জ্যাঠামশাই।
ধীরু লাল রঙ নিয়ে খেলছে। আমি তিন রঙ। তুমি সোজা তো আমিও
সোজা। তুমি বাঁকা তো আমিও বাঁকা।"

শিবতোষ রঙের সংকেতটা বুঝতে পেরেছিল। সেই রাজনীতি। যেখানেই
যাবে সেখানেই পাবে। মাধবের আসল ভূমিকাটা বোঝা গিয়েছিল। শিব-
তোষ চিনি মেশানো লেবুর জল খেয়ে গলা ভেজালেও, তার জলের তৃষ্ণা
মেটে নি। ভবতোষের সঙ্গে সেও উঠে দাঁড়িয়েছিল। 'একটু জল খাবো।"

"মাধব, খাবার জল দিতে বল্ তো।" ভবতোষ হাত বাড়িয়ে বাইরের দিকে দেখিয়েছিলেন।

মাধব তাখনই শান বাঁধানো উঠোনের দক্ষিণে, পুবের দিকের ঘরগুলোর কাছে গিয়েছিল। কাকে কী বলেছিল। শিবতোষ দেখেছিল, সেই ফর্সা লালপাড় শাড়ি পরা স্ত্রীলোকটি। হাতে তার বড় একটা ঝকঝকে মাজা কাঁসার গেলাস। তখন মাথার ঘোমটা একটু বেশি টানা ছিল।

সে দালানের মধ্যে ঢুকে, কাঁসার গেলাস টেবিলের ওপর রেখে চলে গিয়েছিল। কিন্তু তখন একবারও শিবতোষের দিকে চোখ তুলে দেখে নি। শিবতোষ ঢকঢক করে গেলাস শূন্য করে, তৃপ্তি পেয়েছিল। তারপর ভবতোষের সঙ্গে ঘরের ভিতর দিয়ে, আর এক দিকে দালানে গিয়েছিল। পিছনে পিছনে এসেছিল মাধব আর পঞ্চু। দালান ছিল অন্ধকার। মাধব এগিয়ে গিয়ে একটা জানলার পাল্লা খুলে দিয়েছিল।

শিবতোষ সেই দালানের মধ্যে ঢুকেই ডিজেলের গন্ধ পেয়েছিল। জানলার পাল্লা খুলতেই, দালানের অনেকটা অংশ দেখা যাচ্ছিল। একটা শ্যালো মেশিন খোলা। মোটা সরু তারপলিনের পাইপ, গোটা কয়েক পিপে। উত্তরের অংশে অনেকগুলো বস্তা বোধ হয় ছিল। ভবতোষ পঞ্চুকে হুকুম করেছিলেন, 'দু লিটার মেপে নিয়ে যাও। এতোটা লাগবে না। তবে কালোর ব্যাপারে তো। মদ গিলে, রাত্তির দশটায় বলবে, আরো দু ঘণ্টা মেশিন চালাতে হবে।'

পঞ্চু মেপে একটা টিনে দু লিটার ডিজেল তুলে নিয়েছিল। ভবতোষ দেখেছিলেন। মাধবও লক্ষ্য রেখেছিল। শিবতোষের মনে হচ্ছিল, দালানটা একটা ছোটখাটো কারখানার মতো। যদিও, সবটা ওর চোখেই পড়ে নি। পঞ্চুকে ডিজেল দেবার পরে, ভবতোষ দক্ষিণে এগিয়ে একটা কাঠের পার্টিশনের দরজা খুলেছিলেন। কিন্তু অন্ধকারে পার্টিশনের ওপর কিছুই দেখা যায় নি। সে সকলের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। ভবতোষের নির্দেশে পঞ্চু ডিজেল নিয়ে চলে গিয়েছিল। ভবতোষ মাধবসহ শিবতোষকে নিয়ে দক্ষিণের বাগানের বাইরে গিয়েছিলেন। শিবতোষ ধান ঝাড়ার

জায়গাটা চিনতে পেরেছিল। কিন্তু ধান ঝাড়া জায়গাটার পুবে পাকা দেওয়াল, টিনের চালা ঘরটা দেখে অবাক হয়েছিল। ওটা নতুন তৈরি সার বিক্রির ঘর। বেশ উঁচু বাঁধানো দাওয়া। সেই দাওয়ায় বেশ কিছু লোকের ভিড় ছিল। কিন্তু আবার একটা লাগোয়া টিনের শেড দেখে, শিবতোষ অবাক হয়েই দেখেছিল, বাড়ির ভিতরের বেতের তৈরি ধানের গোলা ছাড়াও, টিনের শেডের ভিতরেও ধান আর পাট রাখা হতো।

বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমে এসেছিল। ভবতোষ শিবতোষকে নিয়ে দক্ষিণের বাগানের দরজা দিয়ে বাড়ির উঠোনে ঢুকেছিলেন। তাঁর গলা খাকারির শব্দ পেয়েই, সেই স্ত্রীলোকটি বেরিয়ে এসেছিল। উঠোন তখন ভেজা না হলেও, অনেকটা ঠাণ্ডা। লোটনকে বসে থাকতে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল সে ইঁদারা থেকে উঠোনে জল ঢেলেছে। ভবতোষকে দেখেও সে উঠে দাঁড়ায় নি। ভবতোষ সেই স্ত্রীলোকটির দিকে তাকিয়েছিলেন, 'আমি আর এখন ওপরে যাবো না। পুজোর কাপড় তো নিচেই আছে। তুমি আমাকে গা ধোয়ার জল তুলে দাও। আমি ঠাকুর দালানে আহ্নিকটা সেরে নেবো।'

শিবতোষ দেখেছিল, দালানের টেবিলের ওপরে একটা হ্যারিকেন জ্বলছে। উঠোনের পুবের ঘরেও হ্যারিকেন জ্বলছিল। আর সেদিকেই বাঁধানো তুলসীতলার নিচের কুলুঙ্গিতে প্রদীপ জ্বলছিল। সে ওপরের দিকে তাকিয়েছিল। দু দিকের দালানের গ্রিল ঘেরা বারান্দার, ডান দিকে, আর মাঝখানের ঘরের খোলা জানলার ভিতরে অল্প আলোর আভাস দেখা যাচ্ছিল।

"শিবু, তুই এবার ওপরে যা।" ভবতোষ নিজেও ওপরের দিকে তাকিয়েছিলেন, অনেক, "অনেক ঘুরেছিস। এবার বিশ্রাম কর। একটা হ্যারিকেন নে। একলা ওপরে যেতে পারবি তো!"

শিবতোষের তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে গিয়েছিল, ডান দিকের দালানের ভিতরে ঢুকেই বাঁ দিকে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। সেই দালানেই ভবতোষের শ্যালো মেশিন ডিজেলের পিপে ইত্যাদি অনেক কিছু রয়েছে। আর কাঠের পার্টিশনের আড়ালেই রয়েছে সেই সিঁড়ি। সে বাঁ দিকের দালানের দিকে

তাকিয়ে দেখছিল, বলেছিল, "পারবো। বাতি নিয়ে যাবার দরকার নেই। লোটন সিঁড়ি পর্যন্ত আলো দেখালেই হবে।"
"সিঁড়ির কাছে বাতি রাখা আছে।" লোটন বলেছিল, "ভেতরে সিঁড়ির দিকের দরজাও আমি খুলে রেখেছি। বাঁ দিকের দালান দিয়ে ঘরের মাঝখান ··"
ভবতোষের কাঁপানো স্বর শোনা গিয়েছিল। "বসে না বলে নিজে গিয়ে এগিয়ে দিয়ে আসা যায় না?"
লোটন বিনা বাক্যে উঠে এসেছিল। শিবতোষ বাঁ দিকের দালানে ঢুকে-ছিল। ডান দিকের দালানের সামনের দরজা খোলা থাকলে, দোতলায় সহজেই যাওয়া যেতো। কিন্তু সেদিকের দালানের দরজা যে কেন ভিতর থেকে বন্ধ, তা বুঝতে পারে নি। লোটন বাঁ দিকের দালানের গোল টেবিল থেকে হ্যারিকেন হাতে তুলে নিয়েছিল। মাঝখানের ঘরে আলো দেখিয়ে, শিবতোষকে অন্য দিকের দালানের সিঁড়ির সামনে পৌঁছে দিয়েছিল। সিঁড়ির এক কোণে একটি হ্যারিকেন জ্বলছিল। লোটন দাঁড়িয়েছিল নিচেই।
শিবতোষ লোটনকে একবার দেখে, সিঁড়িতে পা বাড়িয়েছিল, "লোটন, তুমি যাও। আমি এখন সব দেখতে পাচ্ছি।"
লোটন ফিরে গিয়েছিল। শিবতোষ সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে উঠতে আরতির কথাই বিশেষ করে ভাবছিল। এ বাড়িতে ঢুকে আরতিকে অনেকক্ষণ দেখে নি। আরতিও কি মনে মনে শিবতোষের জন্য ব্যস্ত হয় নি? হয়তো রাগও হয়েছিল। বড় তরফের ভিতরে ঢুকে তার মনটা যেন কেমন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। নিচের তলাটা অচেনা লেগেছিল। দোতলাটা আরও কতো অচেনা লাগবে। তখনও জানতো না কিন্তু আরতির সঙ্গে দেখা হবে, সেটাই ছিল অশান্তি আর উদ্বেগের অবসান। আরতি ছাড়া সেই মুহূর্তে তার আর কারোকেই আপনজন বলে মনে হচ্ছিল না। নিজের জন্মভিটায় ঢুকেও নিজের জ্যাঠার আশ্রয় পেয়েও। মনে হচ্ছিল, কোন্ এক অচেনা অন্দরে সে ঢুকে পড়েছে।

শিবতোষ সিঁড়ি ভেঙে যতোই ওপরে উঠছিল একটা সুগন্ধ তার ঘ্রাণে ভেসে আসছিল। তীব্র না, কিন্তু মিষ্টি গন্ধ। প্রাণটা যে কেবল জুড়িয়ে যায়, তাও না। মদির গন্ধটা যেন সব সময়ে ঘ্রাণে ধরে রাখতে ইচ্ছা করছিল। কিসের গন্ধ।

শিবতোষ দোতলার দালানে উঠে দাঁড়িয়েছিল। তার মুখ ছিল তখন উত্তর দিকে। উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ দালান ছিল অন্ধকার। দালানের সব জানলাই বন্ধ ছিল। সিঁড়ি যেখানে শেষ তার বাঁ দিক দিয়েই গ্রিলঘেরা সেই নতুন বারান্দা। শিবতোষ সে দিকে তাকিয়ে দেখেছিল। কোনো আলো বা কেউ সেখানে ছিল না। সেদিকে পা বাড়াবার আগে, দক্ষিণে গ্রিল-ঘেরা বারান্দায় ঠিন্ ঠিন্ শব্দ বেজে উঠেছিল। শিবতোষ মুখ ফিরিয়ে তাকিয়েছিল। কারোকে দেখতে পায় নি। সে এগিয়ে গিয়ে বাঁ দিকের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়েছিল। দালান থেকে ঘরের ভিতরে কারোকে চোখে পড়ে নি। কিন্তু সেই সুন্দর মিষ্টি মদির গন্ধটা যেন ঘরের ভিতর থেকেই ভেসে আসছিল। তখন, তুপুর বা বিকালের মতো গাছপালা স্থির ছিল না। একটানা না হলেও দক্ষিণ থেকে মাঝে মাঝে বাতাস ঝাপটা দিয়ে যাচ্ছিল।

শিবতোষ সেই ঘরে ঢোকবার আগে থমকে দাঁড়িয়েছিল। বুঝতে পারছিল না, আরতি কোথায়? কোন্ ঘরে? তমালীই বা কোথায়? তমালী সেই যে আরতিকে নিয়ে ভিতরে চলে এসেছিল, তারপর থেকে তুজনের কারোকেই শিবতোষ নিচে দেখতে পায় নি। দোতলায় আরতি আর তমালী ছাড়া কেউ থাকতে পারে, শিবতোষের মনে হয় নি। সে ঘরের চৌকাঠে পা দিয়ে ভিতরে উঁকি দিয়ে যে দিকে বাতি জ্বলছিল সেদিকে তাকিয়েছিল। তাকিয়েই লজ্জায় ও সংকোচে চমকে উঠে পিছন ফিরে বেরিয়ে আসতে যাচ্ছিল। অথচ বেরিয়ে আসতে পারে নি।

ঘরের দক্ষিণের দেওয়ালের কাছে উজ্জ্বল আলো আড়াল করে দাঁড়িয়েছিল একটি রমণী মূর্তি। সামনের দিকে সেই মূর্তি একেবারে অস্পষ্ট দেখাচ্ছিল না। অথচ শিবতোষ চিনতে পারছিল না। মূর্তির গায়ে ছিল অতি মিহি

সাদা জমির শাড়ি, যার গাঢ় নীল বা কালো পাড়ের মাঝখানে সোনালী ডোরা চিকচিক করছিল। তার কোমরের নিচে কোনো অন্তর্বাস ছিল না। উজ্জ্বল আলোয় সেই পাতলা মিহি সাদা জমির ভিতর থেকে রমণী মূর্তির সুগঠিত ঊরু জংঘা ও নিম্নাঙ্গের মধ্যস্থল পর্যন্ত যেন অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। গায়ে তার জামা ছিল না। সামনের দিকে ছায়া পড়লেও, শাড়ির অতি মিহি আঁচলে ঢাকা অনম্র বুক জোড়া প্রায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। তার ডান দিকে সুগঠিত কাঁধ ছিল খোলা। বাঁ দিকের কাঁধের ওপারে শাড়ির সেই সোনালি ডোরা গাঢ় নীল বা কালো পাড় আঁচল লুটোচ্ছিল। বাঁ হাতের কিছুটা ঢাকা পড়েছিল শাড়িতে। ডান হাত ছিল অনাবৃত। মাথায় ঘোমটা ছিল না। রাশিকৃত কালো দীর্ঘ কেশ এলো হয়ে ছড়িয়ে ছিল পিঠের দিকে। মূর্তির প্রতিমার মতো ফর্সা মুখে ও ঠোঁটে ছিল যেন ঈষৎ হাসি। কালো আয়ত চোখ ছিল শিবতোষের দিকে।

শিবতোষের ঘ্রাণে সেই মদির গন্ধ বাতাসের ঝাপটায় আরও নিবিড় হয়ে আসছিল। আর নানা সংশয় সন্দেহের মধ্যেও, তার বারেবারেই মনে হয়েছিল ঐ মূর্তি আরতির! তাই সে ফিরতে গিয়েও ফিরতে পারে নি। সে অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞেস করেছিল, "কে? কে ওখানে?"

"আমি। আমি গো! আরতির তরল স্বরে যেন খুশির ঝঙ্কার বেজে উঠেছিল। সে দরজার কাছে কয়েক পা এগিয়ে এসেছিল, 'তুমি আমাকে চিনতে পারছ না?'

একটা অজ্ঞাত ভয়ে শিবতোষের শিরদাঁড়া কেঁপে উঠেছিল। কী যে সেই অজ্ঞাত ভয়, সে কিছু বুঝতে পারে নি। বলেছিল 'না ছোটবউ আমি চিনতে পারি নি।'

শিবতোষ আরতিকে ছোটবউ বলে ডাকতো। কারণ বংশগত দিক থেকে শিবতোষের স্ত্রী হিসাবে আরতি পরিবারে ছোট ছেলের বউ। আরতি অবাক হলেও খিলখিল করে হেসে একেবারে দরজার সামনে শিবতোষের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার সারা শরীর থেকে সেই মদির গন্ধ শিব-তোষের নিশ্বাসের ভিতর দিয়ে মস্তিষ্কে পৌঁছে ছিল। সে তখনও আরতির

দিকে অবাক উৎকণ্ঠিত চোখে তাকিয়েছিল। সাত বছর ধরে দেখা, আঠারো মাসের বিবাহিতা স্ত্রীকে তার অচেনা লাগছিল। তারই নিজের জন্ম ভিটায় তার বাবা পিতামহর ভিটায়। আরতির বুকের অর্ধেক খসে পড়েছিল। তুলে দেবার জন্য একটুও ব্যস্ত হয় নি। প্রায় শিবতোষের গায়ে ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল। খিলখিল হাসির মধ্যে কৌতুক মেশানো বিস্ময় ছিল, "কেন গো, আমাকে চিনতে পারছ না কেন?"

শিবতোষ কোনো জবাব দিতে পারছিল না। আরতি শিবতোষের হাত ধরে ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। এই যে দেখছ শাড়িটা এটা তমালী আমাকে বের করে দিয়েছে। ওপরে কী সুন্দর চানের ঘর। ঠাণ্ডা জলে খুব মিষ্টি গন্ধ সাবান দিয়ে চান করেছি। নেবুর সরবত খেয়েছি। আর জান তো? জ্যাঠামশাই তোমার আর আমার জন্য এ ঘরটা নাকি দিয়েছেন। ঐ যে দেখছ বাঁয়ে বন্ধ দরজা? ওটা জ্যাঠামশায়ের ঘর। এই ঘরের এই খাট বিছানা সব আমাদের। কী ভাগ্যি! নিজের ঘরে ফেরার মতলবটা তোমার মাথায় এসেছিল? কিন্তু তোমাকে এরকম দেখাচ্ছে না কি তোমাকেই ভূতে পেয়েছে?"

শিবতোষও তাই বোঝাবার চেষ্টা করছিল, ঠাকুরদালান থেকে রাধাকান্তর পূজার ঘণ্টার শব্দ ভেসে এসেছিল।

শিবতোষ হলুদকাটিতে নিজের জন্ম ভিটায় প্রত্যাবর্তনের পর দু বছর অতিক্রান্ত। শিবতোষের নিজের সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন নেই। ভবতোষের আশ্রয়ে আসার তিন মাস পরে, সে একদিন গভীর রাত্রে আরতিকে বিছানায় দেখতে পায় নি। অথচ বাইরে যাবার দরজা ভিতর থেকে বন্ধই ছিল। সে জেগে থেকে দেখেছিল আরতি শেষ রাত্রে ভবতোষের ঘরের দরজা খুলে শিবতোষের পাশে এসে শুয়েছিল। ঘটনার সেই অশরীরী সত্তা আর অজ্ঞাত ভয়টা তখন আস্তে আস্তে পরিচিত হয়ে উঠেছিল। মনের দোদুল্যমানতা হ্রাস পেয়ে তিন মাস পর থেকে দু বছরে একটা স্থির জায়-গায় এসে পৌঁছেছে।

আরতি এখন ভবতোষের অঙ্কশায়িনী। সারা গায়ে তার সোনার অলখ। তার সাজসজ্জা এখন ভিন্ন। প্রচুর তার বিত্ত। সে নির্বাক বিস্মিত অপলক চক্ষু শিবতোষের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কোনো দিন কোনো জবাব দেয় নি। ভবতোষ কাজের কথা ছাড়া কিছু বলেন নি। শিবতোষ নিজে আরতিকে কোনো দিন কোনো কথা জিজ্ঞেস করে নি। সে দেখেছিল আরতি প্রতি-দিন একটু একটু করে ভবতোষের ঘরের দিকে স্থায়িভাবে পা বাড়িয়েছিল। যেন কোনো এক অলৌকিক শক্তির আকর্ষণে সে সম্মোহিত হয়ে চলে গিয়েছিল। শিবতোষের কোনো অস্তিত্বই যেন তার কছে ছিল না।

এ রকম ক্ষেত্রে শিবতোষের মতো পুরুষের মনে নিজের পৌরুষের বিষয়ে প্রশ্ন জাগাই স্বাভাবিক। কিন্তু নিজের পৌরুষ সম্পর্কে শিবতোষের মনে কোনো দ্বিধা সন্দেহ নেই। তার কারণ এই নয় আরতির অবর্তমানে তমালী বা সেই স্ত্রীলোকটি রাত্রে তার অঙ্কশায়িনী হয়েছে, তাদের সুখ ও সোহাগ প্রকাশ করেছে, আর শিবতোষ গভীর অনুতাপে তাদের বিদায় দিয়েছে। বয়সের অনুপাতে তার জীবন্ত শক্তির স্বাভাবিকতা কেনই বা প্রশ্নের সম্মুখীন হবে? প্রভূত জৈব শক্তি আর যাই হোক, পুরুষত্বের বড় প্রমাণ না। কিন্তু কোনো পুরুষের মধ্যে যদি জৈব শক্তির প্রাধান্য আর আসক্তি থাকে, মানুষ নিশ্চিত রূপে বলতে পারে না, সেই পুরুষ সংসারের ক্ষতিসাধন করছে।

ভবতোষ অমিতশক্তির পুরুষ নন। কিন্তু তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাঁর শক্তির উৎস। তিনি পরিশ্রমী মিতাহারী, কোনো রকম নেশা করেন না। বাইরে তিনি ঈশ্বর বিশ্বাসী কিন্তু ঘোর নাস্তিক। বিত্ত সম্পদকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান করেন। শত্রুকে জয় করার শক্তি ও বুদ্ধি অপরিসীম। রমণীর যৌবন ও যৌনতায় তাঁর আকর্ষণ ও আসক্তি অকৃত্রিম।

রাত্রি গভীর। বাইরে স্তব্ধতা। শিবতোষ নিচের ঘরে শুয়ে আছে। যখন বুঝতে পারলো, তমালী আর সেই স্ত্রীলোকটি সব আশা ত্যাগ করে আজ রাত্রের মতো শুতে গিয়েছে। সে উঠে বসলো। নিজের জন্মভিটে সে আজ ত্যাগ করবে। একটা কথা তার অনেক বার মনে হয়েছে। সে কি আরতি-

কে ভালবাসে নি ? পাল্টা প্রশ্ন মনে এসেছে, ভালবাসা কী ? সে নিশ্চয়ই চিরকাল আরতিকে নিয়ে জীবন কাটাতে চেয়েছিল। সেটা যদি ভালবাসা হয়, তা হলে আরতিকে সে গভীর ভাবেই ভালবাসতো। কিন্তু আজ এই ভিটা ছেড়ে যাবার প্রাক্কালে সে নিশ্চিত বুঝতে পারছে, তাকে যেতে হবে আর একজন আরতির সন্ধানে। সে কোনো কালেই তমালী বা সেই স্ত্রীলোকটির মতো রমনীদের সঙ্গে যৌবন ও যৌনকাঙ্ক্ষা ভোগ ও মেটাবার কথা ভাবে নি। একমাত্র এই অনুভূতির মধ্য দিয়েই সেই পাপ ও অনাচার বোধ নিয়ে আজ এই ভিটা ত্যাগ করছে !

ভবতোষের জীবনে সব আছে, যা মানুষের মধ্যে থাকে। যা নেই তা হলো পাপবোধ। শিবতোষের মনে হয়, পৃথিবীর সকল শক্তিমানদের এই বোধহীনতাই বড় বৈশিষ্ট্য। কেবল একটা কথাই সে বুঝতে পারে নি। আরতি কেমন করে সেই পাপবোধ থেকে মুক্তি পেলো ?

শিবতোষের এবারের গৃহত্যাগে সেটাও সন্ধানের বিষয়।

তিন জন বসেছিলেন একটি সিমেন্ট-ঢালাই-করা বেঞ্চের ওপরে। শরতকালের বিকেল। বিরাট উদ্যান—হ্যাঁ, উদ্যানই। নিতান্ত মাঠ বা কলকাতার ভিতরে, ঘাস-লুপ্ত ছালচামড়া বেরিয়ে পড়া, রেলিং-ভাঙা হতশ্রী পার্ক নয়। বিশাল সবুজ উদ্যান, পাঁচিল দিয়ে সীমানাঘেরা চার দিক। ঝাউ দেবদারু গাছ চার দিকে। সূর্য তখনো অস্ত যায় নি। নীল আকাশে সাদা মেঘের দল যেন, রাশি রাশি সাদা রঙ গাভীর মতো আলস্যে চরে বেড়াচ্ছে। বিকেলের পড়ন্ত বেলার আলো লেগে, সাদা মেঘের রঙ বদলে যাচ্ছে। উদ্যানে নিবিড় ছায়ার ফাঁকে ফাঁকে মেঘ রোদের খেলা চলছে। আর সারা উদ্যান জুড়ে খেলে বেড়াচ্ছে শিশুর দল। উদ্যানে জায়গায় জায়গায় নানা ফুলের মতোই, রঙিন শিশুরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে, হাসি আর উল্লাসে, কচি গলার স্বরে মুখরিত করে তুলছে সবুজ প্রকৃতিকে। প্রকৃতি স্বয়ং যেন ওদের সঙ্গে খেলায় মেতেছে।

তিন জনেই, শিশুদের খেলা দেখছিলেন। মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলেন। যিনি সব থেকে বেশি বয়স্ক, তিনি একদা ছিলেন ডাক-সাইটে রাজনৈতিক নেতা। এখন রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ অবসর নিয়েছেন। বই তাঁর এখন সব থেকে বড় সঙ্গী। পড়াশোনা করেন নানা বিষয়ে। জীবনের অতীত বিষয়ে কখনো কখনো কিছু লেখেন। বেশির ভাগ রাজ-নীতিকের পক্ষেই সম্ভব নয়, তিনি তাঁর জীবনে সেটাই সম্ভব করে তুলেছেন। রাজনীতি একেবারে ত্যাগ করেছেন। সেই কারণেই রাজনীতিকরা তাঁকে সম্ভ্রম করেন। সম্মান করেন সাধারণ মানুষ আর তাঁর পরিচিত জনেরা। কারণ সবাই জানে, তিনি রাজনীতি নিয়ে থাকলে, দিল্লিতে বেশ ভালো ভাবেই গদীয়ান থাকতে পারতেন না। অনেক ছড়ি ঘোরাতে পারতেন, অনেকে তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে থাকত। ভোগ করতে পারতেন

সচ্ছলতা, স্বাচ্ছন্দ্য। আবশ্যি টেনশন নিশ্চয়ই থাকত। কিন্তু জীবনটা তো বহে যেত ঝড়ের বেগে। তিনি সে-সব মোহ ত্যাগ করেছেন। তবু যে-জীবনটা কাটিয়ে এসেছেন, সেই উত্তাল তরঙ্গায়িত জীবন, ফেনিলোচ্ছল সেই জীবন প্রতিদিন খবরের কাগজে তাঁর ছবি আর বক্তব্য নিয়ে আছড়ে পড়ত প্রতিদিন। তা কী করেই বা একেবারে ভুলে থাকবেন। কথাবার্তায়, পুরনো দিনের কথা এসে পড়ে অনিবার্য ভাবেই। তাঁর কাছে যাঁরা যান, তাঁদেরও সেই-সব দিন সম্পর্কে প্রচুর কৌতূহল, উৎসুক জিজ্ঞাসা। নাম তাঁর মহিমময় মুখোপাধ্যায়। মাথার চুল সাদা। গোঁফ দাড়ি কামানো মুখে জরার ছাপ পড়ে নি। সত্তর উত্তীর্ণ শরীরে এখনো যেন তেমন বার্ধক্যের ছোঁয়া লাগে নি। চোখে মোটা লেন্সের চশমা।

বাকি দুজন প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় পৌঁছেছেন। একজন ছিলেন সরকারি বড় কর্মকর্তা। রাজনৈতিক বহু ঘটনার সঙ্গে তাঁর নাম উচ্চারিত হতো। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শাসনের সময়ে, একজন ঝানু বুরোক্র্যাট হিসাবে তিনি অনায়াসেই নিজের কাজ করেছেন। অনেক দলের অনেক গোপন খবর তাঁর নখদর্পণে। কিন্তু কোথায় মুখ খুলতে হবে, আর হবে না. তা তিনি বেশ ভালোই জানতেন। জানতেই হতো। যথেষ্ট সুনামের সঙ্গেই তিনি অবসর নিয়েছেন। তাঁর চুলও ধূসর, বয়সের তুলনায় একটু বা বেশিই। পরিচ্ছন্ন মুখ। চশমার লেন্সের মধ্যে তাঁর চোখ দুটি এখনো উজ্জ্বল। দোহারা দীর্ঘ শরীর বেশ শক্ত। মহিমময়ের বিপরীত, খাদি ধুতি পাঞ্জাবির পরিবর্তে, তিনি পরে আছেন সাদা ট্রাউজার, সাদা হাওয়াই শার্ট। নাম অবনীশ রায়। বয়স ষাট অতিক্রান্ত।

তৃতীয় ব্যক্তি একটি বড় পত্রিকায় চাকরি করেছেন। অবসর নেওয়াটা তাঁর ইচ্ছামতোই হয়েছে। মালিক কর্তারা তাঁকে ছাড়তে চান নি। তিনি নিজেই অবসর নিয়েছেন। কিন্তু এটা তাঁর আসল পরিচয় নয়। তাঁর আসল পরিচয়, তিনি একজন কবি। জনপ্রিয় তো বটেই, এখনো তাঁর অসংখ্য পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে, তরুণ-তরুণীর সংখ্যা বিস্তর। বিতর্কিত কবি তিনি কোনো কালেই ছিলেন না, এখনো নন। তবে ব্যক্তিচরিত্র

হিসাবে তিনি কিছুটা বিতর্কিত। তাঁর পরিচিত বন্ধুজনদের, ভক্তদের কাছেই তিনি বিতর্কিত ব্যক্তি। সেটা তিনি নিজেও জানেন, আর তাঁর কবিতার গম্ভীর্য গম্ভীরতা বেদনা বিস্ময়, কখনো ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ঝলকানো, যা সবাইকে অভিভূত মুগ্ধ করে, তথাপি কেন মানুষ হিসাবে তাঁকে কেউ কেউ কৃত্রিম মনে করে। মনে করে, কবি সত্তা ব্যতিরেকেও কিছু তুচ্ছ অ্যাম-বিশনে তিনি ভোগেন। প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় এসে, তিনি এ-সবই জানেন, বোঝেন, আর তাঁর দুঃখটাও বোধহয় সেইখানে, যে তাঁকে অনেক ঘনিষ্ঠরা যথার্থ বুঝতে পারেন না। তবে তাঁর বড় সান্ত্বনা, "প্রতিষ্ঠিত কবি হিসাবে তিনি এখনো পাঠকের বড় জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন। আবার এটাই তাঁর সব থেকে বড় সংশয়, শেষ জীবন পর্যন্ত এই স্থায়িত্বের দাগ তিনি রেখে যেতে পারবেন কিনা। এই সংশয়ের মধ্যে স্বভাবতই থাকে একটা মানসিক অস্থিরতা। চাকরি থেকে অবসর নিয়েও, কেবল কাব্যচর্চার মধ্যে তিনি এই অস্থিরতার হাত থেকে মুক্তি পাচ্ছেন না। বয়স তাঁর ষাট অতিক্রান্ত, ঝরনার জলের মতো নিরন্তর বাহিত। ঝরনার ধারা তো কখনো পিছন ফেরে না, সে বহেই চলে। চলেছে। কিন্তু তাঁর আজানু-লম্বিত দীর্ঘ দেহে, মেদের সামান্য স্পর্শও নেই। ঋজু, শক্ত, স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি, মাথার চুল ধূসর। মুখাবয়বে সামান্যতম জরার চিহ্ন পড়ে নি। চশমার লেন্সের আড়ালে তাঁর আয়ত চোখ দুটি এখনো স্বপ্নিল। নাম ধৃতীন্দ্র বাগচি। ধুতির ওপরে পরেছেন খাদির গেরুয়া পাঞ্জাবি।

'এটাকেই আজকাল আমার পরম ভাগ্য বলে মনে হয়। মহিময় উদ্যানে ক্রীড়ারত বালক-বালিকাদের দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে বললেন, 'খোলা আকাশের নিচে বসে ওদের এই ছুটোছুটি খেলা দেখছি। মনে কোনো টেনশন নেই, অথচ একটা ভারি ব্যাকুলতা নিয়ে কাটে সারাদিন।'
অবনীশ এখনো তাঁর চাকরিজীবনের সবটুকু ছাড়িয়ে আসতে পারেন নি। তাই মহিময়কে এখনো 'স্যার' সম্বোধন করেন। যা মহিমময় মোটেই পছন্দ করেন না। কিন্তু অবনীশকে বোঝেন, বাধা দেন না। অবনীশ

জিজ্ঞেস করলেন, 'ব্যাকুলতাটা স্যার কিসের ?'

'বিকেলের ব্যাকুলতা।' মহিময় স্নিগ্ধ হেসে বললেন, 'সারাদিন পড়ি, কিছু লিখি, লোকজন এলে কথা বলি। কিন্তু যেই দুপুর গড়িয়ে যায়, এখানে আসার জন্য মনটা আকুলি-বিকুলি করতে থাকে। কখন এসে এখানে বসব, এই সবুজের মেলায়, আর এই কচিদের মেলায়। কী ভাবে কথাটা বোঝাব, আমার ভাষায় কুলোয় না।'

ধৃতীন্দ্র তাঁর ভরাট সুরেলা স্বরে বললেন, "মহিমদা, ভাষার হয়তো আমারও কুলোবে না। তবু বলতে পারি, এ যেন আপনার তৃষ্ণার জল। চাতকের মতোই ছুটে আসেন, আর যতক্ষণ থাকেন, ততক্ষণ গণ্ডূষে গণ্ডূষে পান করেন।'

'ঠিক, ধৃতীন, তুমি একেবারে আমার মনের কথাটা বলেছ।' মহিমময়, প্রসন্ন হেসে বললেন. 'চাতকের মতোই ছুটে আসি, আর সত্যি গণ্ডূষে গণ্ডূষে পান করি। কিন্তু কী পান করি, সেটা তো তুমি বললে না ?'

ধৃতীন বললেন,'জীবনের মাধুর্য। বিশ্বনিখিলের প্রাণ চঞ্চলতার লীলাখেলা চলছে আমাদের চোখের সামনে। তারই সুধা আপনি-আমি-মিঃ রায় পান করছি।'

'অপূর্ব।' অবনীশ রায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, 'ধৃতীনবাবুর কথাগুলো শুনলে মনে হয়, যেন কবিতাই পড়ছি। অথচ এ তো আমাদের মনেরই কথা।'

মহিমময় বললেন, 'নিশ্চয়ই। কবিসত্তার এটাই তো বড় কথা। আমরা আমাদের অনুভূতিকে ভাষায় ফুটিয়ে তুলতে পারি নে। কিন্তু কবি যখন বলেন, তখন মনে হয়, এ তো সেই আমারই কথা। বেশ ভালো বলেছ ধৃতীন, বিশ্বনিখিলের প্রাণচঞ্চলতার লীলাখেলা।'

মহিমময় একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। কেউ কোনো কথা বললেন না। সামনের দিকে তাকিয়ে, শিশুদের খেলা দেখতে লাগলেন। নীল আকাশের গায়ে, চলমান সাদা গাভীগুলোর গায়ে ঈষৎ লালের আভা লাগছে। কচিদের কাঁচা স্বরে যেন গান বাজছে।

কী দুরন্ত জীবনই না কাটিয়ে এসেছি। তেমন অসামান্য মানুষ তো ছিলাম না। জীবনটা তো শুরু করেছিলাম—বা শুরু হয়েছিল খুবই সাধারণভাবে। স্বদেশী আন্দোলনে এক সময়ে, বাংলার আর দশজন যুবকের মতোই ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। চাকরি করতাম সামান্য। লেখাপড়াও এমন কিছু করি নি। এন্ট্রান্স পাস করেই চাকরিতে ঢুকেছিলাম। অবশ্য অর্থাভাব তেমন একটা কখনো বোধ করি নি। কারণ গ্রামে পৈতৃক ভিটা আর কিছু জমিজমা ছিল। বিয়েও করেছিলাম, মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রথাসম্মত ব্যবস্থায়।

না, বিবাহিত জীবন নিয়ে কখনো তেমন রোমান্স ছিল না, আতিশয্য ছিল না। খুবই সাধারণ দাম্পত্য জীবন ছিল। কোনো সময়েই কোনো কারণে সংকট দেখা দেয় নি। স্ত্রী ছিলেন খুবই সাধারণ মহিলা। কিংবা আজকের যুগে সেটাই হয়তো অসাধারণ আর মহার্ঘ। তাঁর জীবনটা কেটেছে গৃহের কোণে, সংসারের অঙ্গনে। অসুখী ছিলেন বলে মনে হয় না। কিংবা হয়তো ছিলেন, আমি কখনো তা জানতে পারি নি। জানবার চেষ্টাই কি করেছি? আজ এই বয়সে, তাঁকে হারিয়ে আর সজ্ঞানে সে কথা বোধহয় বলা চলে না। বিশেষ করে, রাজনৈতিক জগতে যখন আমি এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক, তখন যে জীবনটা কেটেছে, ঘরের দিকে চোখ ফিরিয়ে তাকাবার অবকাশ কতটুকু ছিল? স্ত্রীর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ কতটুকুই বা ঘটত। তিনি রেঁধে খাওয়াতে ভালোবাসতেন, অথচ বাড়িতে বসে তাঁর যত্ন করে রাঁধা হাতের অন্নব্যঞ্জন, সামনে বসে খাবার অবকাশই তো ছিল না। লাঞ্চ ডিনারের ছড়াছড়ি। অবশ্য সে রকম লাঞ্চ ডিনার আমি কোনো কালেই তেমন পছন্দ করি নি। বাঙালি খাবারেই বরাবর আমার রসনা তৃপ্ত ছিল। আর সেইজন্য কলকাতার বহু নামী দামী ব্যক্তিরাই নানারকম ব্যবস্থা করতেন। তাঁদের আবাসে বা বিশেষ আস্তানায় বেশ ভূরিভোজের ব্যবস্থা থাকত। তবে সেইসব অধিকাংশ ব্যক্তিদের

যুক্তিই ছিল আমার একটা বিতৃষ্ণা. এমন কি ক্ষেত্রবিশেষে ঘৃণা। কারণ, স্বার্থ ছাড়া, তাঁদের কেউই আমার মনোরঞ্জনের জন্য ব্যস্ত ছিলেন না। অবশ্য তাঁদের মধ্যেই, সত্যিকারের ভদ্রলোকের সংখ্যাও একেবারে অকিঞ্চিৎকর ছিল না।

নিজে তো জানি ক্ষমতার মদ এমনই তীব্র, তার নেশার হাত থেকে রেহাই পাই নি। জীবনে কি কখনো ভাবতে পেরেছিলাম, আমার যৌবনের প্রান্তে এসে, শ্রেষ্ঠ চিত্রাভিনেত্রী সব কাজ ফেলে, আমার জন্য শুক্তো আর ভাপানো ইলিশ মাছ রেঁধে বসে অপেক্ষা করে থাকবেন? শৈলেন্দ্রনাথের মতো শিল্পপতি আমার বন্ধুত্বের জন্য লালায়িত হবেন, আমাকে তাঁর রাজকীয় ভবনের, অত্যন্ত ব্যক্তিগত প্রকোষ্ঠসমূহে আদর করে খাওয়াবেন? শৈলেন্দ্রনাথের তো দোষ একটাই ছিল। কলকাতা শহরেই পৈতৃক বাড়ি স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সুখের সংসার, একটি দোষেই নষ্ট হয়েছিল। স্ত্রীলোকের বড় বাতিক ছিল। এমন বলতে পারি না, শৈলেন্দ্রনাথের রুচিবোধ ছিল না। যে-সব মেয়েকে তিনি নিজের ভোগে লাগাতেন, তারা কেউই একেবারে নিতান্ত অশিক্ষিত দেহসর্বস্ব ছিল না। আমিও কি সেই-সব মেয়েদের প্রতি কিঞ্চিৎ আকর্ষণ বোধ করতাম না। করতাম। নিজের মনের কাছে তা অস্বীকার করি কেমন করে। এ রকম আকর্ষণ বোধ করেছি অনেকের প্রতিই, আর সত্যি কথা বলতে কি দু-চারজনের নিবিড় সান্নিধ্যও ভোগ করেছি। তবে কখনো তেমন একটা পাগলামি করি নি।

আমার স্ত্রী কি তা বুঝতেন না? অনুভব করতেন না? আমাদের দুজনের মধ্যে যে একটা ব্যবধান গড়ে উঠেছিল, আজ আর তা অস্বীকার করি কেমন করে? আমি হয়ে পড়েছিলাম বাইরের মানুষ। তিনি তো ঘর ছেড়ে কখনো বেরোন নি। তা ছাড়া, পার্টিতেও মহিলা কিছু কম ছিলেন না। আমি পার্টির সর্বোচ্চ নেতৃত্বে ছিলাম। মন্ত্রিত্ব কখনো করি নি। মন্ত্রী তৈরি করতাম। আর রাজনীতির জগতে যখন মেয়েরা আসে, তারা যে কতটা বেপরোয়া হতে পারে, তাও আমি প্রত্যক্ষ করেছি। ফলে পার্টির মেয়েরাও আমার মনোরঞ্জনের জন্য লালায়িত থাকত। তবে হ্যাঁ, আমি

পার্টির মেয়েদের মধ্যে, দুর্বলতা বোধ করতে পারি, এমন একজনকেও দেখি নি।

আমি বরাবরই দক্ষিণপন্থী রাজনীতি করেছি। জাতীয়তাবাদেই আমি উদ্‌বুদ্ধ ছিলাম। আমি নিজেকে এখনো একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক বলেই মনে করি। বামপন্থীদের সঙ্গে আমার কখনো বনে নি, তাঁদের নীতিতে কোনোকালেই বিশ্বাস ছিল না। এটাও আমার নিশ্চিত ধারণা, মুখে তারা যতই বিপ্লবের বুলি কপচান, আসলে তাঁরাও ক্ষমতার মদেই চুমুক দেবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। যে-কারণে জহরলাল নেহরুকে আমার প্রায়ই মনে হতো, উনি মাঝে মাঝেই বামপন্থা কথাবার্তা বলতে ভালো-বাসতেন। সেটা নিতান্তই একটা কৌশলমাত্র ছিল। ওঁর দক্ষিণপন্থী ইমেজে, বামপন্থার কিঞ্চিৎ ছোঁয়া বেশ ভালো ভাবেই কাজে লাগিয়েছিলেন। ব্যাপারটা খুবই রোমান্টিক। এ নিয়ে বল্লভভাই প্যাটেল, মৌলানা আজাদ সাহেব ইত্যাদি নেতাদের সঙ্গে বসে আমরা অনেক হাসিঠাট্টাও করেছি। আসলে জহরলাল মনে-প্রাণে ছিলেন একজন রোমান্টিক হিরো। সত্যি কথা বলতে কি, ওঁকে নেতা হিসাবে আমি কখনোই তেমন মেনে নিতে পারি নি। ওঁর অনেক পাগলামিই তো দেখেছি। দুর্বল দিকগুলোও সবই জানতাম। ওঁকে সব থেকে ভালো জানতেন ডাঃ বিধান রায়। আমাদের দেশের এমন পোড়াকপাল, সত্যি কথা কেউ লিখতে পারেন না। স্মৃতিকথা নামে যে-সব বই যাঁরা লেখেন, সেগুলোর অধিকাংশই, তাঁদের জীবনের আংশিক ছায়া মাত্র। আসল মানুষটি থেকে যান ধরাছোঁয়ার বাইরে। নিজের দোষত্রুটির কথা, নিজগুণেই ক্ষমা করেন, বরং কারোর ওপর রাগ থাকলে, তাঁর সম্পর্কে কিছু কালিমা লেপন করে যান। এটা রাজনীতিক নেতাদের ক্ষেত্রে বেশি সত্য। সাহিত্যিক কবিরাই বা ক-জন যথার্থ আত্ম-কথা লিখেছেন?

এই তো সম্প্রতি দেখলাম, এক সাহেব প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর সম্পর্কে একটি বই লিখেছেন। বাঙালি হিসাবে আমাদের লজ্জিত হওয়া উচিত, দ্বারকানাথকে নিয়ে এ রকম একটা অথেনটিক বই অনেক পরিশ্রম করে

লিখেছেন একজন অভারতীয়। ভাগ্য ভালো, সাহেব লিখেছেন, এই দ্বারকানাথের নিঃসঙ্গ দুঃখী জীবনের কথা অনেকখানি অন্তরঙ্গভাবে আমরা জানতে পারি। জানতে পারি, পূর্ব ভারতে যিনি প্রথম ইণ্ডাস্ট্রি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, অথচ সেই উদ্যোগ চলে গিয়েছিল পশ্চিম ভারতের হাতে। বইটা পড়ে সন্দেহ জাগে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কোনো এজেণ্ট দ্বারকানাথকে বিলেতে খুন করেছিল কি? ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক প্রাইভেট ডিনার পর্যন্তও পৌঁছেছিল। রাত্রি দুটো নিশীথে প্রত্যাবর্তন করেছেন বাকিংহাম প্রাসাদ থেকে।

আমরা জানি, দ্বারকানাথ স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে এলে, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলের চত্বর গঙ্গাজল দিয়ে ধুয়ে দেওয়া হতো। সেটাই অনেকখানি জানা, তিনি সাহেবদের পার্টি দিতেন, বিলিতি খাদ্য মদ্য গ্রহণ করতেন; আর দেবেন্দ্রনাথ থেকে সবাই তাঁর অন্নে পালিত হয়েও, তাঁর বিরোধিতা করতেন। তিনি জাহাজ তৈরির কারখানা খুলেছিলেন, এবং আরও অনেক ইণ্ডাস্ট্রির উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সেসব ঐতিহাসিক সম্ভাবনার কথা মনে রাখি নি। রবীন্দ্রনাথ নিজেও কি রেখেছিলেন?

আমরা সত্যি কথা লিখি না। স্বীকার করি না। যদি সেই সাহস আর সাধ্য থাকত, আমি অনেক কিছুই লিখতে পারতাম। আমার সময়ের অনেক ঘটনা, অনেক চরিত্র, যা পড়ে বাঙালি পাঠক তার নিজের ইতিহাস পড়ে কুঁকড়ে উঠত। দিল্লি থেকে কলকাতা, কেন্দ্র থেকে রাজ্যের রাজনৈতিক ইতিহাস অধিকাংশই কলঙ্কে ভরা। সাধারণ মানুষ কোনোদিনই তাদের বঞ্চনার প্রকৃত ইতিহাস জানতে পারবে না। তা সে আমার আমলেরই হোক, আর বর্তমান আমলেরই হোক। অন্যায় ইতরতায় ভণ্ডামিতে পরিপূর্ণ। আমি নিজে তার পুরোপুরি অংশীদার। লিখলে, নিজের কথাও লিখতাম। কিন্তু জানি, লেখা যাবে না। যা একটু-আধটু লিখি, তা নিতান্তই লোক-ভোলানো। মাটির ওপর স্তর থেকে, খুব সাবধানে কোনোরকমে কেঁচো খোঁড়া। খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়ার ভয় সব সময়েই।

আমি তো ময়দান থেকে, কলকারখানায় আন্দোলন করে, নেতৃত্বে আসি নি। অল্প বয়সে যখন আন্দোলন করেছি, জেল খেটেছি, তখন বুঝতে পারতাম না, নেতৃত্বে আসতে হলে, ওসব খুব আবশ্যিক ব্যাপার নয়। দলের মধ্যে দল পাকাবার ফন্দি-ফিকির হচ্ছে আসল। ভিতর থেকেই মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে হয়, আর তার জন্য দূরদর্শিতার প্রয়োজন আছে। আজ যাকে মাথায় করে নাচছি, কাল তাকে ধুলায় ফেলে দিতে একটুও দ্বিধা করলে চলে না। দলের মধ্যে, নিজের সংগঠনকে জোরদার করার রীতিনীতিগুলো ভালোই আয়ত্ত করেছিলাম, আর একটা ইমেজও তৈরি করেছিলাম। নিজের দলের শত্রুদের কী করে ঠাণ্ডা করতে হয়, সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল, আর সার্থকও হয়েছিলাম। ওটাই আসল। তার পরে তো বাইরের শত্রুদের সঙ্গে রণনীতির কৌশল প্রয়োগ। সে ব্যাপারেও আমি সিদ্ধহস্ত ছিলাম। বামপন্থীরা আমার নামে কুকুর পুষেছে। তাতে কী আসে যায়? ওটা তো আমার সাফল্য।

দলে, এম. এল. এ.-র টিকেট দেওয়া থেকে শুরু করে, মন্ত্রিত্ব সবই আমার হাতে ছিল। এম. পি. হিসাবে দিল্লি গিয়ে বুঝেছিলাম, ওখানে খেয়োখেয়ি রাজ্য পর্যায়ের থেকেও কুৎসিত আর নগ্ন। তবু কেন্দ্রেও আমি নিজের জায়গা ঠিক করে নিয়েছিলাম। তার পরে যখন দেখলাম, সারা ভারতের পার্টিতেই ভাঙন ধরেছে, নিজেও নির্বাচনে হেরে গিয়েছিলাম, তখনই ঠিক করেছিলাম, রাজনীতি থেকে বিদায় নেব। সিদ্ধান্তটা খুব সময়োপযোগী হয়েছিল। আমি নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলাম। সবাই আমাকে প্রশংসা করেন। কিন্তু শান্তি পেয়েছি কি?

নিজের ভিতরে ডুব দিয়ে দেখছি, সেখানে কী গভীর অপূর্ণতার কষ্ট। ব্যর্থতার জ্বালা। দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা কেউ দেয় না। আর তো সে-জীবন ফিরে পাব না। এখন তো বুঝতে পারছি, সারাটা জীবন কেবল ভুলই করে এসেছি। এ জীবনে আর ভুলের সংশোধন সম্ভব নয়। এ ব্যর্থতার কষ্ট নিয়ে সংসার থেকে চলে যেতে হবে। আমার ছায়া আমাকে তাড়া করে ফিরছে— যার নাম মৃত্যু।

আহ্, বুকের ভিতরে কী হাহাকার। বিশেষ করে, সবুজ এই উদ্যানে, শিশুরা খেলা করে বেড়াচ্ছে। ওদের দেখছি, ভিতরটা যেন আরও যন্ত্রণায় ছিঁড়ে পড়ছে। আর একবার—আর একবার কি ওদের বয়স ফিরে পাওয়া যায় না? আবার—আবার। আর একবার নতুন করে…। না, জানি, এবারের মতো সব শেষ। আর সেইজন্যই বিকেল হতে না হতেই এখানে আসার জন্য ছটফট করি। ওদের দেখব বলে, এই কচি-কাঁচাদের। ওদের দেখি, আর নিজের অপূর্ণতাকেও দেখতে পাই। কষ্ট হয় আর কোনোদিনই ওদের বয়সটা ফিরে আসবে না। যদি আসত—যদি—তা হলে…

অবনীশ

সেনগুপ্তর সেই বিখ্যাত কথাটা মনে পড়েছে, 'বিদ্রোহ? আর যে-কোনো মানুষের অভিধানেই বিদ্রোহ শব্দটা থাকতে পারে, আমার অভিধানে নেই। আমি জানি কেবল বিদ্রোহীদের সমূলে বিনাশ করতে হয়, আর তার জন্যই আমি জন্মেছি।' দারুণ কথাটা বলেছিলেন সেনগুপ্ত। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে শিক্ষিত ঝানু পুলিস অফিসার সেনগুপ্ত, এক সময়ে যখন ডি আই জি পদে ছিলেন, সে-সময়েই তাঁকে কেউ জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আপনি পুলিস বিদ্রোহ বিশ্বাস করেন?'…তার জবাবে সেনগুপ্ত কথাগুলো বলেছিলেন।

এ তো আমারও মনের কথা ছিল। কথাগুলো যখন শুনেছিলাম, তৎক্ষণাৎ মনে হয়েছিল, আমাদের পক্ষে এর থেকে সত্যি কথা আর কিছু থাকতে পারে না। আমি অবশ্য কোনোদিনই ইউনিফরম্ পরার চাকরি বেছে নিই নি। নিলে, সেনগুপ্তর জায়গায় যেতে পারতাম। স্বাধীনতার আগেই, আমি ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাশ করেছিলাম। বিলেতেও শিক্ষা নিয়েছি। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সঙ্গে আমারও যোগাযোগ ঘটেছিল। প্রথম কিছুকাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে ঘোরাঘুরি করলেও, লক্ষ্য ছিল রাইটারস্। লালবাজারের থেকে, রাইটারস্ বিল্ডিং বেছে নিয়েছিলাম। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে, রাইটার্সে যেতে পেরেছিলাম। আর যে-পদটির

প্রতি আমার আকর্ষণ ছিল, অনেককে ডিঙিয়ে, আমি সেই পদে নিজেকে অধিষ্ঠিত করতে পেরেছিলাম।। ঝানু আমলা বলতে যা বোঝায়, আমি তাই হয়েছিলাম।

ভালোবেসে বিয়ে করাতে আমার বিশ্বাস ছিল না। যুবকরা কেমন করে প্রেম করে, তাও বুঝি না। সব আমার জন্য না। কিন্তু আমার স্ত্রী হবে অভিজাত পরিবারের মেয়ে, শিক্ষিতা, সুন্দরী, আধুনিক, এবং অবশ্যই শ্বশুরবাড়ি থেকে পাব প্রচুর উপঢৌকন, যা আমার একান্ত প্রাপ্য বলে আমি বিশ্বাস করি। সে-সবই পেয়েছিলাম। চৈতী—আমার স্ত্রীর সঙ্গে বরাবরই আমার আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং ভালো ছিল। আর সেটা ভালো রাখতে গেলে, স্ত্রীদের সব সময়েই বুঝে নিতে হয়, তার স্বামী কী চায়। চৈতী সে-সব ভালো বুঝত, আর বুঝেই আচরণ করত। সামাজিক অনুষ্ঠানে বা পার্টিতে কোথায় কতটা রাশ টেনে চলতে হবে, কতটা প্রগল্ভ হওয়া উচিত, আর কোন্ ব্যক্তির সঙ্গে কতটা ঘনিষ্ঠতা দেখতে হবে, এমন-কি ফ্লার্ট করতে হবে, আমার চোখের দিকে তাকালেই ও বুঝতে পারত। দাম্পত্য জীবনে যদি বুর্জোয়া লিবারেলিজম্ বলতে কিছু থাকে, আমার আর চৈতীর ব্যাপারটা সেইরকম।

তা বলে, আমাকে কেউ রক্ষণশীল ভাববে, সেটা মেনে নেব না। অর্থাৎ, আমি সেরকম ভাবে সকলের সামনে আচরণ করি নি। তবে হ্যাঁ, যে-কোনো বড় আমলাই অন্তরে রক্ষণশীল। বাইরে তার মতো উদার আর কেউ নেই। এটা আমাদের জীবনের একটা ছক। রবীন্দ্রনাথের কবিতা তো বটেই, গোটা 'শেষের কবিতা' উপন্যাসটি আমি মুখস্থ বলে যেতে পারি। আমি বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ, এমন-কি হালের কবিদের কবিতাও পড়ি। কবি-সাহিত্যিকদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ বরাবর। ওটাও আমার একটা ইমেজ। সেনগুপ্ত কখনো তা করেন নি। তার মানে তো এই না, আমি একজন সংস্কৃতিসম্পন্ন কৃষ্টিবান ব্যক্তি। ওটা ইমেজ, অফিসে, সহকর্মীদের কাছে, সমাজে, এবং অবশ্যই পরিবারেও। চৈতী রবীন্দ্রসংগীত করত, এখনো করে মোটামুটি। কিন্তু আমার স্ত্রী যেহেতু, আকাশবাণীরও

নিয়মিত রবীন্দ্রসংগীত গায়িকা। ওটাও একটা ইমেজ : আসলে আমি যা, আমি তা-ই। আমার দাপট ছিল অন্যত্র। সেখানে আমার চেহারা আলাদা। চৈতী আমাকে চিরকাল মনে মনে ভয় পেয়ে এসেছে। ওটা দরকার ছিল। এখন এ বয়সে আর ও-সব প্রশ্ন নেই। বুড়ি হয়ে গিয়েছে। আমি ভিতরে বাইরে, বরাবরই মনোগ্যামিস্ট। অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হই নি। আজকাল দেখি, আমার মতো পদাধিকারী ছোকরা আমলারা যা খুশি তাই করে। পাবলিকলি মদ খেয়ে বেড়ায়। মেয়েদের সঙ্গে খারাপ ভাবে মেলামেশা করে। এতে যে তাদের খাটো হতে হয়, তা কি জানে? আমাদের—আমাকে অফিসের অধস্তন কর্মচারি থেকে শুরু করে সবাই ভয় পেত, মেনে চলত। আজকালকার ছোকরারা সে-সব মানে না। সকলের সঙ্গেই হলাগলা। বোঝে না, এতে কাজের ক্ষতি হয়। কাজ করিয়ে নেওয়া মুশকিল হয়ে পড়ে। কতটা দূরত্ব রক্ষা করা উচিত বোঝে না।

আমি জানি, আমার ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত আমাকে মনে মনে ভয় পেত। ওটার দরকার ছিল। তাদের বাবা কী এবং কে, এটা তাদের বুঝতে হয়েছিল। ভয় না থাকলে, শাসন থাকে না। আর আমি তো শাসন করবারই লোক ছিলাম বরাবর। আর সেই শাসনের ব্যাপারে কোনো বাধা এলে, আমি চিরকাল তা গুঁড়িয়ে দিয়েছি।

এই যে মহিমময় বসে আছেন আমার পাশে, নখদন্তহীন বৃদ্ধ ব্যাঘ্র, এঁকে এক সময় আমিও ভয় পেতাম। এঁদের শাসনের সময়েই, আমি আস্তে আস্তে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিলাম। আমি অনেককে ভয় পেতাম। দরকার ছিল—সেটাও দরকার ছিল। আমাকেও অনেকে ভয় পাবে, সেটাই স্বাভাবিক। এই মহিমময়ের সঙ্গে বসে, আমাকে কত গোপন ব্যবস্থা নিতে হয়েছে। পুলিসের বড়কর্তাদের কত নির্দেশ দিতে হয়েছে। নির্মম আর নিষ্ঠুর সেই নির্দেশ পরামর্শ। মন্ত্রীদের সঙ্গে অনেক বৈঠক করতে হয়েছে। তাঁরাও আমার পরামর্শ চাইতেন। ভুল বেশি করি নি। যথার্থ পরামর্শই দিতাম। আর ফতোয়া জারি করতাম লালবাজারের কর্তাদের।

মন্ত্রীরা নিজেদের মধ্যে ক্ষমতা নিয়ে নানারকম রেষারেষি করতেন। কাকে

তো আমাই দিতে হবে, আর কাকে নয়, সে-সব ভালোই বুঝতাম। ফলে অনেক সময়, অনেক নেতা-মন্ত্রীর বিষ নজরে পড়তে হতো। পড়লেও, আমি তো নিজের খুঁটি ঠিক রাখতাম। বিষ নজরে পড়লেও, ঠিক কেটে বেরিয়ে আসতাম। অনেক গুপ্তচর ছিল আমার। তারা মন্ত্রীদেরও পিছনে লেগে থাকত। নেতাদের পিছনে ছায়ার মতো ঘুরত। সকলের সব গোপন খবরই আমার জানা ছিল। বাইরের লোককে তা বলার দরকার ছিল না। কিন্তু বলতে হতো। বিশেষ ব্যক্তিকে বলতে হতো। তাঁদের মধ্যে এই মহিমময় একজন। তিনি নিজেও আমার কাছ থেকে অনেক খবর সংগ্রহ করতেন। বিশেষ করে নেতা আর মন্ত্রীদের বিষয়ে। বিরোধী দলের নেতাদের কার্যকলাপও ছিল আমার নখর্দপণে। দরকার হলে, তাদের কী ভাবে সযুত করতে হবে, পেটাতে হবে, নিখুঁত ছক আমার হাতে ছিল। মন্ত্রী আর মহিমময়ের মতো ব্যক্তি আমার পরামর্শ সেইজন্যই নিতেন।

রাইটারসে বসেই, আমি পুলিসের বড়কর্তাদের খবরাখবর রাখতাম। একবার তো আমার কথা শুনেই, একজন মন্ত্রীকে বরখাস্ত করা হয়। ওহ্, সেই মন্ত্রীমশাই আমাকে কী ভাবে শাসিয়েছিলেন। বোঝেন না, তিনি এসেছেন ভোটের জোরে, অনেক চুরি-চামারি করে। তাঁর মেয়াদ বাঁধাধরা। আমাকে তিনি সরাতে পারেন না। উলটে নিজেরই কোমর ভেঙে যায়। পুলিসের এক বড়কর্তাকেও আমার রিপোর্টে সাসপেণ্ড করা হয়েছিল। সব থেকে বড় বিরোধী দলের নেতা তো সাংবাদিকদের কাছে আমার নামে যা তা বলতেন। পরে ওঁরাই শাসক হয়ে এসেছিলেন। বিরোধী দলের নেতা যখন প্রধান হয়ে বসেছিলেন, আমি তাঁকে কুর্নিশ করেছিলাম। তিনিও তো আমার ওপর নির্ভর করতেন। প্রথমে হয়তো ভেবেছিলেন, রাইটারসে এসে আগে আমাকে সরাবেন। কেন সরাবেন? বুদ্ধিমান ব্যক্তি, বুঝে নিয়েছিলেন, আমি তখন তাঁরই সেবক। আমার কাজই তো ছিল তাই। একেবারে গোড়ায়. সাহেবদের সেবা করেছি। স্বাধীনতার পরে, স্বাধীন প্রথম সরকারের সেবা করেছি। আবার ওঁদের

সেবাও করেছি।

সেই রূপকথায় আছে না, গাছ তুমি কার? যে যখন আমার কাছে, আমি তার। এটাই তো আমার ভূমিকা। তা সেই সরকারের রঙ যাই হোক। গোপন পরামর্শ তাঁদেরও দিতে হতো। এই মহিমময়ের সম্পর্কে কি নতুন সরকারকে খবর দিই নি? তাও দিয়েছি। যে-দলই আসুক, আমাদের ছাড়া তাঁরা চলবেন কী করে? এমন দেশ কি পৃথিবীতে আছে, আমাদের সহযোগিতা ছাড়া দেশ শাসন করতে পারে? পারে না। তা সে তার চেহারা যেমনই হোক। আমরা ছিলাম, আছি। থাকব।

আমার সারা জীবনের যা ভূমিকা, সেনগুপ্তর কথায় তা অত্যন্ত নির্মম ভাবে পরিষ্কার হয়ে ওঠে। কিন্তু এই যে সবুজ উদ্যানে বসে আছি, কচি কোমল, ভবিষ্যতের আশা, সামনে ফুলের মতো ফুটে আছে, খেলছে, এইসব দেখতে দেখতে, বুকের মধ্যে কেমন একটা হতাশা আর ব্যথা টনটনিয়ে উঠছে। কী করেছি সারাটা জীবন? কী ভূমিকা ছিল আমার? আমার নিজস্ব সত্তা বলতে কিছুমাত্র ছিল কী? কিছু না, কিছু না। সারাটা জীবন ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। এখানে এসে যখন বসি, এই ফুলের মতো শিশুদের দেখি, তখন বুঝতে পারি, সেনগুপ্ত কী ভুল কথা বলেছিলেন। কী সাংঘাতিক মূঢ় কথা বলেছিলেন। আমি একটা ক্রীড়নকের জীবন কাটিয়ে এসেছি। সারাটা জীবন পরাধীন, পরের আদেশ মেনে, আজ একে, কাল ওকে, জো হুজুর করেছি। ভাবলে এই বয়সে এখন ভিতরটা ফেটে পড়তে চায়। আমি কি একটা মনুষ্য পদবাচ্য ছিলাম? না, আমি একটা নিতান্ত আমলা ছিলাম। ছি ছি ছি ছি, সেনগুপ্তর কথা শুনে গর্ব বোধ করতাম। হ্যাঁ গর্ব! জীবনে বিদ্রোহের কত দরকার ছিল। মানুষ জন্ম থেকেই বিদ্রোহী, সেই উপলব্ধিটা হলো অনেক পরে। অনেক —যখন আর জীবনটাকে নতুন করে ফিরে পাবার উপায় নেই। পেলে বিদ্রোহ করতাম। সারাজীবনের পদানত আদেশবাহী আর চাকরি রক্ষার জন্য কূট পরামর্শ, সব কিছুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতাম। আমার অভিধানে এখন 'বিদ্রোহ' শব্দটাই সব থেকে বড় হয়ে উঠেছে।

উঠলেই বা কী করব? কিছু করার নেই। এই যে আমার চোখের সামনে তাজা টাটকা প্রাণগুলো খেলে বেড়াচ্ছে, আর একবার নতুন করে, নিজেকে তৈরি করবার জন্য, এই বয়স তো ফিরে পাব না। ওদের দিকে তাকিয়ে নিজের জীবনের ব্যর্থতা বড় মর্মন্তুদ হয়ে ওঠে। ব্যর্থতার জ্বালা ওরা ভুলতে দেয় না—যা দিয়েছে আমার স্ত্রী, ছেলেমেয়েরা। সেইজন্যই ওদের দেখতে রোজ ছুটে আসি। জ্বালাটা আছে বলেই বেঁচে আছি। না থাকলে, সবই তো রসকষহীন বিবর্ণ হয়ে যেত।···

ধৃতীন

'কবি তো তুই নোস। তুই একটা খেলারাম। খেলারাম, খেলতে এসে-ছিস, খেলে যা।' নিজেকে এখন এই কথাই বলতে ইচ্ছে করে। তা ছাড়া আর কী বলব। সারাটা জীবন তো মূঢ়ের মতো খেলেই এলাম। আর কী ভেবে এসেছি? যা করছি, ঠিক করছি। যা পাচ্ছি, ঠিক পাচ্ছি। বাইরে এমন ভাব দেখিয়ে এসেছি, যা আমাকে দেখছ, আমি তা নই। তার চেয়েও অধিকতর কিছু। কিন্তু মনে মনে জানতাম, আমার সীমাবদ্ধতা কোথায়।

লোকে আমাকে যা-ই ভাবুক, আমি মনেপ্রাণে একজন কবি। কিন্তু এই সামান্য অথচ অসামান্য কথাটা যথার্থ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে বড় বেশি সময় লেগে গেল। এর জন্য তথাকথিত ভক্তদের দোষ দিতে পারতাম। তাতে লাভ কী? আমার শত্রু আমি নিজেই। আমার আত্মসন্তুষ্টিই আমাকে শেষ করেছে। অথচ নিজের মধ্যে আত্মগোপন করে থাকা এই শত্রু যে আমার একান্ত অচেনা ছিল, তা নয়। শত্রুকে দমন করতে আমি শিখি নি। নিজের সঙ্গে পাঞ্জা কষতে পারি নি।

কবি-সাহিত্যিকের ভক্তরা যে তাদের কী ক্ষতি করতে পারে, ইচ্ছে করে লিখে তা ব্যক্ত করি। তাও পারি না। ভয়—এখনো আমার ভয়, সত্যি কথা লিখতে গেলে, যে-জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি, সেখান থেকেও আমার পা সরে যাবে।

আমি যে মনেপ্রাণে একজন কবি, আমার সব সার্থকতা যে সেখানেই, কথাটা মুখে বললেও, কবিসত্তার থেকে আমার অন্য সত্তাকে মূল্য দিয়ে এসেছি বড় বেশি। এমন কথা কি আমি বলতে পারি। কবিতা রচনার জন্য, আমি ত্যাগ স্বীকার করেছি, যে-ত্যাগ আমার জীবনের অনেক সুখ নষ্ট করেছে, নির্ভয়ে যে-কোনো বিপদ বা কলঙ্ককে মেনে নিয়েছি ? নিজেকে ছিন্নভিন্ন করেছি, এমন বাধার সামনে, যা আমার প্রাণকে অপমানিত করেছে, গ্লানিতে ভরে দিয়েছে ?

পারি নি। আমি আমার ছোটত্বকে কখনো ডিঙিয়ে, বেড়া ভেঙে বেরিয়ে আসতে পারি নি। আমি থাকতে চেয়েছি নিটোল ভদ্রলোক। সংসারের সীমায় সর্বত্র সব সময় শান্তি বজায় রাখতে চেয়েছি। আর তা বজায় রাখতে গিয়ে, ঘরে-বাইরে সর্বত্র আমি আপস করেছি। এমন-কি আপস করেছি আমার কাব্যলক্ষ্মীর বিরুদ্ধেও। সে যখন আমার মধ্যে জ্বলে উঠেছে লেলিহান অগ্নিশিখার মতো, আমার রক্তে তুলেছে ঝড়, ক্রুদ্ধ রোষে ফুঁসেছে অতি নগ্ন হুঙ্কারে, কিংবা অপ্রাথিত যা কিছু আমাকে করতে হয়েছে আর সমগ্র অনুভূতি জুড়ে বিবমিষায় আক্রান্ত হয়েছি, তার প্রকাশের ভাষা আমার গভীরে তুলেছে এক অভূতপুর্ব ব্যঞ্জনাময় ঝংকার, যাকে বলা যায় এক কঠিন সুন্দর উন্মাদ সাধকের উচ্চ ভাবদশা, তার কিছুই আমি আমার বিচরণশীল কাব্যের জগতে প্রতিধ্বনি করতে পারি নি।

কেন পারি নি ? পারি নি আমার স্ত্রীর জন্য। পাবি নি আমার ছেলে-মেয়ের জন্য। আমি জানি, ওরা তা সহ্য করতে পারত না। আমার স্ত্রী শিক্ষিতা, কলেজে অধ্যাপনা করেন। বোদলেয়ার পড়তে তাঁর খারাপ লাগে। গিনস্‌বার্গ যখন কলকাতায় এসেছিলেন, তাঁকে আমার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমার স্ত্রী রাজি হন নি। তাঁর মতে এঁরা কবিই নয়। এঁরা নেশাখোর, বিকারগ্রস্ত কামুক। তার পরে যদি আমার স্বরচিত কবিতায় আমার প্রকৃত আত্মপ্রকাশ ঘটত, দেখা যেত, আমি আমার স্ত্রী-পুত্র আপনজনদের কাছে এক মূর্তিমান অসংযমী কুৎসিত

চরিত্রের মানুষ।

আমি ভীরু। কাপুরুষ। সারাটা জীবন আমার ভয়ে ভয়েই কেটেছে। অথচ আমি যখন বাইরের লোকের সামনে যাই, সভা-সমিতিতে যাই, আমার চেহারা দেখে সবাই মুগ্ধ হয়। আমার কণ্ঠস্বরের যাদু তাদের আবিষ্ট করে। কুড়ি বছরের মধ্যে আমি আমার গলার স্বর, সুর, কথাবলার ভঙ্গি একেবারে বদলে ফেলেছি। এটা আমার তৈরি করা ব্যাপার, যা খুব স্বাভাবিক নয়। এ ক্ষেত্রেও আমার অনেক ফাঁকি আছে। এর মধ্যে আছে ভঙ্গি-সর্বস্বতা। লোকেরা তো সবাই ন্যাকা বোকা নয়। যারা আমাকে কুড়ি-পঁচিশ বছর আগে দেখেছে, তারা আজকাল আমার চালচলন আচরণ কথাবার্তা শুনলে, আড়ালে মুখ টিপে হাসে। বুঝি। সবই বুঝি। কিন্তু ঐ যে আমার ভীরুতা, আত্মপ্রকাশের মধ্যে আপস, সে সবই আমার মধ্যে দিয়েছে ভঙ্গি সর্বস্বতা। আমার এত বড় ঋজু কাঠামো শরীরটার মধ্যে, প্রাণটা চিংড়ি মাছের মতো ছোট।

অভিজ্ঞতা আমার জীবনে কম নেই। প্রেমের কথাই ধরা যাক। বিয়ের আগে মেয়েদের সঙ্গে আমার মেলামেশা ছিল অবাধ। আর সেই সূত্রেই তো নির্ঝরিণীর সঙ্গে আমার যোগাযোগ। সে ছিল আমার কবিতার অনু-রাগিণী। কবিতার প্রতি অনুরাগ থেকে, কবির প্রতিও তাঁর অনুরাগ জেগেছিল। সেই অনুরাগেরই ফলশ্রুতি প্রেম আর বিবাহ। সর্বনাশটা ঘটে গিয়েছিল সেখানেই। নির্ঝরিণীর সঙ্গে আমার প্রেমজ বিবাহ। তিনি প্রথম থেকেই সেই কারণে আমার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিলেন। আমাকে ঘিরে তরুণ-তরুণী ভক্ত বা স্তাবকের অভাব ছিল না। নির্ঝরিণী জানতেন, তাঁর সঙ্গে যদি আমার প্রেম ঘটতে পারে, বিয়ের পরেও অন্য মেয়ের সঙ্গে একই ঘটনা ঘটতে পারে। সোজা কথা হলো, তিনি আমাকে বিশ্বাস করতেন না। কোনো মেয়ের প্রতি সামান্যতম মুগ্ধতাও তিনি সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর মুখ-চোখের চেহারা এমন হতো, এমন কঠিন ভাষায় তিনি আমার সঙ্গে কথা বলতেন, আমি গোড়া থেকেই গুটিয়ে যেতাম। আমি তাকে ভয় পেতে শুরু করেছিলাম।

প্রেম বিষয়টি তো এমন নয়, যে ওটা একটা খেলা। আমি মেয়েদের সঙ্গে সেরকম খেলা খেলি নি। কিন্তু তাদের সাহচর্য সান্নিধ্য কেন ত্যাগ করব? আমি তো বিশ্বাস করি, নারীর সংস্পর্শ একটি মহৎ সঞ্জীবনী সুধার মতো কাজ করে। এ কথাটা নির্ঝরিণীকে অন্য ভাবে বলেছিলাম। তার জবাবে তিনি বলেছিলেন, 'আসলে ওটা লাম্পট্য। যতই সাজিয়ে গুছিয়ে সুন্দর ভাষায় বল, ওসব প্রশ্রয় আমি কোনোদিন তোমাকে দেব না। কবিতায় যত খুশি প্রেম-চর্চা কর, আপত্তি নেই। ওসব সঞ্জীবনী সুধা-টুধা আমাকে বোঝাতে এস না। তুমি রবীন্দ্রনাথ নও।'

তর্ক বৃথা। আমার ভীরুতাকে, 'আমি শান্তিপ্রিয় মানুষ—এই আখ্যা দিয়ে সান্ত্বনা দিতাম। আমার কবিতার প্রতি নির্ঝরিণীর সেই অনুরাগ আর ছিল না। তাঁর তখন অ্যামবিশান হচ্ছে, বাড়ি গাড়ি আমার আয়েসের জীবন। সমাজের উচু মহলের দিকে তাঁর দৃষ্টি।

হ্যাঁ, সেদিক থেকে আমি সার্থক। আমি বড় পত্রিকায় বড় চাকরি করেছি। মাইনে পেয়েছি মোটা। তার জন্যে যত রকমের কাঠখড় পোড়ানোর দরকার হয়েছে, পুড়িয়েছি। চাকরি করতে হলে, চাকরিতে উন্নতি করতে হলে নানারকম প্যাঁচপয়জার কষতে হয়, সবাই জানে। আমিও কষেছি কিন্তু আমার কবিতার বই-এর বিক্রিও কম নয়। বাড়ি-গাড়ি সবই করেছি। বাইরের দিক থেকে দেখলে, লোকে আমাকে একজন সাকসেসফুল মানুষ ভাববে। আমি তো জানি, যে-সাকসেস আমি চেয়েছি, সারা জীবন ধরে, সে সার্থকতা আমাকে স্পর্শ করে নি। কবি হিসাবে আমাকে যে যতই সার্থক বলুক, আমি জানি, যেখানে আমার পৌঁছুবার আকাঙ্ক্ষা, সেখানে আমি পৌঁছুতে পারি নি।

কেমন করেই বা পৌঁছুব? আমি তো আগেই বুঝেছি, প্রতিভা আমাকে স্পর্শ করেছিল; আমি তাকে ধরে রাখতে পারি নি। কথায় বলে, প্রতিভা একবার যাকে স্পর্শ করে সে সেই স্পর্শেই সার্থক হয়ে ওঠে। মিথ্যা কথা। সেই স্পর্শের পরেই শুরু হয় সাধনা। কঠিন সাধনা। যারা রবীন্দ্রনাথের কথা বলে, তারা একবারও কি ভেবেছে, তাঁর সাধকজীবনে

কত দুঃখ কষ্ট অপমান লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে? আমার মধ্যে সেই সহ্য করার ক্ষমতা কোথায়? হয়তো ছিল, কিন্তু আমি সে-পথে যাই নি। আমার পথ গিয়েছে বদলে। আজ যে-বয়সে এসে পৌঁছেছি, আর নতুন করে নিজেকে ভাঙচুর করতে পারব না।

জানি, কবির পক্ষে বয়সটা কোনো বাধা নয়। সে পারে যে-কোনো বয়সেই নিজেকে নতুন করে গড়ে তুলতে। হয়তো আমিও পারতাম। পারব না, তার কারণ, সে-শক্তি আর আমার নেই। জীবনের এই শেষ বেলায়, ছায়া যখন দীর্ঘতম, আকাশে রক্তাভা, তখন আমার বুকের ভিতরটা রক্তাক্ত হচ্ছে। ব্যর্থতার কষ্টে মরে যাচ্ছি। এই যে সবুজ উদ্যান, তার বুকে খেলে বেড়াচ্ছে রঙিন শিশুরা। ওদের দেখি আর ভাবি, আর একবার যদি ফিরে পেতাম এই শৈশব—আর একবার। তা হলে আমার সৃষ্টির অপূর্ণতাকে পূর্ণ করে যেতাম। কিন্তু তা তো আর পাব না। এবারের মতো বসন্ত গত জীবনে। অর্জুনের মতো গাণ্ডীবধারী বীরের চোখের সামনে যদুবংশ ধ্বংস হয়েছিল। তিনি তার গাণ্ডীবে জ্যা রোপণ করতে সক্ষম হন নি। তাঁর তো জরা এসেছিল দেহে। আমার জরা মনে। জীবনের অলিখিত শ্রেষ্ঠ কবিতা সেই জরার বুকে, শেষ শয্যা পেতে বসে আছে। চিরদিন তা অলিখিতই থেকে যাবে। আহ, বুকের ভিতরে কল-কল শব্দে ভেসে যাচ্ছে। চোখের সামনে সবুজ উদ্যান, সবুজ শিশুরা ঝাপসা হয়ে উঠছে।...

মহিমময় বললেন, 'যে যাই বলুক, আমি সত্যি সুখী। আমার জীবনে আর কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই। কথাটা খুব বেশি করে মনে আসে, বিশেষ করে এই সবুজ মাঠে, এই সব শিশুদের সামনে এলে।'

'খুব ঠিক কথা বলেছেন স্যার।' অবনীশ বললেন, 'আমার তো মনে হয়, অনেক সৌভাগ্য যে, এমন একটি জায়গায় বসতে পারছি, আর এই শিশুদের দেখছি। মনটা ভরে যায়।'

ধৃতীন্দ্র বললেন, 'শুধু তাই বা কেন? আমার তো মনে হয়, সারা জীবনে একটাও কবিতা না লিখে, শুরু থেকে যদি কেবল এখানে বসেই জীবনটা

কাটিয়ে দিতে পারতাম, তা হলেই সার্থক হতে পারতাম। সব কিছুর থেকে জীবনটাই তো বড়।'

'আর সে-জন্যই, জীবনের শুরু থেকে শেষ অবধি কেবল এখানে বসে কাটানোটা কোনো কাজের কথা নয় ধৃতীন।' মহিমময় উঠে দাঁড়ালেন, 'কাজের শেষে এখানে এসে তৃপ্তি পাই বলেই আসা। এখন এই তৃপ্তিটাই আসল কথা।'

অবনীশও উঠে দাঁড়ালেন, 'ঠিক বলেছেন স্যার। এ তৃপ্তিটাই এখন আসল পাওনা।'

'হুঁ।' ধৃতীন দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরালেন। 'আসলে আমার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি এত গভীর, মনে হয়, গোটা অতীতটা এখানে এসে তুচ্ছ হয়ে যায়। পিছন ফিরে তাকাতে ইচ্ছে করে না। এ সুখ কেউ দিতে পারে না।'

মহিনময় কোমরে হাত দিয়ে বললেন, 'বেশিক্ষণ বসে থাকলে কোমর টনটন করে। আজ আবার কোমরে একটু রে নিতে হবে।'

'রাত্রে ঘুম আসে না আমার, এ এক ব্যাধি।' অবনীশ বললেন, 'ওষুধ খেয়েও ঘুম আসে না।'

ধৃতীন্দ্র পা বাড়িয়ে বললেন, 'আর দেরি করা যায় না। সন্ধে হলে, আজকাল আর ভালো দেখতে পাই না। ছানিটা যে কবে তক পাকবে, কে জানে।'...

শরতের রক্তিম উদ্যানে, শিশুরা যেন সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো উত্তাল, ফেনিলোচ্ছল হয়ে উঠছে। কিন্তু প্রকৃতি যদি ওদের হাসিতেই মুখর, তবে কার বেহালার ছড়ে পূরবীর সুর বাজছে।

পোঁচি

অনিন্দ্যর ঘুম ভাঙলো। কিন্তু রাত্রের গভীর নিদ্রার পরে, ঘুম ভাঙার যে একটা প্রশান্তি, সে রকম কোনো অনুভূতি ওর ছিল না। বরং কেমন একটা অস্বস্তিতে যেন ওর মন ছেয়ে আছে। বন্ধ কাচের জানলায় মোটা পর্দা ঢাকা থাকলেও, দিনের আলোর একটা ইশারা সেখানে রয়েছে। এয়ারকুলার মেশিনটার, মৃদু ভ্রমর গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। ক'টা বাজলো?
অনিন্দ্য ঘড়ি না দেখেও বুঝতে পারলো, বেলা কিছু কম হয় নি। বাইরে যে দিনের উত্তাপ রীতিমতো বেড়ে উঠেছে, তার প্রমাণ ওর ঘাড়ের কাছে ঘামে ভিজে যাওয়া গেঞ্জিতেই। ঠাণ্ডা মেশিন চললেও, বাইরের উত্তাপ, চারদিকে দরজা জানলা বন্ধ ঘরকেও রেহাই দেয় না। ও পাশ ফিরে তাকালো। খাটের বিছানায় চন্দ্রা নেই। ওর অস্বস্তি বাড়লো। উঠে বসলো। গলা শুকিয়ে কাঠ। স্বাভাবিক। গতকাল রাত্রে পানের মাত্রা বেশ বেশিই হয়েছিল। কথাটা মনে হতেই, অস্বস্তি আরও এক পর্দা বাড়লো।

খাটের পাশেই, ছোট টুলের ওপর ঢাকা দেওয়া জলের গেলাস ছিল। অনিন্দ্য গেলাসের ঢাকা তুলে, গেলাস নিয়ে, ঢকঢক করে পুরো গেলাসটা শেষ করলো। একটু আরাম। ডানলোপিলোর গদি পাতা, বড় খাটের বিছানার বাঁ দিকে আবার তাকালো। চন্দ্রা নেই. না থাকবারই কথা। চন্দ্রা কোনোদিনই বেশি বেলা অবধি ঘুমোয় না। ওর ভাষায় যা ছাই-পাশ—অর্থাৎ মদ, ও তো খায় না। তাছাড়া, চন্দ্রা যতো রাত্রেই ঘুমোক, ভোরবেলা ঠিক উঠে পড়ে। সকালে ঘুম থেকে উঠে, অনিন্দ্য কোনোদিনই চন্দ্রাকে বিছানায় দেখতে পায় না। অতএব, সেটা নিয়ে অবাক হবার কিছু নেই। কিন্তু অনিন্দ্যর মনে অস্বস্তি আর অস্বাচ্ছন্দ্যের মাত্রাটা আরও বাড়লো। কারণ চন্দ্রার বালিশ নেই। আর বিছানা দেখেই বোঝা যাচ্ছে,

চন্দ্রা গত রাত্রে এ খাটে শোয় নি। এবং, তারপরেও কথা আছে। চন্দ্রা রোজই অনিন্দ্যকে ডেকে দেয়, 'শুনছো? বেলা আটটা বেজে গেল। এরপরে হুড়োহুড়ি করে বেরোবার জন্য তৈরি হতে গিয়ে, হাঁপিয়ে উঠবে। উঠে পড়, আমি চা নিয়ে আসছি।'

অবিশ্যি রোজই চন্দ্রা সকালে ডেকে দেয় না। কালে ভদ্রে নিয়মের ব্যত্যয় ঘটে। তার কারণ, আগের রাত্রের কিছু খিটিমিটি ঘটনা। সব রাত তো আর সমান যায় না। মাঝে মধ্যে, কোনো কারণে, ঝগড়া বিবাদ হয়ে যায়। কথা কাটাকাটি হয়। হলেই, চোখের জলও একতরফা ঝরে। এবং মান ভাঙাভাঙি, আদর সোহাগ হলে, রাত্রেই মিটমাট হয়ে যায়। মিটমাট না হলেই, সকালে আড়ি। চন্দ্রার ডাক শোনা যায় না। আর, তুজনের এ সংসারের নিয়মানুযায়ী, অনিন্দ্যকে ঘুম থেকে ডেকে তোলার অধিকার কারোর নেই। অতএব চা দেবারও কথা নেই। সে-অধিকার, মধ্যবয়সা, কিন্তু বেশ শক্ত সমর্থ তিলকারও নেই। অথচ, সবদিক খতিয়ে দেখতে গেলে, তিলকা ছাড়া এ সংসার অচল। তিলকা রান্না করে। কাজের ছেলে সুধীরকে সে-ই চালায়। ঘর দরজা কোথায় কী কতোখানি সাফসুরত থাকলো না থাকলো, তার তদারকিও তিলকাই করে। জামাকাপড় কী কাচা হবে না হবে, বাসন-কোসন কতোটা কী ধোয়াধুয়ি হলো না হলো, বা হবে, নীলাকে তার নির্দেশ তিলকার কাছ থেকেই নিতে হয়। সুধীরের বয়স আঠারো উনিশ। নীলার বয়স তার চেয়ে তু এক কম। তুজনের ওপরেই খবরদারি করার অধিকার তিলকার। তুজনের ঝগড়া-বিবাদ প্রায় লেগেই থাকে। বকা ধমক সালিশি থেকে মিটমাট, সবই তিলকার হাতে। এমন কি, সুধীর আর অবিবাহিতা দক্ষিণাঞ্চলের মেয়ে নীলার মধ্যে বেশি হাসাহাসি বিগলিত ভাবসাব, সে-সবের ওপরেও নজরদারির দায়িত্বও তিলকার। তু'জনের কারোর বয়সটাই ভালো না। হঠাৎ ঝগড়া, হঠাৎ হাসি, লক্ষণগুলো মোটেই যে সুবিধের না, নিঃসন্তান, বিধবা, সংসারে যথেষ্ট পোড়খাওয়া তিলকা তা ভালোই বোঝে।

অনিন্দ্য সারাদিনে আর কতোক্ষণই বা বাড়িতে থাকে। অনিন্দ্য বেরিয়ে

গেলে, চন্দ্রাও একলা হয়ে যায়। ও-ই বা বাড়িতে বসে কী করবে? কোনো চাকরি-বাকরি করে না। না করার মতো বিদ্যাবুদ্ধির অভাব নেই। কিন্তু অনিন্দ্য মুস্তফির বউ চাকরি করতে যাবে কোন্ দুঃখে। সেল্ফ-মেড ম্যান অনিন্দ্য, সংসারে অচলা লক্ষ্মীর আসন পেতেছে। ইস্পাত আর কয়লার সঙ্গে, অচলা লক্ষ্মীর একটি অন্তর্গূঢ় সম্পর্ক ও তৈরি করতে পেরেছে। সেই সম্পর্কের ভিতর দিয়েই সাদা কালোয়, ওর অচলা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে, বছরে অন্তত লাখ চারেট টাকা, একরকম থিতু হয়েই আছে।
অনিন্দ্য বিদ্যা তেমন অর্জন করতে না পারলেও, বুদ্ধি ওর তীক্ষ্ণ। দূরদর্শী, ভবিষ্যৎ আঁচ করতে পারে। ব্যবহার অত্যন্ত অমায়িক। কাজটা যতোই জটিল হোক, ও খুব অনায়াসেই সিদ্ধিলাভের পথগুলো আয়ত্ত করেছে। অবিশ্যি অনায়াসের মধ্যেও, কাজটিতে যথেষ্ট দম আর ডুব সাঁতারে দক্ষ হওয়া দরকার। সে-দক্ষতাও ওর আছে। ওর বাবার অনেক কটি সন্তানের মধ্যে, সকলেই মোটামুটি দাঁড়িয়েছে। সেদিক থেকে, অনিন্দ্যর ওপর ওর প্রথিতযশা ব্যবসায়ী পিতার আস্থা কম ছিল। কিন্তু ও প্রমাণ করে দিয়েছে, অন্যান্য দাদা ভাইদের তুলনায় ও 'মোটামুটি' দাঁড়ায় নি। সকলের থেকে ওর দাঁড়ানো শির উঠেছে অনেক বেশি মাথা ছাড়িয়ে। অবিশ্যি অনিন্দ্য জানে, ওর কাজটার সঙ্গে এমন সব ব্যবস্থা জড়িয়ে আছে, যে-কোনোদিনই অনেক কিছু ওর হাত ফস্‌কে বেরিয়ে যেতে পারে। সেটা ভেবে, ও ভবিষ্যৎকে সুদৃঢ় করেছে নানা উপায়ে। সংসারে কেবল ইস্পাত আর কয়লাই সম্পদ না। সম্পদ বহুতর ও বিবিধ। ও সবখানেই অচলা লক্ষ্মীর আসন ছড়িয়ে রেখেছে।
চন্দ্রা বম্বে প্রবাসী বাঙালী পরিবারের মেয়ে। অনিন্দ্যর সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল দূর আত্মীয়তার সূত্রে, কলকাতায় এক আত্মীয় গৃহে। ইংলিশ মিডিয়ামে লেখাপড়া শিখলেও, চন্দ্রার পারিবারিক পরিবেশ ছিল নিতান্তই হিন্দু বাঙালিয়ানার ছকে বাঁধা। অবিশ্যিই আধুনিকতার ছোঁয়াও ছিল। রূপসী হয়তো ওকে বলা যায় না। তবে সুন্দরী বলতে হয়। ফরসা, উজ্জ্বল চেহারা, নাতিদীর্ঘ শরীরের গঠন নিখুঁত। ডাগর চোখ, চোখা নাক,

ঈষৎ পুষ্ট ঠোঁট—সব মিলিয়ে একটা শ্রী আছে। চোখে মুখে আছে বুদ্ধির দীপ্তি। সাজসজ্জায় রুচিশীলতা বর্তমান। চেহারায় পোশাকে চলনে বলনে ও মড্। কিন্তু মড্ বলতে আর যা কিছু বোঝায়, সেগুলো ও রপ্ত করতে পারে নি। পার্টিতে গিয়ে নাচতে ওর গভীর অনীহা। মদ্য ও ধূমপানের অরুচিটা প্রায় শুচির সংস্কারে বাঁধা। একমাত্র স্পোর্টিং বলতে ও গাড়ি চালাতে ভালবাসে। চালাতে পারে ভালো। ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে।
অনিন্দ্য নিজের থেকেই চন্দ্রাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল। অনিন্দ্য স্বাস্থ্যবান, সুগঠিত চেহারার স্মার্ট যুবক। বিয়ের আগেই ও মধ্য কলকাতায় একটি ফ্ল্যাট কিনে, মনের মতো করে সাজিয়েছিল। গাড়ি ড্রাইভ করতো নিজে। ওর আর্থিক অবস্থা দেখে, চন্দ্রার বাড়িতে বিয়েতে কোনো আপত্তি ছিল না। চন্দ্রা নিজেও অনিন্দ্যকে পছন্দ করেছিল। অতএব, বিয়েটা ঘটেছিল নির্বিঘ্নেই।
বস্তুতপক্ষে, ওদের সুখী দম্পতিই বলতে হবে। চার বছরের বিবাহিত জীবনে, এখনও কোনো সন্তানের আবির্ভাব ঘটে নি। বিয়ের পরে, এই নতুন ফ্ল্যাট কিনেছে অনিন্দ্য। বিলাসবহুল বলতে যা বোঝায়, তিন বেডরুমের, আড়াই হাজার স্কোয়ার ফুটের ফ্ল্যাটটি সাজিয়েছে সেই ভাবেই। আগের ফ্ল্যাটটি ও ভাড়া দেয় নি। সাজানো গোছানো ফ্ল্যাটটিতে মাঝে-মধ্যে পার্টি হয়। বন্ধুরা ব্যবহারের জন্য চাইলে পায়। তাছাড়া, ফ্ল্যাটটা ওর কাজের ব্যাপারেও নানাভাবে সাহায্যে আসে। চন্দ্রার সারাদিনের একাকিত্বের কথা ভেবে ওকে একটা গাড়ি কিনে দিয়েছে। ওর পরিবারে তিলকার মতো একজন মধ্যবয়স্কা, অভিজ্ঞা বুদ্ধিমতী, সবরকম কাজে পারদর্শিনী একজনের খুব দরকার ছিল। তিলকাকে যোগাড় করে দিয়ে-ছিলেন অনিন্দ্যর মা। অনিন্দ্য সংসারের সব দায়িত্ব চন্দ্রার হাতে দিলেও, জানতো, চন্দ্রা তিলকার ওপরেই নির্ভরশীল। বিশ্বাসী আর সৎ তিলকার হাতে চন্দ্রা টাকাপয়সাও রাখে। বাজার করতে গেলে, তিলকাকে ছাড়া চলে না। কারণ, চন্দ্রা শাশুড়ির সঙ্গে ঘর করতে অভ্যস্ত হয় নি। বিয়ের পরেই স্বামীর সঙ্গে আলাদা বাস। ফলে, ওকে তিলকার কাছেই আত্ম-

সমর্পণ করতে হয়েছে। সংসারের যাবতীয় ব্যাপারে, ওর উপদেষ্টা তিলকা। বাকিদের পরিচালনার দায়িত্বটাও অতএব তিলকার হাতেই। অনিন্দ্য যখন সারাদিনের জন্য বেরিয়ে যায়, চন্দ্রাও সেজেগুজে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। কলকাতা শহরে ওর নিজের বাপের বাড়ির সম্পর্কের কেউ কেউ আছে। তা ব্যতিরেকে, ও নিয়মিত শাশুড়ির কাছে যায়। বলতে গেলে, অনিন্দ্যর বাবা মায়ের সঙ্গে সম্পর্কটা এখন চন্দ্রাই বেশি বজায় রেখে চলেছে। ননদদের সঙ্গেও যোগাযোগটা ওর বেশি। তবে মাঝে মাঝেই, সন্ধ্যায় ওকে অনিন্দ্যর সঙ্গে বেরোতে হয়। সেটা যে কেবল নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে তা না। ছুটির দিনে বিশেষ করে, দুজনেই বাইরে খেতে যায়। সুযোগ পেলে আশেপাশে বেড়াতে বেরিয়ে পড়ে।

অনিন্দ্যর সঙ্গে জীবনের সব দিকটাই চন্দ্রা প্রায় মানানসই। বাইরের কোনো কোনো বিষয় বাদে। সেগুলো হলো, অনিন্দ্যর বান্ধবীদের সঙ্গে পানের মাত্রার সঙ্গে, একটু বেশি ঘনিষ্ঠতার অ্যাধিক্য সেখানে ঈর্ষার সঙ্গে একটা অপমান বোধও ওকে কষ্ট দেয়। যদিও অবিশ্যি অনিন্দ্য অন্যান্য সময় আদর্শ স্বামী। এবং চন্দ্রাকে বোঝাতে চেষ্টা করে, ওসব নিতান্তই 'ফান'। ওগুলোকে মূল্য দেওয়া অর্থহীন। কিন্তু চন্দ্র যেহেতু অন্যান্য মেয়েদের মতো ফ্লার্ট করতে পারে না, মদ্যে ধূমে বেহেড হতে পারে না —চায়ও না সেই হেতু অনিন্দ্যর আচরণ ওর অসহ্য বোধহয়। অবিশ্যি চার বছরে চন্দ্রা অনেকটা ধাতস্থ হয়েছে. একান্তভাবে আশ্বস্ত হতে পারেনি। আর বাড়ির ভিতরে, চন্দ্রার একটি ছোটখাটো মন্দির আছে। সেখানে কালীর পট স্থাপিত। অনিন্দ্যর সঙ্গে, সেখানেও ওর কোনো যোগাযোগ নেই। কিন্তু চন্দ্রার ভক্তি কালীতেই। শনি মঙ্গলবার. নিজে গাড়ি চালিয়ে ও কালীঘাট পূজা দিতে যায়। বাঙালী মেমসাহেবের কালীভক্তি, কালীঘাট পাড়ায় ওকে বেশ পরিচিত করেছে।

অনিন্দ্যর বয়স এখন আটত্রিশ। স্বাস্থ্য চেহারা যতোই ভালো হোক, মেয়েদের হাত থেকে একেবারে রেহাই পায় নি। ওর গায়ে এখন পাতলা হাতকাটা গেঞ্জি। পরনে বাটিকের কাজকরা রেশমী লুঙ্গি। ও খাটের

ওপর বিছানায় কয়েক মুহূর্ত চুপ করে বসে রইলো। ভাবতে চেষ্টা করলো গতরাত্রে কী ঘটেছে। কিন্তু, অতিরিক্ত সুরা পানের অন্ধকার ছিন্ন করে, সব ঘটনা স্মৃতিপটে জাগিয়ে তোলা কঠিন।

গতকাল রাত্রে এক হোটেলের মিট দ্য গেস্টস রুমে পার্টি ছিল। একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এসেছিলেন। তাঁর অনারেই পার্টি। মন্ত্রী বেশিক্ষণ ছিলেন না। এসব স্পষ্টই মনে আছে। পান ভোজন চলেছিল অনেক রাত্রি পর্যন্ত। কতো রাত্রি পর্যন্ত, অনিন্দ্যর পক্ষে তা মনে করা সম্ভব না। মাস কয়েক আগে, গাড়ি চালিয়ে একটা অ্যাকসিডেন্ট করার পর, অনিন্দ্যর ড্রাইভিং বন্ধ হয়েছিল। গাড়ি চালিয়েছিল ড্রাইভার। অবিশ্যি ও ড্রাইভার রাখতে চায় নি। যুক্তি ছিল, ড্রাইভিং করতে হবে বলেই, ও কখনও মাত্রারিক্ত পান করার সাহস পাবে না। কিন্তু চন্দ্রার কোনো ভরসা ছিল না। ড্রাইভার নিযুক্ত করতেই হয়েছিল। সম্ভবত চন্দ্রা ড্রাইভার রেখে, অন্যদিক থেকেও নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিল। অনিন্দ্য নিজে গাড়ি ড্রাইভ করলে, ও স্বাধীন ভাবে যাকে খুশি গাড়িতে তুলতে পারে। ড্রাইভার থাকলে, স্বভাবতই তা পারবে না। একটা চোখের লজ্জাও তো আছে। তবে, অনিন্দ্য দেখেশুনে যে ড্রাইভারকে নিয়েছে, সে-সব ভয় ওর নেই। ড্রাইভার হতে হবে এমন একজন লোককে, যে মালিকের বিশ্বস্ত হবে সব দিক থেকে।

অনিন্দ্য এখন সব কথা মনে না করতে পারলেও, ড্রাইভার ওকে কিছু সংবাদ দিতে পারবেই। অন্তত ও কী অবস্থায় বাড়ি ফিরেছিল, মোটামুটি তার একটা বর্ণনা ড্রাইভার রতনের কাছ থেকে পাবেই। তবু ও সুরাচ্ছন্ন অন্ধকারের স্মৃতি হাতড়ে তেমন কিছুই খুঁজে পাচ্ছে না। ও কি কারোর সঙ্গে নেচেছিল? কোনো মেয়ের গলা জড়িয়ে ধরেছিল? বাড়াবাড়ি রকমের নিত্যকেত্য? অথবা স্ল্যাং কোনো কথা?

আহ্! এই তো, মনে পড়ে যাচ্ছে! সুহাসের স্ত্রী চিত্রার সঙ্গে অনিন্দ্য যখন মজার গল্প করছিল, করতে করতে, দুজনেই হেসে শোফায় লুটিয়ে পড়েছিল। কিন্তু লুকিয়ে তো কিছু করে নি? যা করেছিল, সকলের সামনেই

করেছিল। আর? আর কিছু? হুঁ! আরও একটা বোধহয় কিছু করে-ছিল। খুব আবছা মনে পড়ছে, সবাই হাততালি দিয়ে, ওর নাম করে চিৎকার করেছিল। আর তো কিছুই মনে পড়ছে না? চন্দ্রাকে কি রেগে গিয়ে কিছু বলেছিল? গাড়িতে ফেরার সময়? বা বাড়িতে? হুঁ, নিশ্চয়ই তাই। কিন্তু কী বলেছিল?

অনিন্দ্য মনে করতে পারছে না। অস্বস্তির পরিবর্তে মনে উদ্বেগ জাগলো। অনুশোচনাও হলো, কেন যে এতো বাড়াবাড়ি করি। ও খাট থেকে নেমে, লুঙ্গিটা বিন্যস্ত করে কোমরে বাঁধলো। সুধীর ভেজানো দরজা ঠেলে, পর্দা সরিয়ে ঘরের মধ্যে উঁকি দিল। দিয়েই অদৃশ্য হয়ে গেল। তার মানে, চন্দ্রার নির্দেশেই সুধীর দেখতে এসেছিল, অনিন্দ্যর ঘুম ভেঙেছে কি না। কিন্তু চন্দ্রা যে আসবে না, তা ও জানে। অতএব, এরকম ক্ষেত্রে যা করে থাকে, তাই করলো। শোবার ঘরের বাইরে গিয়ে, ডাইনিং টেবলে বসলো। কেউ কোথাও নেই। ও ড্রইংরুমের দেওয়ালের দিকে তাকালো। সুদৃশ্য দেওয়াল ঘড়িতে আটটা বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিট। অসম্ভব দেরি হয়ে গিয়েছে। চন্দ্রা হয়তো ওর গোঁসা ঘরে আছে। রাগ করলে, যে-ঘরে ও রাত্রে শোয়। যে-ঘরে ওর কালীর ছবি আছে সংযুক্ত বাথরুমে, এতক্ষণে চন্দ্রা নিশ্চয়ই স্নান সেরে নিয়েছে। ব্রেকফাস্ট নিশ্চয়ই খায় নি। অন্যান্য দিন চন্দ্রা অনিন্দ্যর সঙ্গে ব্রেকফাস্ট খায়। নিজেই পরিবেশন করে। অবিশ্যি তৈরি করে তিলকা। অনিন্দ্য ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়ে যায়। লাঞ্চ বাইরেই সারে। আর এরকম দিনে, যদি চন্দ্রা খুব রেগে থাকে, তবে প্রথম চা থেকে ব্রেকফাস্ট, সবই তিলকা দেয়। অনিন্দ্য সেই ফাঁকে, চন্দ্রার রাগ ভাঙাবার জন্য ওর গোঁসা ঘরে যায়। রাগ ভাঙাতে পারলে, চন্দ্রা খাবার টেবলে আসে। না পারলে, বাধ্য হয়েই ওকে তখনকার মতো বেরিয়ে যেতে হয়। সন্ধ্যায় তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসে। মান ভাঙাভাঙির পালা চলে। পালা শেষে, দুজনের একত্র বাইরে নিষ্ক্রমণ।

তিলকার পরনে সাদা থান। সাদা জামা। মাথায় থানের ঘোমটা। টেবলে এক কাপ চা অনিন্দ্যর সামনে রেখে চলে গেল। অনিন্দ্য আর একবার

ঘড়ির দিকে দেখে, তাড়াতাড়ি চায়ের কাপে চুমুক দিল। চা শেষ করে, ঘরে ফিরে গিয়ে, ছোট একটা ডেস্কের ওপরে রাখা সিগারেটের প্যাকেট, ধরালো লাইটার দিয়ে। এয়ার কুলার মেশিনটা বন্ধ করে বাথরুমে ঢুকে গেল।

বাথরুম থেকে বেরলো একেবারে দাড়ি কামিয়ে স্নানপর্ব সেরে। সাধারণত এরকমই রোজ করে থাকে। এবং প্রত্যহের মতো, ওয়ারড্রোব খুলে বাইরে বেরোবার পোশাক পরে নিল। জানালার পর্দাগুলো সরাতেই ঘরে দিনের আলো ছড়িয়ে পড়লো। ছোট ডেস্কের ওপরে রাখা অ্যাটাচি-কেসটা একবার খুলে দেখলো। কাগজপত্র নাড়াচাড়া করলো। সবই ঠিক আছে। কিছু নেবার নেই। ঘর থেকে বেরলো একেবারে তৈরি হয়ে : ডাইনিং টেবলের চেয়ারের পায়ার কাছে অ্যাটাচিটা রেখে, একবার চার-দিকে দেখলো।

নীলা রান্নাঘরের দরজার কাছ থেকে একবার উঁকি দিয়ে দেখলো। তার-পরেই আবার ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

চন্দ্রা কি রান্নাঘরের ভিতরে আছে ? ও ডাকলো, 'নীলা।'

নীলার মুখ আবার রান্নাঘরের দরজায় দেখা গেল। অনিন্দ্য জিজ্ঞেস করলো, 'বউদি কি ওখানে ?'

নীলা মাথা নাড়লো, 'না।'

অনিন্দ্য চেয়ারে না বসে, চন্দ্রার গোঁসা ঘরে গেল। ভেবেছিল দরজা বন্ধ দেখবে। কিন্তু দরজা খোলাই ছিল। অনিন্দ্য পায়ের জুতো খুলে দরজার বাইরে রাখলো। চন্দ্রা কারোকেই এ ঘরে জুতো পরে ঢুকতে দেয় না। অনিন্দ্য ভিতরে ঢুকে দেখলো, ঘর শূন্য। খাটের বিছানায় বালিশ। কিন্তু বিছানা ইতিমধ্যেই ফিটফাট ঢাকনা দিয়ে সাজানো। ঘরে ধূপের গন্ধ ছড়ানো। এক কোণে কাঠের তৈরি একটি ছোট মন্দির। মিনির থেকেও ছোট। অনিন্দ্য বাথরুমের বন্ধ দরজার দিকে তাকালো। চন্দ্রা কি তাহলে বাথরুমে রয়েছে। ও এগিয়ে গিয়ে বাথরুমের দরজায় নক করলো, 'চাঁদ কি ভেতরে আছো ?'

কোনো সাড়াশব্দ পেলো না। অনিন্দ্য দরজায় কান পেতে শুনলো। সামান্য কোনো শব্দও নেই। ও দরজার হাতল ঘুরিয়ে খুললো। শূন্য বাথরুমে সাবান আর শ্যাম্পুর গন্ধ। ও দরজাটা টেনে বন্ধ করে ডাইনিং টেবলে ফিরে এলো। দেখলো ব্রেকফাস্ট সাজানো। একটু দূরেই তিলকা দাঁড়িয়ে আছে। অনিন্দ্য চেয়ারে বসে জিজ্ঞেস করলো, 'চন্দ্রা কোথায়?'
'উনি সেই ভোরেই বেরিয়ে গেছেন।' তিলকা শুকনো গলায় জবাব দিল
বেরিয়ে গেছেন? এটা তো একটা নতুন ঘটনা! চন্দ্রা যতো রাগই করুক, ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরিয়ে যায় না। জিজ্ঞেস করলো, কোথায় গেছে, কিছু বলেছে?'
'না।' তিলকা শুকনো স্বরে জবাব দিল, 'ভোরবেলা উঠে, চানটান সেরে, মা কালীর ছবি নিয়ে বেরিয়ে গেছেন।'
মা কালীর ছবি নিয়ে? এ যে আরোই নতুন আর অভিনব ঘটনা! অনিন্দ্য খাবারে হাত দিতে ভুলে গেল। তিলকার দিকে তাকালো। তিলকাই আবার বললো, 'আমি জিজ্ঞেস করেছিলুম, কোথায় যাচ্ছেন? বাবু জিজ্ঞেস করলে, কী বলব? বললেন, কিছু বলতে হবে না। আর যদি বলতেই হয়, বলো, আমি যে-দিকে দু চোখ যায়, সেদিকেই যাব। আমাকে যেন খোঁজ-টোঁজ না করা হয়।'
অনিন্দ্যর ব্রেকফাস্ট খাওয়া মাথায় উঠে গেল। যে-দিকে দু চোখ যায় মানেটা কী? ও আবার জিজ্ঞেস করলো, 'গাড়ি নিয়ে গেছে?'
'না।' তিলকা বললো, 'গাড়ির চাবি রেখে গেছেন। শুধু কালীর ছবি আর একটা ব্যাগ নিয়ে গেছেন। ঘরের স্টিলের আলমারির চাবিও রেখে গেছেন।' তিলকা গাড়ির আর আলাদা একটা চাবির গোছা ডাইনিং টেবিলের ওপরে রাখলো।
ব্রেকফাস্ট খাবার বদলে, অনিন্দ্য একটা সিগারেট ধরালো। চোখে তার উদ্বেগ। অ্যালকোহল স্ফুরিত মুখে দুশ্চিন্তা, 'সুধীর কোথায়?'
সুধীর নিজেই পিছন থেকে এগিয়ে এলো, 'আজ্ঞে?'
'নিচের থেকে ড্রাইভারকে ডেকে নিয়ে এসো।' অনিন্দ্য চেয়ার ছেড়ে

উঠে, ড্রইংরুমে টেলিফোনের সামনে গিয়ে বসলো। রিসিভার তুলে ডায়াল করলো। ওপার থেকে মহিলা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'হ্যালো।' অনিন্দ্য বলল, 'আমি বটু (ওর ডাক নাম) বলছি। কে? মা?·· ইয়ে, চন্দ্রা কি ও বাড়ি গেছে?···যায় নি?···না, সেরকম কিছু নয়, ঐ একটু ইয়ে · ঠিক আছে, পরে কথা বলবো। চন্দ্রা যদি ওবাড়ি যায়, এখানে একটা ফোন করে জানিয়ে দিও।'

কথা শেষ করেই, অনিন্দ্য রিসিভার নামিয়ে, আবার তুললো। আবার ডায়াল করলো। আবার মহিলা স্বরই ভেসে এলো। অনিন্দ্য বললো, 'কে, পুষি? আমি নন্দা বলছি। চন্দ্রা কি তোদের ওখানে গেছে? · যায় নি?···না, তেমন কিছু নয়। আচ্ছা, পরে ফোন করবো।'

অনিন্দ্য এরকম পাঁচ জায়গায় টেলিফোন করলো। চন্দ্রা সাধারণত যেখানে প্রায়ই গিয়ে থাকে। কিন্তু সেসব কোনো জায়গাতেই ও যায় নি। অবিশ্যি কারোর মুখের কথায় ও বিশ্বাস করছে না। নিজে সব জায়গায় একবার গিয়ে খোঁজ করবে। ইতিমধ্যে রতন এসে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। অনিন্দ্য শোফা ছেড়ে উঠে, রতনকে ডাকলো, 'এসো।'

অনিন্দ্য নিজের শোবার ঘরে ঢুকলো। রতন সে-ঘরে ঢুকে, কার্পেটের বাইরে দাঁড়ালো। অনিন্দ্য জিজ্ঞেস করলো, 'কাল কতো রাত্রে আমরা ফিরেছি?'

'তা প্রায় দেড়টা হবে।' রতন সম্ভ্রমের সঙ্গে জবাব দিল।

অনিন্দ্য একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করলো, 'মেমসাহেবের সঙ্গে কি গাড়িতে কোনো ঝগড়া-বিবাদ হয়েছিল?'

'মেমসাহেব কাঁদছিলেন।' রতন মাথা নিচু করে জবাব দিল।

অনিন্দ্য রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করলো, 'আর আমি? আমি কী করছিলাম?'

রতন মাথা নিচু করে রইলো। কোনো জবাব দিল না। অনিন্দ্য উদ্বেগে ও বিরক্তিতে জিজ্ঞেস করলো, 'চুপ করে থেকো না। যা যা ঘটেছে, সবই খুলে বল।'

'আপনি ইয়ে মানে মেমেসাহেবকে খুবই ইয়ে করছিলেন।' রতন থেমে

থেমে বললো, 'আদর-টাদর—।' চুপ করে গেল।

আদর-টাদর! তবু রক্ষা! ঝগড়া-বিবাদ করি নি। অনিন্দ্য কথঞ্চিৎ স্বস্তি বোধ করলো, 'তারপর আর কোনো—মানে মেমসাহেব—'।

'রেগেও যাচ্ছিলেন।' রতনের মুখ নিচু 'কাঁদতে কাঁদতেই বলছিলেন, আমি তোমার একটা পোষা কুকুর নই, যেখানে সেখানে এভাবে আদর করবে। এরকম করলে আমি গাড়ির দরজা খুলে রাস্তায় ঝাঁপিয়ে পড়ব।'

রাস্তায় ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছিল? মুহূর্তেই অনিন্দ্যর স্বস্তি দূর হয়ে গেল, 'তারপর?' 'এখানে পৌঁছে, গাড়ি পার্ক করলাম।' রতনের ভাবভঙ্গি গলার স্বর একই রকম, 'মেমসাহেব আগে নেমে গেলেন, আপনি তাঁর শাড়ির আঁচল চেপে ধরেছিলেন। আর টলতে টলতে লিফ্‌ট। আর আমি কিছু দেখি নি স্যার।'

তার মানে, রতনের কাছ থেকে আর কিছু জানার নেই। কিন্তু অনিন্দ্যর উদ্বেগ বেড়েই চললো,'আচ্ছা, তুমি নিচে গিয়ে অপেক্ষা কর। যাবার আগে তিলকাকে একবার এ ঘরে পাঠিয়ে দাও।'

রতন বেরিয়ে গেল। অনিন্দ্য জানে, যতো রাত্রিই হোক, অনিন্দ্যরা না ফিরে আসা পর্যন্ত তিলকা জেগে থাকে। এবং সে-ই দরজা খুলে দেয়। তিলকা এসে দরজার সামনে দাঁড়ালো। অনিন্দ্য একবার গলা খাকারি দিল। 'কাল রাত্রে আমি একটু ইয়ে ছিলাম। বাড়ি ফিরে কী করেছি, কী বলেছি, কিছুই মনে নেই। আমি কি চাঁদকে কোনো বাজে কথা-টথা কিছু—?'

'বলেছেন।' তিলকার স্বর শুকনো, কিন্তু স্পষ্ট, 'বলেছেন, তোমার মন অত্যন্ত ছোট। তুমি চলে যাও আমার সামনে থেকে।'

অনিন্দ্য তিলকার সামনেই প্রায় আর্তনাদ করে উঠতে যাচ্ছিল। কোনো রকমে চেপে গেল। গলায় তার রুদ্ধশ্বাস উদ্বেগ, 'তারপর?'

'তারপর আপনি শোবার ঘরে ঢুকে গেলেন।' তিলকার একই স্বর, 'বউমাও কোনো কথা না বলে, অন্য ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারপরে তো আজ ভোরেই—।' তিলকা চুপ করলো।

তারপরে আজ ভোরে স্নান করে কালীর ছবি আর ব্যাগ নিয়ে চন্দ্রা বেরিয়ে

গিয়েছে। খোঁজ টোঁজ করতে বারণ করেছে। কিন্তু খুঁজতে তো হবেই। অনিন্দ্য ভাবলো, আজ কী বার? সোমবার। গতকাল ছিল রবিবার। অপয়া রবিবার। সোমবার মানে তো বাবার বার। চন্দ্রাই বলতো। সোম-বার শিবের বার। শনি মঙ্গল মায়ের বার। তা হলে ও আজ কালীঘাটে যায় নি! আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িও যায় নি। অন্তত টেলিফোনের খবর সেই রকমই। অনিন্দ্য তিলকার কপাল অবধি থানের ঘোমটা পরা মুখের দিকে তাকালো, 'তোমার কী মনে হয় তিলকাদি? চাঁদ কোথায় যেতে পারে?'

'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনে দাদাবাবু।' তিলকার স্বর রুদ্ধ। চোখে জল।

তিলকার কাছ থেকে আর কিছু জানার নেই। দুশ্চিন্তায় আর উদ্বেগে অনিন্দ্যর মন ভরে উঠলো। তিলকা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অথচ অনিন্দ্যকে একবার অফিসে যেতেই হবে। কয়েকটা জরুরি কাজ রয়েছে। সেগুলো না সেরে, ঠাণ্ডা মাথায় কিছু ভাবতে পারছে না। ও ঘর থেকে বেরিয়ে, অ্যাটাচি হাতে তুলে নিল। বেরিয়ে যাবার উদ্যোগ করতেই, তিলকা বললো, 'খেয়ে যান।'

'সময় নেই।' অনিন্দ্য দরজার দিকে এগিয়ে গেল। 'যদি চাঁদের কোনো খবর আসে, আমাকে অফিসে একটা টেলিফোন ক'রো।' ও দরজা খুলে বেরিয়ে গেল।

দু'দিন কেটে গিয়েছে। চন্দ্রার কোনো খবরই পাওয়া যায় নি। অনিন্দ্যর স্নান খাওয়া, কাজকর্ম মাথায় উঠেছে। ও বাবার বাড়ি থেকে, সব আত্মীয়-স্বজনের কাছেই গিয়েছে। চন্দ্রা সে সব জায়গায় কোথাও যায় নি। অনিন্দ্যর বাবা পরামর্শ দিয়েছেন, আর দু একটা দিন না দেখে থানায় খবর দেওয়াটা ঠিক হবে না। কিন্তু অনিন্দ্যর মা, দিদি, বউদিরা বাবার পরামর্শ মেনে নিতে রাজি নন। দিনকাল খুবই খারাপ। চন্দ্রা একটি সোমত্থ মেয়ে। কোথায় গেল, কার পাল্লায় পড়লো, কে বলতে পারে?

খারাপটাই আগে মনে আসে।
অনিন্দ্যর বাবা পরামর্শ দিলেন, চন্দ্রার বম্বের বাপের বাড়িতে একটা ট্রাংককল করা দরকার। কিন্তু চন্দ্রার নিখোঁজ হওয়ার কথা ঘুণাক্ষরেও বলা চলবে না। বলতে হবে, চন্দ্রা বাপের বাড়ির সংবাদের জন্য খুবই ব্যস্ত হয়েছে, তাই ট্রাংককল। বাবার পরামর্শ মতো তাও করা হলো। জানা গেল, সেখানকার সংবাদ সবই কুশল। দিন সাতেক আগেই চন্দ্রার মা ওর চিঠি পেয়েছেন। জবাবও দিয়ে দিয়েছেন। অতএব, চন্দ্রা যেন অকারণ বাবা মা'কে নিয়ে দুশ্চিন্তা না করে।
অতঃপর? বাবা মা দাদা বউদি দিদি ভগ্নিপতি বোন ভাই, চন্দ্রার কলকাতার আত্মীয়-পরিবার, সকলের সঙ্গেই আলোচনা পরামর্শ শেষ। তিন দিন কেটে গেল। চতুর্থ দিনও এসে গেল। এ ক'দিনে, অনিন্দ্য কেবল প্যাকেটের পর প্যাকেট সিগারেট ধ্বংস করেছে। এক ফোঁটা হুইস্কিও গলায় ঢালে নি। ঘরে বাইরে, চারদিকেই যেন একটা অশুভ উদ্বেগের করাল ছায়া। খবরের কাগজে প্রতিটি দুর্ঘটনা খুঁটিয়ে পড়া হয়েছে। থানায় খবর না দিয়ে, আর কোনো উপায় নেই। কিন্তু তার আগে একবার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের বাড়ি খোঁজ নিলে হয় না? অবিশ্যি চন্দ্রা কোনো দিনই অনিন্দ্যর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের বাড়ি একলা যায় নি। কারোকে ওর বিশেষ পছন্দও ছিল না। আর তাদের কাছে খোঁজ নিতে গেলে, ব্যাপারটা পাঁচ কান হয়ে, ছড়িয়ে পড়বে গোটা কলকাতায়। তার সঙ্গে রটবে নানা উদ্ভট গল্প।
কিন্তু অনিন্দ্যর পক্ষে নিশ্চিন্ত থাকা সম্ভব ছিল না। টেলিফোনের সাহায্য না নিয়ে, ও বন্ধুদের বাড়ি বাড়ি গেল। মুখে আসল কথা কিছুই প্রকাশ করলো না। সকলের চোখ মুখের অভিব্যক্তি তীক্ষ্ণ চোখে দেখলো। সকলেই আপ্যায়ন করলো। আসল কথা কিছুই জানা গেল না। এবং অনিন্দ্য নিশ্চিত জানতো, বন্ধুদের বাড়িতে গেলে, ওকে জানানো হতোই। এ বিষয়ে, বেশিক্ষণ রহস্য ঠাট্টা কেউ করবে না।
চতুর্থ দিন, বিকেল পাঁচটা নাগাদ, অনিন্দ্য মাথায় হাত দিয়ে ওর অফিসের

ঘরে বসেছিল। একটা টেলিফোন এলো। ও ঝটিতি টেলিফোন তুলে নিল, "হ্যালো ?"

ওপার থেকে জবাব এলো, 'কী রে বটু, খবর কী ? অনেকদিন তোর ওখানে যাওয়া হয় নি।'

গলার স্বর শোনা মাত্রই, অনিন্দ্য চিনতে পারলো, হেবো মামা কথা বলছে। হেবো মামা মানে নির্মাল্য ঘোষ দস্তিদার। মায়ের দূর সম্পর্কের ভাই। অনিন্দ্যর থেকে বছর তুই তিনেকের বড়। বিয়ে করে নি। বেশ গুছিয়ে ব্যবসা করছে। নিউ আলিপুরে ছোটখাটো একটি বাড়ি করেছে। নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ। হেবো মামা, মামা হলেও বন্ধুস্থানীয়। অনিন্দ্যকে জীবনে অনেক কিছুই সে হাতে-খড়ি দিয়েছে। যেমন সুরা, ধূম, হোটেলে নাচ দেখতে যাওয়া। অথচ নিজে কোনো কিছুতেই তেমন জড়ায় না। অনিন্দ্যর গৃহে তার যাওয়া আসা খুবই কম। এরকম হঠাৎ হঠাৎই হেবো মামা খোঁজ নেয়। অনেকবার চন্দ্রাকে নিয়ে তার বাড়িতে যাবার নিমন্ত্রণ করেছে। যাওয়া হয়ে ওঠে নি. অনিন্দ্য বললো, 'খবর মোটামুটি। তোমার খবর কী ?

'চলে যাচ্ছে। আমার আর খবর কী। টেলিফোনে হেবো মামার হাসি শোনা গেল, 'তুই তো চন্দ্রাকে নিয়ে একদিনও এলিনে। একদিন আয়।'

অনিন্দ্য এক মুহূর্ত ভেবে নিল, চন্দ্রার নিখোঁজের কথাটা বলবে কি না। কিন্তু হঠাৎ ওর মনে কেমন একটা সন্দেহের শিখা জ্বলে উঠলো। চন্দ্রা কি হেবো মামার ওখানে গিয়েছে ? হেবো মামাকে ওর মোটামুটি পছন্দ ছিল। হেবো মামা মদ্যপান করলেও, কখনও মাত্রা ছাড়ায় না। ধূমপান ছেড়েই দিয়েছে। আর খুব মজার মজার গল্প বলতে পারে। অনিন্দ্য বললো, 'যাবো, শিগগিরই একদিন যাবো। তুমি আজ সন্ধ্যায় কী করছো?'

জবাব এলো, 'ভাবছি একটা ছবি দেখতে যাবো। পারিস তো, চন্দ্রাকে নিয়ে পরশু দিনই চলে আয় না। শনিবারের রাতটা ভালোই কাটবে।'

'দেখি। যদি যাওয়া হয়, তোমাকে টেলিফোন করবো।' অনিন্দ্য কান খাড়া করলো।

হেবো মামার জবাব এলো, 'দেখি টেখি নয়, চন্দ্রাকে নিয়ে চলেই আসিস। অনেক দিন তোদের সঙ্গে দেখা নেই। ছাড়ি এখন, হ্যাঁ ?'

'আচ্ছা।' অনিন্দ্য রিসিভার নামিয়ে রাখলো। একটা সিগারেট ধরালো। ভুরু কুঁচকে মনে নানা জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজতে লাগলো। চন্দ্রা কী করেই বা হেবো মামার বাড়ি যাবে ? কোনো দিন যায় নি, চেনে না। তা ছাড়া, হেবো মামা ব্যাচিলর মানুষ। বাড়িতে কোনো স্ত্রীলোক নেই। কাজের লোকও সব পুরুষ। চন্দ্রা কি সেখানে যেতে চাইবে ? যাবার মনস্থ করলে, ঠিকানা খুঁজে যাওয়া এমন কিছু অসম্ভব না। টেলিফোন গাইডেই ঠিকানা ছাপা আছে। আর, এত দিন পরে, হঠাৎ হেবো মামা চন্দ্রাকে নিয়ে যাবার জন্য বললেই বা কেন ?

অনিন্দ্য উঠে দাঁড়ালো। এত ভাববার কী আছে ? এখুনি একবার চলে গেলেই তো হয়। একেবারে চাক্ষুষ ভঞ্জন হয়ে যাবে। ও অফিস থেকে বেরিয়ে, নিচে নেমে গাড়িতে চেপে বসলো। রতনকে বললো, 'নিউ আলিপুর চল।'

গাড়ি ছুটলো নিউ আলিপুরে। অফিস ছুটির সময়। রাস্তায় জ্যাম্ হতে শুরু করেছে। তবু, অনিন্দ্য হেবো মামার বাড়ি পৌঁছে গেল কুড়ি মিনিটের মধ্যেই। সামনে ছোট একটি বাগান। বাগানের এক পাশে গ্যারেজ। ছোট দোতলা বাড়ি। কিন্তু গ্যারেজে গাড়ি নেই তো ? অনিন্দ্য গাড়ি থেকে নেমে, গেট খুলে, এক তলার দরজার কাছে গিয়ে কলিংবেল টিপলো। একটু পরেই, হেবো মামার পুরনো কাজের লোক, মধ্যবয়স্ক তারক দরজা খুলে দিল। অনিন্দ্য জিজ্ঞেস করলো, 'হেবো মামা নেই ?'

'না। এই মাত্তর সিনেমা দেখতে বেরিয়ে গেল। তারকের মুখ গম্ভীর, কথাবার্তার ভঙ্গিও মোটেই মোলায়েম না। তবু অনিন্দ্যকে ডাকলো, 'ভেতরে আসুন।'

অনিন্দ্য মনে মনে হতাশ হয়ে পড়লো। হেবো মামা তো মিথ্যা কথা বলে নি। সত্যি ছবি দেখতেই বেরিয়ে গিয়েছে। ও বললো, 'নাহ্, আর বসবো না তারকদা। অনেক দিন আসি নি। আর আজই হেবো মামা টেলিফোন

করেছিল। ভাবলাম, একবার দেখা করে যাই।'

'আপনাকে আসতে বলেছিলেন নাকি?' তারক ভুরু কুঁচকে, কেমন সন্দিগ্ধ স্বরে জিজ্ঞেস করলো।

অনিন্দ্য মাথা নাড়ল, 'না, আজ আসতে বলে নি। শনিবার আসতে বলেছিল। আ, তোমাদের খবর সব ভালো তো তারকদা?'

'আমাদের আর খবর।' তারকের শক্ত মুখে বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ হাসি, 'ভাবছি, এবার এখান থেকে চলে যাব। চাকরি আর করব না।'

অনিন্দ্য অবাক হলো, 'কেন? কী হলো?'

'হয় নি কিছুই।' তারক ঠোঁট উল্‌টে জবাব দিল, 'চাকরি করতে আর ভালো লাগছে না। দেশে গিয়ে চাষেবাসেই কাটাব। অনেক দিন তো হলো। তা দরজা থেকেই চলে যাবেন? ওপরে গিয়ে বসুন, একটু চা-টা কিছু খেয়ে যান। শনিবার এসে হয়তো আমাকে আর দেখতে পাবেন না। শেষ সেবা করে যাই।'

অনিন্দ্য তারকের শক্ত গম্ভীর মুখের দিকে তাকালো। কী ব্যাপার? তারক তো হেবো মামার কেবল শুভার্থী নয়, একরকমের অভিভাবকও বটে। সে এরকম কথা বলছে কেন? ওর মনে কেমন একটা খটকা লেগে গেল। ভাবলো, চা খাওয়ার নামে একটু বসেই যাবে। হেবোমামার সম্পর্কে যদি কিছু শোনা যায়। বললো, 'চলো তাহলে বসি একটু।'

অনিন্দ্য সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠলো। সবই ওর চেনা। এ বাড়িতে অনেকবারই এসেছে। এখানে ওর অবারিত দ্বার। দোতলায় দুটো শোবার ঘর। একটি বসবার ঘর। দক্ষিণখোলা বড় বারান্দা। সেখানেও বসবার ব্যবস্থা আছে। উত্তর দিকে ছোট দুটো ব্যালকনি আছে। অনিন্দ্য শোবার ঘরে ঢুকলো না। বাইরের ঘর দিয়ে, বারান্দার দিকে পা বাড়ালো। একটা শোবার ঘরে দরজা খোলা ছিল। সেই ঘরের উত্তরের খোলা জানলায় চোখ পড়তেই ও থমকে দাঁড়ালো। উত্তরের ব্যাল্‌কনিতে, নাইলনের দড়িতে, ক্লিপ আটকে মেলে দেওয়া রয়েছে একটা শায়া, আর একটা ব্রা। হেবো মামার বাড়িতে শায়া আর ব্রা শুকোচ্ছে! কী ব্যাপার?

অনিন্দ্যর মাথার মধ্যে সব গুলিয়ে গেল। কিন্তু ও সেদিকে গেল না। বারান্দায় গিয়ে বসলো। আর আকাশ-পাতাল ভাবতে আরম্ভ করলো। খানিকক্ষণ পরেই তারক এলো চা আর প্যাটিজের ট্রে নিয়ে। টেবিলের ওপর ট্রে রাখলো। অনিন্দ্য তারকের মুখের দিকে তাকালো, 'আচ্ছা, তারকদা, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?'

'বলেন।' তারকের স্বর নিস্পৃহ।

অনিন্দ্য বললো, 'হেবো মামা কি বিয়ে করেছে?'

'বিয়ে?' তারকের মুখে কঠিন হাসি ফুটলো, 'বিয়ে করলে তো ভালোই ছিল ভাগ্নেবাবু। সে তো আমি চিরকাল চেয়েছি। তা বলে, একটা উটকো মেয়েছেলেকে নিয়ে বাড়িতে তুলে, তার সঙ্গে থাকবে, এ আমি সহ্য করতে পারব না।'

অনিন্দ্য থ! 'উটকো মেয়েছেলে? কবে তাকে এনে তুললো?'

'এনে তুলবে কেন? সে নিজেই এসে উঠেছে।'

'তাই নাকি? কবে বলো তো?'

'সোমবার সকালে।' তারকের মুখ শক্ত, 'কথাবার্তা শুনে বুঝেছি, বাইরে বাইরে দুজনের মেলামেশা ছিল। দুজনেই দুজনকে চেনে।'

সোমবার সকালে! দুজনেই দুজনকে চেনে। অনিন্দ্যর স্বর প্রায় রুদ্ধ, মেয়েটির কী নাম? ম্যারেড? মানে, বিবাহিতা?'

'ও সব মেয়েছেলের বিয়ে হয়েছে কি না, কিছুই বোঝবার উপায় নেই।' তারকের ক্ষুব্ধ জবাব, 'ওসব খবরই বা কে রাখে? নামও জানিনে ভাগ্নে-বাবু, কারণ সে পটের বিবি দোতলা ছেড়ে নিচে নামেন না। আমাদের সামনে নাম ধরে কখনো ডাকতেও শুনি নি।'

অনিন্দ্য জিজ্ঞেস করলো, 'বয়স কতো হবে? দেখতে কেমন?'

'মেয়েমানুষের বয়স কি বোঝা যায় ভাগ্নেবাবু? তাও আবার ওসব মেয়ে-ছেলের? দেখতে ভালোই। বেশ শাঁসে জলে চেহারা।' তারক হুস করে একটা নিশ্বাস ফেললো, 'নিন খান। চিকেন প্যাটিজ, নিজের হাতে করেছি, এই শেষ, আর কোনোদিন করব না।'

সোমবার সকালে তো চন্দ্রাও ঘর ছেড়েছে। তবে কী। অনিন্দ্য হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, 'ত্নজনে কি একই ঘরে শোয়?'

'তা আর কে দেখতে আসছে বলেন?' তারক জবাব দিল, 'আমরা তো সবাই নিচে থাকি। তবে মেয়েমানুষ বলে কথা। এ আর জিজ্ঞাসার কী আছে?'

অনিন্দ্যর মনটা অস্থির, 'আচ্ছা, তারকদা, মেয়েটি যখন এসেছিল, তখন তার সঙ্গে কী ছিল?'

'তা তো খেয়াল করি নি।' তারক মাথা নাড়লো, 'বাবু নিজেই তখন বাগানে পায়চারি করছিল। মেয়েছেলেটাকে দেখেই খুশিতে গলে গিয়ে ওপরে নিয়ে চলে এসেছিল। তবে কয়েকটা জামা কাপড় কিনে আনতে দেখেছি। মেয়েদের জামাকপড়।'

অনিন্দ্য গভীর চিন্তায় ডুবে গেল। হেবো মামার আর আর যাই হোক, ঐ বাতিকটা কোনোকালে ছিল না। অন্তত অনিন্দ্যর জানা ছিল না। সোমবার সকালে! মিলে যাচ্ছে একটা ব্যাপারেই। কিন্তু নিশ্চিন্ত হওয়া যায় কি?

কতোক্ষণ সময় কেটে গিয়েছিল, অনিন্দ্যর খেয়ালই ছিল না। তারকের ডাকে তার সংবিত ফিরলো, 'এ কি ভাগ্নেবাবু, কিছুই খান নি? সব তো জুড়িয়ে নষ্ট হয়ে গেল।'

অনিন্দ্য দেখলো, অন্ধকার কখন নেমেছে। বাতি জ্বলছে। বাড়ির সামনে রাস্তাটা একটু অন্ধকার মতো। ওর গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে গেট থেকে একটু এগিয়ে। তারক ট্রে-টা তুলে বললো, 'প্যাটিজ গরম করে নিয়ে আসি। আর চা আবার বানাতে হবে।'

'শোন তারকদা, আমি কিছু খাবো না।' অনিন্দ্য পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার বের করলো, 'আমাকে ঠাণ্ডা এক গেলাস জল দাও। হেবো মামার সঙ্গে দেখা করে ফিরবো।'

তারক নিস্পৃহ গলায় বললো, 'দেখা করে যান। তবে মামাটিকে ফেরাতে পারবেন বলে মনে হয় না। যে লোক সারা দিন বাইরে বাইরে থাকতো,

সে লোক কয়েক ঘণ্টার জন্য বেরিয়েই ফিরে আসে।'
'সিনেমা দেখতে কি রোজ যায় নাকি?'
'না। সিনেমা দেখতে আজই প্রথম বেরলো।'
'ফিরে এসে বাড়িতেই খাবে তো?'
'তাই তো বলে গেছে।'
'আর একটা কথা তারকদা, মামা কি মদ টদও চালাচ্ছে এ কদিন?'
'মদের চেয়ে বড় নেশা হাতের কাছে থাকলে আর কেউ মদ খায়?' তারক কঠিন বিদ্রূপে হাসলো, 'ওসব বোতলটোতল সব ভুলে গেছে। তবে রাত্রে খায় কি না, জানি না।' সে ট্রে নিয়ে চলে গেল। তারক ফ্রিজ থেকে ঠাণ্ডা জলের বোতল আর গেলাস নিয়ে এলো। অনিন্দ্য সিগারেট ধরিয়ে, দু গেলাস জল গিলে ফেললো। তারপর তারকের দিকে ফিরলো, 'তুমি কাজে যাও। আমি বসে আছি।'
তারক চলে গেল। অনিন্দ্য আবার গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হলো। রাত্রি প্রায় ন'টার সময় একটা গাড়ি গেটের মুখোমুখি হেড লাইট জ্বালিয়ে দাঁড়ালো। একজন গিয়ে গেট খুলে দিল। অনিন্দ্য ঝুঁকে পড়ে গাড়ির ভেতরে দেখতে চেষ্টা করলো। চালক আসনে অস্পষ্ট হেবো মামাকে ছাড়া কারোকে দেখা গেল না। গাড়ি ঢুকে গেল গ্যারেজে। একটু পরেই হেবো মামা গুনগুন করতে করতে ওপরে উঠে এলো। হেবো মামা গুনগুনিয়ে গান করছে! কোনো দিন শোনে নি। হেবো মামা বারান্দায় এসে অবাক! কালো গোঁফ, কালো ছোট ছোট চুল, ফরসা একহারা লম্বা শক্ত চেহারা। ভ্রূকুটি চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, তুই?
'এলাম একটু।' অনিন্দ্য হেবো মামার পিছনে, দেখলো, 'তুমি একলা নাকি?'
'কে থাকে আর?' হেবো মামা ঠোঁট কুঁচকে হাসলো 'ও! বুঝি তারকের মুখ থেকে সবই শুনেছিস?'
'হ্যাঁ থাকবার কথা ছিল একজনের। কিন্তু ছবি দেখে, তাকে তার জায়গায় রেখে এসেছি। কিন্তু তোকে যেন কেমন শুকনো দেখাচ্ছে? চেহারাটা

খুবই খারাপ লাগছে। একটু চলবে নাকি ? ভালো স্কচ্ আছে।'

অনিন্দ্য হতভম্বের মতো হেবো মামার মুখের দিবে তাকিয়ে রইলো। কথা বলতে পারছে না। হেবো মামা জিজ্ঞেস করলো, 'কীরে বটু ? শরীর টরীর খারাপ লাগছে নাকি ? ওরকম তাকিয়ে আছিস যে ?'

'হেবো মামা সত্যি বলো তো, সোমবার সকালে তোমার বাড়িতে কে এসেছিল ? অনিন্দ্য জিজ্ঞেস করলো।'

হেবো মামা বিরক্ত হলো, 'কেন বল দেখি ? ওসব তো আমার প্রাইভেট ব্যাপার। তুই জিজ্ঞেস করছিস কেন ?'

অনিন্দ্য এবার না বলে পারলো না, 'সোমবার ভোরে চন্দ্রা কোথায় বেরিয়ে গেছে, কিছুই জানি নে। এখনও খোঁজ মেলে নি।'

'পুলিশকে জানিয়েছিস' ? হেবো মামা অবাক হলো।'

'এখনও জানাই নি।'

'খুব অন্যায় করেছিস। তা কী হয়েছিল ? চন্দ্রা হঠাৎ ঘর ছাড়ল কেন ?'

অনিন্দ্য যতটা পারল বললো। অনিন্দ্যর তখন চোখ ছল্‌ছল্ করছে। হেবো মামা হাসলো, 'ভাগ্নে, জীবনে এতো কিছু শিখেছো, আর বউটিকে বাগে আনতে শেখোনি ? দেখি, বেচারি এতক্ষণ গ্যারাজের ভেতর গাড়িতে বসে ঘামছে।' বলে রেলিং-এ ঝুঁকে গলা খুলে ডাকলো, 'চন্দ্রা, ও চন্দ্রা ওপরে উঠে এসো। আর পারা গেল না।'

অনিন্দ্য লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো, 'আমি যে দেখলাম, তুমি একলা গাড়ি নিয়ে ঢুকলে ?'

'তাই তো দেখছি। আমি যে দূর থেকেই গাড়ি দেখেছি। চন্দ্রা পেছনের সিটের নিচে মাথা গুঁজে বসেছিল। তাই দেখতে পাস নি।' হেবো মামা হাসলো, 'অবিশ্যি আমি তোকে আজ টেলিফোন করেছিলাম ইচ্ছে করেই। যদি বুদ্ধি থাকে, নিশ্চয়ই কিছু অনুমান করতে পারবি। হয়তো চলেই আসবি।'

অনিন্দ্য দেখলো, চন্দ্রা গ্যারাজের দিক থেকে আস্তে আস্তে হেঁটে আসছে। মাথায় আবার ঘোমটা। কিন্তু ওপরে উঠে, চন্দ্রা তখনই বারান্দায় এলো

না। হেবো মামা বললো, 'গাধা, যা শোবার ঘরে যা। চন্দ্রা নিশ্চয় শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকেছে।'
অনিন্দ্য প্রথম শোবার ঘরে গিয়ে দেখলো, সেই শূন্য। বেরিয়ে এসে, পাশের ঘরে গেল। দেখলো, চন্দ্রা মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিছানার শিয়রে মা কালীর ছবি। অনিন্দ্য ডাকলো, 'চাঁদ।'
কোনো জবাব পেলো না। এগিয়ে সামনে গেল। চন্দ্রার ছু চোখ জলে টলটল করছে। অনিন্দ্য আবেগভরে ডাকলো, 'চাঁদ! চাঁদ তুমি।'
'মরি নি, বেঁচে আছি।' চাঁদ রুদ্ধ স্বরে বললো, 'এর পরে সত্যি মরবো। তুমি তো আমাকে তাড়িয়েই দিয়েছো। কেন খুঁজতে এলে?'
অনিন্দ্য তার জবাবে, নিজেই আবছা দেখলো। আর চন্দ্রাকে ছু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলো।
দরজার কাছ থেকে হেবো মামার গলা শোনা গেল, 'যত্তো সব পেঁচি মাতালের ব্যাপার।'

বনমালী

বনমালীকে যে ঠিক কী ধরনের চরিত্রের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তেমন কোনো সিদ্ধান্তে আশা খুব কঠিন। বস্তুতপক্ষে সেরকম কোনো তুলনাই বোধহয় করা যায় না। অথচ তার চরিত্রের মধ্যে যে একটা অসাধারণ, অবিস্মরণীয় ঘটনা ঘটাবার মতো তুরন্ত ধারালো, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে, বাইরে থেকে খুবই নিরীহ, কোনো ক্ষমতা আছে, তা বেশ কয়েকবার সে প্রমাণ করেছে।

"কানভাঙানি দেওয়া" বলে একটা কথা আমাদের সমাজে খুবই প্রচলিত আছে। এই মুহূর্তে আমাদের কোনো প্রাচীন কাব্য বা নাটকের চরিত্রের কথা মনে করতে পারছি না, কানভাঙানি দিয়েই যে বিষম অঘটন ঘটিয়েছে। কিন্তু "কানভাঙানি দেওয়া" সেই ভয়ংকর কুখ্যাত অবিস্মরণীয় 'ইয়াগো'-র কথা মনে পড়ছে। যে ইয়াগো খুব ঠাণ্ডা মাথায়, ঈর্ষার জ্বালায়, ওথেলোকে কান ভাঙানি দিয়ে, প্রাণে সন্দেহের বিষ ঢুকিয়ে, ডেসডোমোনিয়াকে হত্যা করিয়েছিল। কানভাঙানি দেওয়া মানেই, তার মূল বীজটি মিথ্যা দিয়ে তৈরি করতে হয়। আর তা বেশ ঠাণ্ডা মাথায় কার্যকরীও করতে হয়। ইয়াগো চরিত্র যেমন কুখ্যাত ও অবিস্মরণীয় তেমনি চিরকালীন। সেক্স-পীয়রের নাটকে ইয়াগোকে আমরা পুরুষ চরিত্র হিসাবে পেয়েছি। কিন্তু অভিজ্ঞরা কে না জানে, ঐ ভয়ংকর প্রবৃত্তিটি নারীদের মধ্যেও আছে! এবং এ যুগেও, আমাদের আশেপাশেই অনেক মেয়ে পুরুষ ইয়াগো নানান ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেক্সপীয়রের যুগের তুলনায় এ যুগে তারা নিশ্চয় অনেক বেশি সতর্ক, সাবধান আর চতুর। নিরীহ, অমায়িক, ভদ্র বা অতি সজ্জন বিদুষী মহিলা। এমন কি তাদের মধ্যে থাকতে পারেন সমাজের নামী দামী পুরুষ মহিলা। কোনো প্রতিভাও যদি তাঁদের স্পর্শ করে থাকে তাতেও অবাক হবার কিছু নেই।

এ প্রবৃত্তিটির নাম যদি আপাতত ইয়াগো বলে অভিহিত করা যায় তা হলেও কেবল কি ঈর্ষাই এর মূল কারণ ? এক নিশ্বাসেই 'হ্যাঁ' বলা বোধ-হয় ঠিক হবে না। কাম ক্রোধ ঈর্ষা ইত্যাদি রিপুগুলো সমস্ত জীবেই আশ্রয় করে আছে। কিন্তু জীব শ্রেষ্ঠ মানুষ যখন সেই সব রিপুগুলোর দ্বারা তাড়িত হয়, তখন প্রবৃত্তির সঙ্গে হাত মেলায় বুদ্ধি, চিন্তা, পরিকল্পনা, ষড়যন্ত্রের কূট কৌশল। বুকে হাঁটা বিষধর সাপের মতোই তার গতিপ্রকৃতি। আর তারপরেই ঘটে যায় ভয়ংকর বীভৎস মর্মন্তুদ কোনো ঘটনা।
ইয়াগো'র নামোল্লেখ করলেও, বনমালী চরিত্রের সঙ্গে তার তুলনা দেওয়া যায় বলে মনে হয় না। অথচ এই দুই চরিত্রের মধ্যে কোথায় যেন একটা সূক্ষ্ম সাদৃশ্য আছে। সেই সাদৃশ্যটা যে যথার্থ কোথায়, সেই সূক্ষ্ম সূত্রটির সন্ধান মেলা কঠিন। তবে বাইরে থেকে বোঝা না গেলেও, তাদের চরিত্র-গত মিল কিছু কিঞ্চিৎ মেলে।
স্থান, উত্তর চব্বিশ পরগনা। কলকাতা থেকে প্রায় পঁচিশ মাইল দূর। সময়, গ্রীষ্মকাল। সন্ধ্যা সাতটা বাজতে বেশি দেরি নেই। রেলওয়ে জংশন স্টেশনে আলো জ্বলেছে অনেক আগেই। ট্রেনের যাতায়াত, যাত্রীর ভিড়, প্ল্যাটফরম থেকে ওভারব্রিজের ওপর, সর্বত্রই উপছে পড়ছে। ওভার-ব্রিজের ওপর দিয়ে, যাত্রীর ভিড় চলেছে পুবে ও পশ্চিমে। পুব দিকে রেল কলোনি ছাড়াও, দেশ বিভাগের পর থেকেই গড়ে উঠেছে আরও অনেক বড় বিশাল জনপদ আর বাস্তুহারা কলোনি। বাজার অবিশ্যি পশ্চিম দিকে। বাজার আর আলোকিত বড় বড় নানা দোকানপাট, যার মধ্যে স্টেশনারি আর শাড়িজামা কাপড়েরই বেশি, এবং রাস্তার দুপাশে হকারদের স্টল, সব মিলিয়ে একটা জমজমাট ভিড়বহুল গঞ্জের রূপ নিয়েছে। স্টেশন থেকে গঙ্গার ঘাট পর্যন্ত রাস্তাটা আসলে একটা গঞ্জ বিশেষই। এই গঞ্জে কী যে নেই, তাও ভাববার বিষয়। মানুষের ভিড়ে একাধিক ধর্মের ষাঁড় মিলবেই। তা ছাড়া মানুষের যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্য সম্ভার আর খাদ্য, মদ্য গাঁজা অহিফেন, এবং বাজারে মাছ তরিতরকারি তো মেলেই। স্টেশন, ওভারব্রিজ থেকে বাজারের গোটা রাস্তার ভিড়ে,

নারীর সংখ্যা বেশি, বা পুরুষের তা নিশ্চিত করে বলা অসম্ভব। এই ভিড়ের চলাচলের ব্যস্ততা যেমন আছে, তেমনিই আছে মেয়ে পুরুষের মন্থর গতি, হাসি আড্ডা জটলা। এবং আর যা অনিবার্য, এ রাস্তা কখনোই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে পারে না।

গ্রীষ্মের এই সন্ধ্যাটি, দুটি কারণে রমণীয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু ভিড়ের জনতার সেদিকে লক্ষ্য করার সময় আছে বলে মনে হয় না। এক, দক্ষিণের বাতাস। দুই, আকাশে শুক্লা একাদশীর চাঁদ।

বনমালী ওভারব্রিজের পুব দিকের একটু ফাঁকায় দাঁড়িয়ে আছে। ফাঁকা ঠিক বলা যায় না। তবে পশ্চিমের তুলনায়, পুব দিকে কিঞ্চিৎ ফাঁকা। আর বনমালী যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে ওভারব্রিজের মাথায় শেড নেই। অতএব, সে রেল লাইনের উত্তর দক্ষিণে যেমন প্রায়ই ঘাড় ফিরিয়ে দেখছিল তেমনিই আকাশের চাঁদের দিকেও। এবং অবিশ্যিই তার পাশ দিয়ে যাতায়াতকারী প্রায় প্রত্যেকটি স্ত্রী পুরুষের দিকেও তার চোখ পড়ছিল। কেউ কেউ তার চেনা। অচেনাই বেশি।

ছিপছিপে রোগা বনমালী উচ্চতায় প্রায় ছ ফুট। গায়ের রঙ কালোই বলতে হয়। তার মাথার তেলতেলে ঘন চুলে বাঁ দিক ঘেঁষে সরু সিঁথি। কিন্তু অনেকটাই উল্টে, খুবই যত্নের সঙ্গে পাট করে আঁচড়ানো। লম্বাটে গড়নের মুখ। লম্বা নাক তেমন উঁচু বা চোখা না। বরং নাকের পাটা দুটো একটু মোটা হওয়ায়, কেউ কেউ যে তাকে ঠাট্টা করে ঘোড়ামুখো বলে, সেটা নেহাতই ঠাট্টা বলা চলে না। তার এক জোড়া সরু লম্বা গোঁফ আছে। চোখ দুটো রীতিমতো বড়। বনমালীর নিরীহ মুখের সঙ্গে এ চোখ জোড়াই কেমন একটা খটোমটো বাঁধিয়েছে। কারণ তার বড় চোখ দুটোর তুলনায়, চোখের তারা দুটো ছোট দেখায়। ফলে, অনেক সময়েই মনে হয়, সে যেন অকারণেই, চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে। অন্যথায় তার মুখে আছে একটা নিরীহ ভাব, আর একটা নৈর্ব্যক্তিক অভিব্যক্তি এঁটে বসে আছে। যা কিছুই সে দেখছে, কোনো কিছুতেই যেন তার তেমন কৌতূহল নেই। অথচ তার দৃষ্টি থেকে কোনো কিছুই

বাদ যায় না।

বনমালীর গায়ে বে-পাট, কিন্তু কাচা খাদির পাতলা কাপড়ের পাজামা পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবির ভিতরে গেঞ্জি নেই। পাজামাটিও একটু খাটো। তার লম্বা পায়ে, শুকতলা ক্ষয়ে যাওয়া, অনেক দিনের পুরনো, চামড়ার স্যাণ্ডেল। বাঁ হাতের কব্জির ঘড়িটা সাবেকি ছোট মাপের। ডান হাতে দেশলাই আর ভাজা তামাকের সস্তা একটি সিগারেট। সিগারেটটি ধরাবার মতো উপযুক্ত সময় যেন এখনও হয় নি। আসলে, এখন বনমালী ওভারব্রিজের যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সে-স্থানটিই তার একমাত্র পচ্ছন্দসই না। কোন্ দিন কোন্ জায়গায় দাঁড়ালে, ঠিক জুতসই হবে, ওভারব্রিজের এ মুড়ো থেকে ওমুড়ো হেঁটে সে ঠিক করে নেয়। একমাত্র তখনই সে সিগারেটটা ধরায়।

বনমালী পনেরো বছর আগে পাশ কোর্সে বি এ পাশ করেছিল। চৌত্রিশ বছর বয়সের তুলনায় তাকে কম বয়েসী দেখায়। দু বছর হলো সে চাকরি পেয়েছে। এখান থেকে মাইল খানেক দূরে, একটি চটকলের লেবার অফিসে সে কনিষ্ঠ কেরানী। অথচ তার অবসরপ্রাপ্ত বাবা ছিলেন রেলের কর্মচারী। দুই দাদাও রেলেই চাকরি পেয়েছে অনেক আগে এবং দুজনেই বিবাহিত। তাদের ছেলে মেয়ে আছে। দুজনেই আলাদা থাকে। বনমালীর পরেও আছে তিন বোন। বয়সে তারা বনমালীর থেকে বেশ ছোট : কারোরই বিয়ে হয় নি। তাদের প্রত্যেকেরই স্বাস্থ্য ভালো। দেখতেও কেউ খারাপ না। তিনজনেই বেশ হাসি খুশি, যেন তিনটি সখী সারাদিন বক বক করে। খিল খিল হাসে। তিন জনেরই বয়স তিরিশের নিচে, বিশের ওপরে। স্কুল ফাইনাল পর্যন্ত পড়েছে। তারপর থেকে চলেছে অপেক্ষা. যাকে বলে প্রজাপতির নির্বন্ধ। প্রজাপতির নির্বন্ধ ব্যতিরেকে তো বিয়ে হতে পারে না। তবে, বনমালীর মতে, তিন সখী বলাটা বোধহয় ঠিক না। বলা উচিত চার সখী। মায়ের বয়স এখনও ষাটের কম। চুল পেকেছে বলে ধরা যায় না। স্বাস্থ্য এখনও আশ্চর্যরকম ভালো ও নিটুট। মা দেখতেও ভালো। বোনেরা সবাই মায়ের মতো দেখতে হয়েছে। মাও তাঁর মেয়েদের

সঙ্গে বক বক করেন, এবং গলা মিলিয়ে খিল খিল করে হাসেন। বাবা বিরক্ত বোধ করেন। কিন্তু কিছুই বলেন না। এখনও দোকানের খাতা লিখে কিছু রোজগার করেন। তুই দাদার কাছ থেকে মাসের শেষে বরাদ্দের টাকা চেয়ে আনেন।

বাবা কথা না বলে, নির্বিকারই থাকতে চান। কিন্তু মা তা থাকতে দেন না। বোনেদের বিয়ের জন্য বাবাকে প্রায়ই নানারকম ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেন। বাবাও তখন রেগে গিয়ে বলেন, "বিকেল হলেই তো পাড়ার যতো আই-বুড়ো ছোঁড়াদের ভিড় লেগে যায়। তাদের সঙ্গে এত হাসি মসকরা ভাব, তাদের বলতে পারো না? তারা কি কেবল কাকিমার হাতের চা খেয়ে, ভগিনীদিগের সঙ্গে রঙ্গ তামাশা করেই চলে যাবে?" ইত্যাদি ইত্যাদি।

এ সবই পুরনো কথা। মা-ও বাবাকে কম কিছু শোনাতে ছাড়েন না। বাবা সব থেকে রেগে ওঠেন, যখন মা হাত-ঝাড়া দিয়ে বলেন, "তুমি একটা বদ্ধ পাগল। পাগলের সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই নে।"

পাল্টা বাবা মাকে পাগলী বলেন না। বলেন, "বায়ুগ্রস্ত মেয়েমানুষ!"

একমাত্র বনমালীকেই কেউ কিছু বলেন না। আসলে বলবার দরকার মনে করেন না। বোনেরাও কেউ তার সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা বলে না। রেয়াতও করে না। তার অস্তিত্ব নিয়ে কারোরই তেমন কোনো মাথা ব্যথা নেই। পাড়ার যে-সব ছেলেরা বাড়িতে মা বোনদের সঙ্গে আড্ডা দিতে আসে, তারা কেউ তার বন্ধু না। তাকে পাত্তাও দেয় না। বস্তুত-পক্ষে, বনমালীর আজকাল কোনো বন্ধু নেই। এককালে ছিল, যখন সে স্কুল কলেজে পড়তো। তখন সে ছিল হাসি খুশি। আর নানান মজার মজার কাণ্ড ঘটিয়ে সে ছাত্রছাত্রী অধ্যাপকদের হাসিয়ে মারতো। অবিশ্যি পরিণামে, দু একবার মারামারি প্রলয় কাণ্ডও ঘটে যেতো। এবং অতি নিরীহ বনমালী যে নিরীহ মুখেই হাসতে হাসতে প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটিয়ে দিতো, তাতে সকলেই খুব অবাক হয়ে যেতো। কারণ কেউ বিশ্বাস করতো না, বনমালী ইচ্ছা করে, ঐরকম অঘটন কিছু ঘটাতে পারে। বনমালী নিজেও কি অবাক হতো? যদি হবেই, তবে তারপরেও বেশ কয়েকটি

অবিস্মরণীয় অঘটন সে ঘটিয়েছে কেমন করে ?

বনমালীর ধারণা, সে নিজে কিছু বুঝতে পারে না। কোনো অঘটন ঘটবার আগে, তার মাথায় যেন কিছু ভর করে। আর সেটা যদি কোনো অশুভ আত্মা হয়, সে তাকে চেনে না।

সন্ধ্যার দিকে স্টেশনের ওভারব্রিজের ওপর এসে দাঁড়ানো, বনমালীর একটা পুরনো অভ্যাস। বিশেষ করে তার বেকার জীবনের শুরু থেকে। বর্ষা বাদলা বা খুব শীতের উৎপাত না থাকলে, এখনও প্রায় দিনই ওভার-ব্রিজের ওপর এসে দাঁড়ায়। ঘন্টাখানেক কাটিয়ে, তারপরে নেমে যায় বাজারের রাস্তায়। স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী মেয়েদের দেখতে তার ভালো লাগে। ভালো লাগে তাদের খুশির হাসি আর চলার সুন্দর ভঙ্গি দেখতে। অবিশ্যিই কষ্টও বোধ করে, তাদের পাশে স্বামী বা পুরুষ বন্ধুদের দেখলে। তখন তার দীর্ঘশ্বাস পড়ে। এবং কোনো সুন্দরী মেয়ের দিকেই সে আদৌ নির্লজ্জ হ্যাংলার মতো তাকায় না। অথচ নায়িকার যৌন আবেদন ভরা হিন্দি ছবি সে দেখতে যায় না। এমন কি রাস্তায় কোনো মেয়ে ঐ ধরনের অঙ্গ ভঙ্গি করে হাসলে বা হাঁটলে, তার একটুও ভালো লাগে না। তারপর রাস্তা যখন আস্তে আস্তে ফাঁকা হয়ে আসতে থাকে, তখন সে কোনো দিন তেলেভাজার দোকান থেকে আলুর চপ, বেগুনি কিনে খায়। কোনো দিন দেড় দু ডজন ফুচ্‌কা, বা ময়রার দোকানের হিঙের কচুরি আর মিষ্টি খেয়ে, রেল লাইনের ওপারে পুব দিকে, বাড়ি ফিরে যায়। শনিবার ছাড়া বেশি রাত্রি অবধি সে বাইরে থাকতে পারে না। রোজ ভোর সাড়ে চারটেয় উঠে, তাকে কাজে বেরোবার উদ্যোগ করতে হয়।

বনমালী আকাশের চাঁদের দিকে একবার মুখ তুলে দেখলো। তারপরে চোখ নামালো। স্টেশনের আশেপাশের উজ্জ্বল আলোয়, জ্যোৎস্না তেমন ফোটে না। দূরের দিকে তাকালে, তার চোখে সবই কেমন যেন অলৌকিক মায়াময় লাগে। এই সময়ে একটি তরুণী, এক যুবকের গা ঘেঁষে পশ্চিমের দিকে চলে গেল। বনমালীর ঘ্রাণে লাগলো সুগন্ধ। তরুণীটির খোলা চুল বাতাসে উড়ছে। বনমালীর একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো। এবং যেখানে দাঁড়িয়ে

াছে, সেখানেই ওভারব্রিজের সময়টা কাটানো স্থির করে, সিগারেটটা রালো।

াতাসের সঙ্গে, সময় বহে যায়। শুক্লা একাদশীর চাঁদ পশ্চিমে সরতে থাকে। বু ট্রেনের যাত্রীর কী প্রচণ্ড ভিড়। যতো ভিড়, ততো ব্যস্ততা।

নমালী কব্জি তুলে ঘড়ি দেখলো। সাড়ে সাতটা। ওভারব্রিজে এক ঘণ্টা কটে গেল। সিগারেট অনেক আগেই শেষ হয়েছে। সে পশ্চিমের দিকে াগিয়ে গেল। কলকাতা থেকে যাত্রী বোঝাই একটা আপ ট্রেন এলো। রু হয়ে গেল ঠ্যালাঠেলি দৌড়োদৌড়ি। ওভারব্রিজে ওঠার সিঁড়িতে াসাঠাসি চাপাচাপি ভিড়। বনমালী চেষ্টা করলো, ওভারব্রিজটা যাতে ্রত পেরিয়ে যেতে পারে। কিন্তু সে তার লম্বা পায়ে, পশ্চিমের সিঁড়িতে া দিতে না দিতেই, যাত্রীদের ভিড়টা ছুটে এসে পড়লো।

নমালী পা চালিয়ে, সিঁড়ি ভেঙে রাস্তায় নেমে এলো। সাইকেল রিক্সা ার মানুষের ভিড় চারপাশে। বনমালী বাজারের দিকে রাস্তায় কয়েক া গিয়েই, থমকে দাঁড়িয়ে আর্তনাদ করে উঠলো, “উহ্!” আর সঙ্গে ঙ্গেই নিচু হয়ে, ডান পায়ের রক্তাক্ত কড়ে আঙুলটার দিকে তাকালো।

নমালীর পাশে, আর একজনও তখন দাঁড়িয়ে পড়েছে। বনমালীর থেকে াথায় সামান্য খাটো, কিন্তু দোহারা বলিষ্ঠ চেহারা। বয়স বোধহয় বছর ল্লিশ হবে। সাদা ট্রাউজারের ওপর সাদা হাফ শার্ট গায়ে। রঙ মোটামুটি ফরসা। চোখে মুখে মানুষটি যে সুপুরুষ, দেখলেই বোঝা যায়। ভদ্র ও শালীন মুখে বুদ্ধিমত্তার ছাপ। চোখে চশমা। মাথার চুলের অবিন্যস্ততায় প্রমাণ করে, মানুষটি সারাদিন কাজের ব্যস্ততায় কাটিয়েছে। তার ডান হাতে একটা বড় চামড়ার ব্যাগ। বাঁ হাতের চওড়া কব্জিতে, কালো ব্যাণ্ডের ওপর ঝকঝকে মসৃণ ইস্পাতের ও কাঁচের ঝিলিক। শরীরের অনুপাতে তার, ঘোড়ার রঙের রঙ পায়ের জুতো জোড়াও বেশ ভারি। কিন্তু তার সারা চোখে মুখে ফুটে উঠেছে বিব্রত অপ্রস্তুত লজ্জার অভিব্যক্তি। সেই সঙ্গে অস্বস্তি আর অনুতাপও। কারণ তার জুতোর তলাতেই বনমালীর ডান পা চেপটে গিয়েছে। অথচ তা আদৌ কোনো ইচ্ছাকৃত ব্যাপার না।

ভিড়ের রাস্তায়, ব্যস্ত চলা ফেরায় এরকম ঘটতেই পারে। তবে, জুতো
চাপটা হয়তো একটু বেশিই লেগেছে। বনমালীর ডান পায়ের ক
আঙুলের নখের কোণ ফেটে রক্ত পড়ছে।
লোকটি বাঁ হাত দিয়ে বনমালীর পিঠ স্পর্শ করলো। মুখে বিব্রত অপ্রস্তু
হাসি। গলার স্বরে অনুতাপ, "সরি দাদা—সত্যি, খুব দুঃখিত—মানে তাড়
হুড়ো—কিন্তু এতটা লেগে যাবে বুঝতে পারি নি। খুব খারাপ লাগছে।"
বনমালীর আর লোকটির দিকে, চলমান জনতার কোনো লক্ষ্য নেই
তাদের দু পাশ দিয়ে জোয়ার ভাটার স্রোতের মতো লোকজন চলে যাচ্ছে।
বনমালী আস্তে আস্তে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। তার মুখে ফুটে উঠে
যন্ত্রণার অভিব্যক্তি। সে চোখের পাতা নিবিড় করে, লোকটির মুখে
দিকে তাকালো। চোখের পাতা নিবিড় করার কারণ, যাতে তার চো
তারা দুটোয় সেই দৃষ্টি ধরা না পড়ে। লোকটির মুখের দিকে সে তী
অনুসন্দিগ্ধ চোখে দেখলো। গলার স্বর শোনালো করুণ, যন্ত্রণাকাত
সানুনাসিক, "হ্যাঁ, তা বুঝেছি। আমার খুব জোর লেগেছে।"
"কিন্তু ইচ্ছে করে কেউ কারোকে ওরকম লাগিয়ে দেয় না। তাই নয়?
লোকটির মুখে সেই লজ্জিত বিব্রত হাসি, গলার স্বরে তেমনি অনুতাপে
সুর, খুব খারাপ লাগছে আমার। রাস্তাটায় এত ভিড়। এদিকে আমা
আটটার লঞ্চটা ধরতেই হবে।" সে বনমালীর পিঠ থেকে হাত সরি
কব্জি তুলে ঘড়ি দেখলো।
বনমালীর মুখের অভিব্যক্তির কোনো পরিবর্তন হলো না। তার সে
যন্ত্রণাকাতর করুণ সানুনাসিক স্বর অনেকটা বাচ্চা ছেলের ঘ্যানঘ্যানানি
মতো শোনালো, "তা তো ঠিকই। আমার সত্যি খুব লেগেছে।"
"তা কি আর জানি নে?" লোকটি বিব্রত অপ্রস্তুত হাসি মুখে, বনমালী
মুখের দিকে অনুসন্ধিৎসু চোখে দেখলো, "আমার খুবই খারাপ লাগছে
কিন্তু আটটার লঞ্চটা আমাকে ধরতেই হবে। আপনি বরং বাড়ি গি
করে আঙুলটা ধুয়ে, মারকিউরোক্রোম লাগিয়ে জড়িয়ে রাখবেন। চ
ভাই, কিছু মনে করবেন না।" সে বাজারের রাস্তার দিকে এগিয়ে গেল।

নমালীর চোখ দুটো এক মুহূর্তের জন্য অস্বাভাবিক বড় হয়ে উঠলো।
ষ্টি কঠিন। সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ভিড়ের মধ্যে
াগিয়ে গেল। এগিয়ে গিয়ে, সেই লোকটির একেবারে গা ঘেঁষে চলতে
াগলো। মুখ তার যন্ত্রণাকাতর। এবং সেই যন্ত্রণাকাতর মুখে নেমে এসেছে
াতি নিরীহ করুণ অভিব্যক্তি। গলার স্বর তেমনই ঘ্যানঘেনে, "দেখুন,
ত্যি বলছি, আমার কিন্তু খুব লেগেছে। কড়ে আঙুলের নখের কোণটা
ফটে গেছে।"

জানি তো।" লোকটির লজ্জিত অপ্রস্তুত হাসিতে এবার একটু বিস্ময়
ুটে উঠলো। সে এক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে, আবার আস্তে আস্তে
লতে লাগলো, "কী করবো ভাই। ইচ্ছে করে তো কেউ এরকম করে
া। আমি সত্যি দুঃখিত। চলি, আমাকে আটটার লঞ্চটা ধরতেই হবে।"
স আবার দ্রুত এগিয়ে গেল।

নমালীর আজ আর সুন্দরী মেয়েদের দিকেও লক্ষ্য নেই। সে খোঁড়াতে
খাঁড়াতে, দশ পনেরো পায়ের মধ্যেই লোকটিকে ধরে ফেললো, আর তার
নই খ্যানখেনে স্বর শোনা গেল, "আপনি দুঃখিত অথচ আপনার এত
াড়া। আমার কষ্টের কথাটা একটুও ভাবছেন না।"

কী আশ্চর্য!" লোকটির মুখের হাসিতে এখন বিস্মিত অনুসন্ধিৎসা।
স থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। কিন্তু তার গলার স্বরে এখন আর সেই
নুতাপের সুর নেই, "কেন ভাববো না আপনার কষ্টের কথা? আমার
াত্যি খুব খারাপ লেগেছে। আপনাকে তো বললামই। আমি ভাই
ুঃখিত। আর সত্যি, আমার একটা জরুরি কাজ আছে বলেই, আটটার
াঞ্চটা ধরবার জন্য ছুটিছি। চলি, কেমন?" সে আগের থেকেও দ্রুত
ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল।

নমালী খোঁড়ালেও, দ্রুততর গতিতে লোকটির প্রায় গায়ে গিয়ে পড়লো।
ার তার সেই মুখ, সেই ঘ্যানঘেনে স্বর, "দেখুন, কষ্ট পাওয়া দুঃখিত,
এসব তো লোকে বলেই থাকে। কিন্তু আমার যে কতোটা লেগেছে,
যদি বুঝতেন।"

"কে বললো বুঝি নি?" লোকটি ভ্রূকুটি চোখে তাকিয়েও, হেসে ফেললো, এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ালেও, সে না থেমে চলতে লাগলো, "লোকেরা কী বলে আমি জানি নে। কিন্তু সত্যি বলছি, আপনার কষ্টে আমি দুঃখিত, লজ্জিত। তবে আপনার সঙ্গে এভাবে আস্তে আস্তে চললে আমি লঞ্চটা ফেল করবো। চলি ভাই।" সে আগের মতোই দ্রুত এগিয়ে চললো।
বনমালী এ রাস্তার ভিড় কাটিয়ে চলতে অভ্যস্ত। সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়েই কয়েক পায়ের মধ্যে লোকটিকে ধরে ফেললো। আর তার সেই করুণ যন্ত্রণাকাতর ঘ্যানঘেনে স্বর, "দুঃখ, কষ্ট, সবই কথার কথা। আপনার প্রাণে একটু মায়া দয়া নেই। নিজের কাজের তাড়াতে ছুটে চলেছেন। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমার সত্যি খুব লেগেছে।"
"আশ্চর্য! কেন এরকম ভাবছেন, আপনার লাগাতে আমি বিশ্বাস করি নি?" লোকটি না থেমে গিয়ে দেখলো, বনমালী প্রায় তার পথ আগলে দাঁড়িয়েছে। তার মুখের হাসিতে আর সেই লজ্জিত অপ্রস্তুত অভিব্যক্তি নেই। যদিও তার অবাক অনুসন্ধিৎসু চোখে ও মুখে একটা অর্থহীন হাসি লেগে আছে, "আপনাকে আমি প্রথম থেকেই বলে আসছি, আমি সত্যি দুঃখিত। কেনই বা ভাবছেন, আমার প্রাণে কোনো দয়া মায়া নেই। কিন্তু আপনিও বিশ্বাস করুন, গঙ্গার ওপারে আমার সত্যি একটা জরুরি কাজ আছে। নইলে, এ রাস্তার কোনো ওষুধের দোকানে ঢুকে, আমিই আপনার পায়ে ওষুধ লাগাবার ব্যবস্থা করতাম। আপনার আঙুল বা নখ কেটে যায় নি, আমি দেখেছি। নখের ওপর চাপ পড়ায়, নখের কোণ থেকে একটু রক্ত বেরিয়েছে। অনেক সময় নখ কাটতে গেলেও আমাদের ওরকম হয়। কিন্তু ভাই, আমাকে আর দেরি করাবেন না। আটটার লঞ্চটা আমাকে ধরতেই হবে।" সে বনমালীর পাশ কাটিয়ে আরও দ্রুত গতিতে, পশ্চিম দিকে এগিয়ে চললো।
লোকটার চোখ মুখের অভিব্যক্তি ও কথাবার্তায় স্পষ্টতঃই ব্যস্ততা ও অকপটতা বর্তমান। কিন্তু বনমালীকে যেন একটা অদৃশ্য শক্তি লোকটির দিকে ছুটিয়ে নিয়ে গেল। সত্যি তার এতোটা খুঁড়িয়ে চলবার মতো

অবস্থা কি না, তা-ই বা কে জানে। তবু সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়েই, ছুটে লোকটার প্রায় গায়ে গিয়ে পড়লো, মুখের ভাবে তার কোনো পরিবর্তন নেই। গলার স্বর সেই রকম যন্ত্রণাকাতর করুণ ঘ্যানঘেনে, "আপনি বলতে পারলেন, আমার আঙুল বা নখ কেটে যায় নি? আপনার শরীরের ওজন আর জুতোর তলাটা কী রকম, তা বোধহয় আপনি জানেন না এখন বুঝতে পারছি, এতেই প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে। আমার যে সত্যি খুব লেগেছে, আপনি তা বিশ্বাস করেন নি। একবার দেখুন, আমার আঙুলটার দিকে, বলতে গেলে থেঁতলে গেছে। এরপরেও বলছেন, আপনার প্রাণে মায়াদয়া আছে? আমার এত কষ্ট, আপনি বিশ্বাস পর্যন্ত করছেন না।'

"কে বললে, আপনার কষ্টের কথা আমি বিশ্বাস করি নি?" লোকটি এবার এক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ালো। তার অধৈর্য গলার স্বরে ঈষৎ ক্ষোভের ঝাঁঝ থাকা সত্ত্বেও, প্রায় অসহায় হয়েই সে হেসে ফেললো। যে-অসহায়তার মধ্যে কোনো সমবেদনাই থাকা সম্ভব না। বরং একটা বিরক্তিই প্রচ্ছন্ন থেকে যায়. "কেনই বা আপনাকে অবিশ্বাস করবো? আমি তো দেখেইছি, আপনার পায়ের কড়ে আঙুলে আমার জুতোর চাপ লেগেছিল। আমি শুধু বলেছি, আপনি যতোটা বলছেন, হয়তো ততোটা লাগে নি। তাতে যদি আপনি ভুল বুঝে থাকেন, তাহলে ভাই জোড় হাতে ক্ষমা চাইছি। এ ছাড়া তো আমার আর কিছু করার নেই। না জেনে যা করেছি, তার জন্য আমি ক্ষমা চাইছি। বাট বিলিভ মী ভাই, এ লঞ্চটা ধরে যদি আমি ওপারে যেতে না পারি, দারুণ ক্ষতি হয়ে যাবে। প্লিজ, আর আমাকে আটকাবেন না।" সে না থেমে, আস্তে আস্তে চলছিল। কথা শেষ করেই, আবার হনহনিয়ে নিজের পথে চলতে লাগলো। বনমালীর সেই বড় চোখ আর ছোট তারা দুটোর উদ্দীপ্ত দৃষ্টিতে একটা অলৌকিকতার ঘোর নেমে এসেছে। তাকে টেনে নিয়ে চললো, কোনো এক অদৃশ্য শক্তি। অথচ তার যন্ত্রণাকাতর মুখ করুণ আর নিরীহ। সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে, ভিড় কাটিয়ে লোকটিকে ধরে ফেললো, আর তার সেই

অসহ্য ঘ্যানঘেনে স্বর শোনা গেল, "দেখুন, সব মানুষ যা করে, আপনি তাই করলেন। ক্ষমা চাইলেন। তাতেই যেন আমার পায়ের চোটটা সেরে যাবে। দিব্যি গেলে বলছি, আমার খুব লেগেছে।"

লোকটি এবার থমকে দাঁড়িয়ে, তীক্ষ্ণ চোখে বনমালীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখলো। চোখ ফিরিয়ে, বাঁ হাতের কবজি তুলে, ঝটিতি ঘড়িটা দেখে নিল। তারপর আশেপাশে তাকিয়ে, ছুটো হকার স্টলের মাঝখানে, সামান্য সরু এক ফালি জায়গা তার চোখে পড়লো। সে বনমালীর হাত ধরে, সেখানে টেনে নিয়ে গেল। ভিড়ের ব্যস্ত রাস্তায়, কেউ তাদের লক্ষ্যও করলো না। বনমালীরও আজ লক্ষ্য নেই, যাদের সে দেখতে ভালবাসে, সেই স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী মেয়েরা কতো জন তার সামনে দিয়ে চলে গেল। লোকটার ঐরকম রাস্তার ধারে টেনে নেওয়া সত্ত্বেও, তার চোখ মুখের কোনো পবিবর্তন দেখা গেল না। লোকটি গলার স্বর নামিয়েবেশ ভদ্র-ভাবেই, দ্রুত স্বরে জিজ্ঞেস করলো, "অপনার নামটা জানতে পারি ভাই?"

বনমালী তার আচ্ছন্নতার মধ্যেই যেন উচ্চারণ করলো, "বনমালী হাজরা।"

"ভাই বনমালীবাবু, আমি বুঝতে পারছি, আপনি একজন ভদ্রলোক।"

লোকটির মুখে অমায়িক হাসি ফুটে উঠেছে। সে তার চামড়ার ব্যাগটা ছুই উরুতের মাঝখানে চেপে ধরে, ট্রাউজারের হিপ পকেটে হাত ঢোকালো, "হয়তো গোড়া থেকেই আমার একটা কথা বোঝা উচিত ছিল। তাতেও যদি আমার ভুল হয়, তাহলে আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনি ভালোই জানেন, আমি সত্যি ইচ্ছে করে আপনার পায়ে লাগিয়ে দিই নি। আমার মনে হয়, প্রিকশান নেবার জন্য আপনার বোধহয় একটা অ্যান্টি টিটেনাস্ ইঞ্জেকশন নেওয়া দরকার। আর কিছু ওষুধ খেতে হবে।"

কথাগুলো শেষ না করতেই, হিপ পকেট থেকে সে তার মোটা পার্সটা বের করলো। পার্স ফাঁক করে, একটা দশ টাকার নোট বের করে, বনমালীর দিকে এগিয়ে দিল। "কিছু মনে করবেন না বনমালীবাবু। এটা রাখুন। আপনার কাজে লাগবে।"

"এটা আর একটা চোট দিলেন আপনি।"

বনমালীর সেই একই যন্ত্রণাকাতর করুণ ঘ্যানঘেনে গলার স্বর, অথচ খুবই নিরীহ, "খুব কষ্ট পেলাম। ছি ছি, আমার চিকিৎসার জন্য আপনি আমাকে টাকা দিচ্ছেন? আর আমি তা হাত পেতে নেবো? শেষ পর্যন্ত আমার সম্পর্কে এই আপনার ধারণা হলো?"

লোকটি নতুন করে আবার অপ্রস্তুত ও বিব্রত হলো। পার্সের মধ্যে নোটটা ঢুকিয়ে, হিপ পকেটে ঢুকিয়ে দিল। দুই উরুর মাঝখান থেকে চামড়ার ব্যাগটা ডান হাতে নিয়ে, বনমালীর মুখের দিকে তাকিয়ে, প্রায় ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে হাসলো, "মাফ্ করবেন বনমালীবাবু! আপনাকে আমি আগেই বলেছিলাম, যদি আমার ভুল হয়, ক্ষমা করবেন। কিন্তু আর এক মিনিটও আমার দাঁড়াবার সময় নেই। চলি।" সে পিছন ফিরে, প্রায় ছিটকে রাস্তার মাঝখানে চলে গেল। ভিড় কাটিয়ে, এক রকম উর্ধ্বশ্বাসেই অতি দ্রুত পা চালালো।

বনমালীও খোঁড়াতে খোঁড়াতেই ছিটকে পড়লো রাস্তার মাঝখানে। আর সেই ভাবেই আট দশ পদক্ষেপের মধ্যেই লোকটিকে ধরে ফেললো। লঞ্চঘাটটা আর বেশি দূরে নেই। কিন্তু বনমালীর ওপর তখন যে কোন্ এক দুরাত্মার অলৌকিক শক্তি ভর করেছে, তা সে নিজেই জানে না। লোকটার গা ঘেঁষে, খুঁড়িয়ে চলতে চলতে, তার সেই করুণ নিরীহ ঘ্যান-ঘেনে স্বর শোনা গেল, "যা খুশি অপমান করতে পারেন, কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমার সত্যি খুব লেগেছে।"

"জানি। কিন্তু কিছু করার কেই।" লোকটির মুখ শান্ত। গলার স্বর কঠিন শোনালো। সে না থেমে দ্রুত পা চালালো।

বনমালী বলতে গেলে, একরকম লোকটির পায়ে পা ঠেকিয়ে খুঁড়িয়ে চললো, আর সেই একই স্বরে বললো, "কী আর করবেন? কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন, আমার সত্যি খুব লেগেছে।"

"কী বলতে চান আপনি, অ্যাঁ?' লোকটি এবার স্বর চড়িয়ে ঝেঁজে উঠলো, "অনেকক্ষণ ধরে আপনার ভাঁড়ামি সহ্য করেছি। মনে রাখবেন, সব কিছুর একটা সীমা আছে।"

লোকটির চড়া স্বর যেন রাস্তার ভিড়ের স্রোতকে একটু থমকে দিল। দু একজন এগিয়েও এলো। বনমালীর কোনো পরিবর্তন নেই। সে এগিয়ে মুখ কয়েকটির দিকে একবার তাকিয়ে দেখলো। সে তার বুকে দ্রুত স্পন্দন অনুভব করছে। একটা সার্থকতার প্রত্যাশা তার আচ্ছন্নতাকে যেন আলোকিত করে তুলছে। তার সেই যন্ত্রণাকাতর নিরীহ মুখ, আর শোনা গেল সেই দুঃসহ ঘ্যানঘেনে স্বর, "আমার আঙুল কেটে রক্ত পড়ছে, আর আপনি আমাকে ভাঁড় বলছেন ?"

"তা ছাড়া আপনাকে কী বলবো মশাই ?" লোকটির স্বর যেন আরও চড়া তপ্ত সুরে ফেটে পড়লো, "সেই কখন থেকে আপনি আমাকে জ্বালাতন করছেন। ইচ্ছে করে আমি আপনার পা মাড়িয়ে দিইনি। তবু ক্ষমা চেয়েছি, আবার কী ! এর পরেও, আপনাকে কি মাথায় করে নাচতে হবে নাকি ? কী ভেবেছেন আপনি, অ্যাঁ ?"

লোকটির ঝাঁঝানো স্বরের চিৎকারে, জনস্রোত প্রায় একেবারেই থমকে গেল। আরও কয়েকজন লোক, লোকটিকে আর বনমালীকে ঘিরে এগিয়ে এলো। একজন ধুতি পাঞ্জাবি পরা যুবক জিজ্ঞেসও করলো "কী হয়েছে ?"

বনমালীর সেই যন্ত্রণাকাতর নিরীহ মুখ। সে ঝুঁকে পড়ে, ডান দিকের কড়ে আঙুলটা দেখালো। কেউ কেউ সেদিকে ঝুঁকে পড়লো। বনমালীর সেই করুণ ঘ্যানঘেনে স্বর শোনা গেল, "আমি কী বলেছি আপনাকে ? আমি তো খালি বলেছি, আমার সত্যি খুব লেগেছে। তা ছাড়া আর কিছু বলেছি ? আপনি আমার পা মাড়িয়ে দিয়েছেন, তা কী আর করা যাবে। তা বলে, আমার লাগার কথাটাও বলতে পারবো না ?"

"হুঁ, আঙুলটায় রক্ত জমে গেছে।" একজন প্যান্ট শার্ট পরা, তাগড়া জোয়ান বলে উঠল।

লোকটি কিছু বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই ধুতি পাঞ্জাবি পরা যুবকটি বলে উঠলো, "আহা, ভদ্রলোক তো বলছেন, সেজন্য তিনি ক্ষমা চেয়েছেন। ব্যাপারটা তো তাতেই মিটে যাওয়া উচিত।"

"ওরকম রোয়াবি মারা গলায় যে কেউ ক্ষমা চায়, তা জানতাম না।"
তাগড়া জোয়ানের স্বরে বিদ্রূপ মেশানো, ঝাঁঝ।
আশেপাশে তখন নানারকম মন্তব্যের গুঞ্জন শুরু হয়ে গিয়েছে। লোকটি তবু গলা চড়িয়েই বললো. "রোয়াবি মারা টারা কী বলছেন, আমি বুঝি না! আপনি কী করে জানবেন মশাই, কতক্ষণ ধরে ভদ্রলোক আমাকে জ্বালাতন করে মারছেন? ভিড়ের রাস্তায় ওরকম লাগতেই পারে, তা বলে বারে বারে আমাকে শুনতে হবে, ওঁর খুব লেগেছে? কে সে কথা অস্বীকার করেছে?"
"শুনুন মশাই, আপনি চুপ করুন।" ধুতি পাঞ্জাবি পরা যুবক লোকটিকে থামিয়ে, ভিড়ের উদ্দেশ্যে মুখ তুলে কিছু বলতে চাইলো।
বনমালী তার আগেই ঘ্যানঘেনিয়ে উঠলো, "আপনি মশাই শুধু তখন থেকে আমাকে ধমকাচ্ছেন। আবার রাস্তার ধারে টেনে নিয়ে গিয়ে, আমাকে টাকা দিতে চাইলেন। যেন ঘুষ দিতে চাইছিলেন। আমি কি আপনার কাছে টাকা চেয়েছি? কী অপমান। আমি শুধু বলেছি, আমার খুব লেগেছে। আবার আমাকে ভাঁড়ও বলছেন। আমি ভাঁড়?"
"তা ছাড়া আপনি কী?" লোকটি এতক্ষণে তার নিজের আয়ত্তের বাইরে চলে এসেছে। সে আগের মতোই গলা চড়িয়ে চিৎকারে ঝেঁঝে উঠলো, "হ্যাঁ, টাকা আপনাকে দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ঘুষ নয়। আপনার আঙুলের চিকিৎসার জন্য। আপনার যে মানসম্মান বোধ থাকতে পারে, তা আমি বিশ্বাস করি না। আপনার ঘ্যানঘ্যানানির জন্যই আমি আটটার লঞ্চটা ফেল করলাম।"
ভিড়ের গুঞ্জন শুনে বোঝা গেল, বনমালী আর লোকটি, দুজনের পক্ষে, দুই শিবিরে লোক ভাগ হয়ে যাচ্ছে। এ সময়ে ভিড় ঠেলে আর একজন এগিয়ে এলো। চেহারাটা ফিল্মের লড়িয়ে নায়কের মতো। তার চোস্ত আর পাঞ্জাবি পরা চেহারাটি বেশ লম্বা। সোজা এসে দাঁড়ালো লোকটির মুখোমুখি। বলতে গেলে, বনমালী তার পিছনেই পড়ে গেল। তার বুকের রক্তে তখন তোলপাড় শুরু হয়ে গিয়েছে। তার প্রত্যাশিত সেই যুদ্ধ যেন

আসন্ন হয়ে উঠেছে, যে-যুদ্ধ সে অনেক আগেই শুরু করেছিল। এবং সে যেন দেখতে পেলো, জয়ধ্বজা উড়ছে, তার হাতে। ফিল্মের লড়িয়ে নায়কের মতো যুবক, লোকটির দিকে ঠাণ্ডা কিন্তু কঠিন চোখে তাকালো। তার গলার স্বরও সেই রকম শোনালো, "দেখছি, লোকের পা মাড়িয়ে রক্ত বের করের ডেঁটে ছাড়া কথা বলতে পারেন না। এত মেজাজ কিসের মশাই ?"

ধুতি পাঞ্জাবি পরা যুবক এগিয়ে এলো, "ভদ্রলোক তো ক্ষমা চেয়েছেন, বলছেন, তবে আর—।"

"আরে দূর তোর ক্ষমা চাওয়ার নিকুচি করেছে।" ফিল্মের লড়িয়ে নায়ক তার বাঁ হাতের থাবা দিয়ে পাঞ্জাবি পরা যুবকের মুখের ওপর চাপা দিয়ে, জোরে ঠেলে দিল।

মুহূর্তের মধ্যেই, জনতার থম্‌কানো স্রোত নড়ে উঠলো। ধুতি পাঞ্জাবি পরা যুবক পড়তে পড়তে, লোকজনের গায়ে ঠেকে গেল। অন্য দু'চারজন সেদিক থেকে এগিয়ে এলো। ফিল্মের লড়িয়ে নায়ক লোকটির মুখের কাছে তর্জনী তুলে, চাপা গর্জন করলো, "একটা নিরীহ লোকের পা মাড়িয়ে দিয়েছেন, তার জন্য ভদ্রলোকের মতো ক্ষমা চাইতে হয়। ওরকম ডেঁটে মেজাজ দেখিয়ে ক্ষমা চায় না লোকে।"

"আপনি তো মশাই কিছুই জানেন না, তবে কেন আগ বাড়িয়ে বলতে আসছেন ?" লোকটি পরিস্থিতি বুঝতে অক্ষম। নিজের আয়ত্ত হারিয়ে, বেশ ঝেঁজেই গলা চড়ালো, "পা মাড়িয়ে দিয়েছি ঠিকই। কিন্তু আপনারা জানেন না, ও লোকটা অত্যন্ত অভদ্র, ছোটলোক। ওর কাছে আমার ক্ষমা চাওয়াও উচিত হয় নি।"

ফিল্মের লড়িয়ে নায়কের স্বরে ক্রুদ্ধ বিদ্রূপ ঝল্‌সে উঠলো, "তাই নাকি। এই হলো ক্ষমা চাওয়ার বহর ? যান, চলে যান।" বলেই, বাঁ হাতে লোকটির ঘাড়ে আঘাত করলো।

লোকটি তার পিছনের ভিড়ে ছিটকে পড়লো। কিন্তু মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে, লড়িয়ে নায়কটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। যার পরিণামে, মুহূর্তের মধ্যে, ভিড়ের রাস্তা একটি যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হলো। বেশ কিছু

লোক, মহিলা আর শিশুদের যে যেদিকে পারলো, ছুটলো। বাকিরা যে কাদের সঙ্গে কারা লড়ছে, কিছুই ঠিক বোঝা গেল না।

বনমালী যে জনস্রোত কোন্ দিকে টেনে নিয়ে চলেছে, সে প্রথমটা বুঝে উঠতেই পারলো না। সে কেবল লোকটির আহত রক্তাক্ত চেহারটা দেখতে পাচ্ছে। আর সে যেন এক বিরাট যুদ্ধে জয়লাভ করে, জয়ধ্বজা নিয়ে চলেছে। এবং হঠাৎ সে দেখলো, লঞ্চঘাটের সামনে, সাইকেল রিকশা-গুলোর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে কোনো দিকে না তাকিয়ে. একটা রিকশায় উঠে বললো, গঙ্গার ধারের রাস্তা দিয়ে চলো।"

"কিসের যে মারামারি লেগে গেল কে জানে ?।" রিকশাওয়ালা রিকশা চালাতে চালাতে বিরক্ত স্বরে বললো, "এর পরেই শালারা বোমবাজি শুরু করবে। দোকানপাট বন্ধ হয়ে যাবে আর আমাদের কারবারেও চিত্তির।"

বনমালীর কানে রিকশাওয়ালার কথাগুলো তেমন ঢুকলো না। গঙ্গার ধারের রাস্তা ফাঁকা। বাতাস বইছে, আর আকাশে শুক্লা একাদশীর চাঁদ। জ্যোৎস্নায় চলকানো গঙ্গাকে দেখাচ্ছে মায়াময় বিশাল নদীর মতো। বনমালী পায়ে একটুও ব্যথা বোধ করছে না। লোকটির চেহারা তার চোখে ভাসছে। নিশ্চয়ই লোকটা তার তুলনায় অনেক শিক্ষিত, টাকা পয়সাওয়ালা সুখী। বাড়িতে যে সুন্দরী বউ আছে, তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। লোকটার স্বাস্থ্য চেহারাও তার চেয়ে অনেক অনেক সুন্দর। আর লোকটা সত্যি ভদ্র, অমায়িক স্বীকার না করে উপায় নেই। কিন্তু বনমালী কী করবে ? ও যে অসহায়। কী একটা অশুভ আত্মা যে ওর মধ্যে ভর করে, ও জানে না। সে একবার যুদ্ধ ঘোষণা করলে, শেষ পর্যন্ত সর্বনাশ না ঘটিয়ে কিছু-তেই নিরস্ত হতে পারে না।

হ্যাঁ বনমালী জয়ী, এবং সুখী বোধ করছে। কিন্তু তার ভিতরে যেন দলা দলা অন্ধকারও ভরে উঠেছে। এ দুটোই এখন তার কাছে অনিবার্য, অন্যথায়, সে তো বছরের পর বছর মাসের পর মাস, ঘরে বাইরে অবজ্ঞা অবহেলার মধ্যে, নির্বিকার জীবন যাপন করে। তবু মাঝে মধ্যে কেন যে এরকম অবিশ্বাস্য অদ্ভুত ঘটনা ঘটে যায়, বনমালী জানে না।